আচার।

১০৬নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত
ও
প্রকাশিত।

Calcutta.

PRINTED BY P. C. MOOKERJEE & SONS.
AT THE FULL MOON PRINTING WORKS,
No. 24, Beadon Street. E. C.

1896.

ভূমিকা।

কিছুকাল হইতে বঙ্গসাহিত্যসমাজ দিন দিন উপন্যাসে ও নাটকে নাটকে প্লাবিত হইতেছে। বহুকাল ব্যাপিয়া একজাতীয় আহার করিলে যেমন অরুচি হয় ও পরিশেষে আহারে প্রবৃত্তি থাকে না; সেইরূপ সাহিত্যভুক্‌দিগের একাদিক্রমে দীর্ঘকাল একজাতীয় পাঠে অধ্যয়নে অরুচি হইবার সম্ভাবনা। বঙ্গীয় সাহিত্যভুক্‌দিগের এ দুর্দ্দশা এখনই ঘটিয়াছে কিনা বলিতে পারি না, যদি না ঘটিয়া থাকে, তবে অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে যে পাঠে তাঁহাদিগের দারুণ অরুচি হইবে, তাহার সংশয় নাই।

মানুষের আহারে অরুচি হইলে, তাহাকে আচার খাওয়াইয়া তাহার রুচি সংশোধন ও প্রকৃতিস্থ করা হয়। সাহিত্যভুক্‌দিগের রুচির বিকার হইলে, তাহার প্রতিকারের জন্য আমি এই আচার প্রস্তুত করিলাম। আমার আচারে যে বিকৃত রুচি প্রকৃতিস্থ হইবে, আমি এমত স্পর্দ্ধা করি না; তবে বিশেষ অরুচি হইলে, যেমন তেমন আচার

সম্মুখে আনিলেই গ্রাহ্য হয়। আমি এই ভরসায় এই আচার প্রস্তুত করিয়া সাহিত্যসমাজের রাজপথে বসিলাম; দেখি, উপন্যাস ও নাটকলেখকেরা সাহিত্যভুক্দিগকে কতদূর বিকৃত করিয়াছে। যদি বিজাতীয় অরুচি হইয়া থাকে, আহারের প্রবৃত্তি একেবারে ঘুচিয়া গিয়া থাকে; তাহা হইলে এ আচারের প্রতি কেহ তাকাইবে না, আর যদি কেবল মাত্র রোগের সঞ্চার হইয়া থাকে, আহারে প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু ভাল লাগে না বলিয়া খাইতে পারে না, তাহা হইলে আমার আচার অগ্রাহ্য হইবে না। একেবারে আহারের প্রবৃত্তি ঘুচিয়া গেলে, আচার কি--কোন দ্রব্যই ভাল লাগে না। অতিরিক্ত সুরাপানজনিত মত্ততা যখন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আইসে, সেই সময়ে মদ্যপায়ীর বিজাতীয় অবসাদ উপস্থিত হয়। এই অবসাদের অবস্থায় যেমন সমস্ত আহার বন্ধ হইয়া যায়, এক বিন্দু জল পর্য্যন্তও গলাধঃকরণ হয় না, কেবলমাত্র এক এক কোঁটা মদই সে অবস্থায় খাওয়া চলে; তেমনি উপন্যাস ও নাটকপাঠে যাঁহাদিগের অধ্যয়নে দারুণ অরুচি হইয়াছে, তাঁহাদিগের এ আচার কি কোন প্রকার পাঠেই প্রবৃত্তি হইবে না; তবে এক এক টুকু উপন্যাস বা নাটক পাঠ যদি কখন কখন ভাল লাগে।

ভরসা করি, আমার এ আচার যথাকালে প্রচার হইয়া সাহিত্যসমাজে যে বিপৎপাতের আশঙ্কা করা যাইতেছে, তাহাকে প্রতিরোধ করিবে।

এই স্থলে আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, আমার পরমাত্মীয় কল্যাণাস্পদ মহাভারত-নাট্যকাব্য-প্রণেতা শ্রীমান প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাবাজীউ মুদ্রাঙ্কণ-কালে এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত প্রুফ্ সংশোধনাদি বিস্তর আনুকূল্য করিয়াছেন। তাঁহার দীর্ঘজীবন এবং সর্ব্বাঙ্গীন কুশল আমার একান্ত প্রার্থনীয়।

কলিকাতা,
১০৬নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্।
২১শে আষাঢ়—১৩০৩ সাল।

শ্রীঈশানচন্দ্র শর্ম্মা।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং।

আচার।

১ম অধ্যায়।

"সহশয্যাসনাৎ যানাৎ সংলাপাৎ সহ ভোজনাৎ।
সঞ্চরন্তীহ পাপানি তৈল বিন্দু রিবাম্ভসি॥"

১। এক বিন্দু তৈল জলে পড়িলে যেমন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে, অর্থাৎ যে স্থানে পতিত হয়, দেখিতে না দেখিতে, তথা হইতে সে যেমন অনেক দূর ছড়াইয়া পড়ে,

* শীর্ষ স্থানের এই দুইটি শব্দ মুদ্রাঙ্কণ কালে কম্পোজিটর উঠাইয়া দেয়, কিন্তু শীর্ষ স্থানে দুর্গা নামের অভাব হিন্দুর আচার সঙ্গত নহে। হিন্দু যে কোন কার্য্য করেন, কার্য্যারম্ভ কালে দুর্গা নাম স্মরণ করেন, লিখিবার সময় দুর্গা নাম লিখেন। এমন কি দলীল লিখিতে হইলে তাহাতেও সর্ব্বাগ্রে দুর্গা নাম লেখা হয়। কোন সমযে এক জজের সেরিস্তাদার একখান দলিল জজ সাহেবকে পড়িয়া শুনাইতেছিলেন, জজ সাহেব নিজেও দলীল দেখিতেছিলেন। সেরিস্তাদার পাঠ করিতেছেন, জজ সাহেব সরোষে বারম্বার বলিতে লাগিলেন, "সুরু সে পড়"। সেরিস্তাদার দলীলের আরম্ভ হইতেই পাঠ করিতেছিলেন, জজ সাহেবের কথা বুঝিতে পারেন না, অনন্তর জজ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা দুর্গা নাম দেখাইয়া দিলেন। এই প্রথার অনুরোধে আমরা দুর্গা নাম শীর্ষ স্থানে পুনর্ব্বার সন্নিবেশিত করিলাম।

তেমনি যাহারা এক শয্যায় শয়ন, একাসনে উপবেশন, বা এক যানে গমনাগমন করে, অথবা একত্রে বসিয়া কথোপকথন, বা একত্রে বসিয়া ভোজন করে, তাহাদিগের পরস্পরের পাপ পরস্পরের দেহে সংক্রামিত হয়; কিরূপে হয়, কখন হয়, তাহা জানা যায় না, কিন্তু এক দেহ হইতে দেহান্তরে এইরূপে অলক্ষিত ভাবে পাপ সঞ্চরণ করিয়া থাকে।

২। ধর্ম্মশাস্ত্রে যেমন এক দেহ হইতে দেহান্তরে পাপ সংক্রমণের কথার উল্লেখ আছে, ঐরূপ এক দেহ হইতে দেহান্তরে রোগ সংক্রমণের প্রমাণও বৈদ্যকে দৃষ্ট হয়, *যথা*—

"প্রসঙ্গাৎ গাত্র সংস্পর্শাৎ নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ
সহশয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্র মাল্যানুলেপনাৎ।
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ
ঔপসর্গিক রোগশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরং॥"

৩। নীতি শাস্ত্রেও "সংসর্গজা দোষ গুণা ভবন্তি" প্রভৃতি শ্লোকে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে উক্ত শাস্ত্রের মতেও মানুষের যেমন সংসর্গ তেমনি দোষ গুণ হইয়া থাকে।

৪। এই বচনগুলির মূলে অতি গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত আছে। আধুনিক সভ্য সমাজে এ তত্ত্বের এখনও প্রকৃষ্টরূপে স্ফূর্ত্তি হয় নাই, তবে কিছু কিছু আভাস মাত্র অনুভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

৫। ইদানীং "থিওসফিষ্ট" বলিয়া যে এক অভিনব পরমার্থ তত্ত্ব জিজ্ঞাসু সমিতি হইয়াছে, সেই সমিতির লোকদিগের হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও শ্রদ্ধা আছে। ইহাঁরা হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিতে করিতে, বোধ হয়, উপরি উক্ত বচনগুলি বা সেই মর্ম্মের বচনান্তর, বা যোগী মহাত্মাগণের সহিত আলাপ করিতে করিতে তাহার আভাস প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন, পরে বিশিষ্ট আলোচনা ও চর্চ্চা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে চিত্রকরেরা দেবমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া মূর্ত্তির মস্তক প্রদেশে চারিদিকে যেমন ছটা অঙ্কিত করিয়া দেয়, এইরূপ ছটা বা তেজ, চেতন অচেতন যাবতীয় পদার্থ হইতে নিরন্তর বিনির্গত হইয়া থাকে। কেবল মস্তক প্রদেশ হইতে বিনির্গত হইয়া থাকে এমত নহে, সকল দেহের আপাদমস্তক সর্ব্বাঙ্গ হইতে বিনির্গত হয়। পৃথিবীর উপরিভাগে ২২।২৩ ক্রোশ ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত যেমন বায়ুকোষ (Atmosphere) আছে, এই ছটা বা তেজ নির্গম সমুদয় পদার্থের বায়ুকোষের ন্যায়। থিওসফিষ্টগণ কর্ত্তৃক এই ছটা "অরা" বলিয়া অভিহিত হয়। অরা লাটিন শব্দ, ইহার অর্থ বায়ু, অতএব এই ছটাকে বায়ু কোষ বলিলে অযথা প্রয়োগ হয় না।

৬। এই বায়ুকোষ বহুদূর অবধি বিস্তৃত হয়, বিস্তারের সীমাকে থিওসফিষ্টগণ কটিবন্ধ বলেন। যত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, যত পবিত্র ভাবে জীবনযাত্রা

নির্ব্বাহ করা যায়, এবং পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণায় অধিক সময় অতিবাহিত করা যায়, এই বায়ুকোষের সীমা বা কটিবন্ধ তত বৃদ্ধি হয়। সাধু সজ্জনের বায়ুকোষের সীমা বা কটিবন্ধ প্রায় ৫০ ফুট হইতে এক ক্রোশ অবধি বিস্তৃত হয়, এবং যোগীদিগের বায়ুকোষ দেশ দেশান্তর, মহাসাগর পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া যায়। শীর্ষস্থানীয় বচনটিতে কেবল পাপ সংক্রমণের উল্লেখ আছে, কেননা পাপের ভয়ে লোকে শয্যাসনাদির বিচার করিবে, নচেৎ পাপ যে যে অবস্থায় এক দেহ হইতে দেহান্তরে সঞ্চরণ করে, পুণ্যও অনুরূপ অবস্থাতে এক দেহ হইতে দেহান্তরে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। উপরি উক্ত বায়ুকোষের কটিবন্ধের ভিতর যে আইসে সে তাহার প্রভাব দ্বারা অভিভূত হয়। এক জন নীতিপরায়ণ, ধীশক্তিসম্পন্ন, ধার্ম্মিক ব্যক্তির নিকট যদি এক জন ইন্দ্রিয়পরায়ণ, নিতান্ত বিষয়াসক্ত, পশুভাবাপন্ন লোক আইসে, তবে উভয়ে পরস্পরের বায়ু কোষ প্রভাবে অভিভূত হয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তি এক প্রকার অধঃপতন জনক প্রভাব অনুভব করে, এবং তথা হইতে অপসৃত হইবার চেষ্টা করে; দ্বিতীয় ব্যক্তির যে প্রভাব অনুভূত হয় সে তাহার কল্যাণকর এবং সে ক্রমশঃ প্রথমোক্ত ব্যক্তির দিকে আকৃষ্ট হয়।

৭। যদি নীতিপরায়ণ ব্যক্তির নীতিপরায়ণতা বদ্ধমূল না হয়, অর্থাৎ যদি তাহা বিচার ও বিশ্বাসমূলক না হয়, এবং তিনি যদি প্রকৃত প্রস্তাবে কখন কোন ধর্ম্মের অনু-

ষ্ঠান না করিয়া থাকেন, কেবল অধর্ম্মের অনন্নুষ্ঠানই তাঁহার ধর্ম্ম, আর ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি যদি যার পর নাই ভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়পরায়ণের বায়ুকোষ বা অরা নীতি-পরায়ণের অরাকে এমন বিকৃত ও কলঙ্কিত করিয়া ফেলে যে সে কলঙ্ক সহজে মোচন হয় না, আর দূষিত ক্ষত যেমন ক্রমশঃ সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া পড়ে ও পরিশেষে শরীর নষ্ট করে, তেমনি এই কলঙ্ক ক্রমশঃ মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত পাংশুল করিয়া তুলে ও ইন্দ্রিয়পরায়ণের দুর্নীতি সঙ্কুল বীজ তথায় বপন করে। আবার যে ব্যক্তি প্রকৃত নীতিপরায়ণ ও ধার্ম্মিক অর্থাৎ যিনি সৎ ও সত্যের প্রতি প্রেম ও অনুরাগ বশতঃ নীতিপরায়ণ, ধার্ম্মিক হইয়াছেন, এবং পরব্রহ্ম কি পদার্থ ও তাঁহার সৃষ্টির কি কৌশল ও নিয়ম, এই জ্ঞান লাভের জন্য যিনি উৎসুক, তাঁহার অরাকে, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি যত কেন ভ্রষ্ট হউক না, কোন মতে বিকৃত করিতে পারে না, প্রত্যুত তাঁহার অরার প্রভাবে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তির স্বভাব বিশুদ্ধ ও সংস্কৃত হইতে থাকে।

৮। অরা, যাহাকে আমরা বায়ুকোষ বলিয়া অভি-হিত করিয়াছি, স্নায়বীয় শক্তি বিশেষ। থিওসফিষ্টরা বলেন যে অরা বা বায়ুকোষ যে ব্যক্তি বা বস্তুকে বেষ্টন করিয়া থাকে উহা সেই বস্তু বা ব্যক্তির সত্তা মাত্র, তেজে পরিণত হইয়া তাহা হইতে বায়ুকোষাকারে বিনির্গত হয়। থিওসফিষ্টদিগের নেত্রী মহামতি শ্রীমতী ব্ল্যাভাট্স্কি বলিয়াছেন, "অরা এক প্রকার সূক্ষ্ম অদৃশ্য

তরল পদার্থ যাহা চেতন অচেতন যাবতীয় বস্তু হইতে বিনির্গত হয়, অথবা দৈহিক মানসিক উভয়বিধ ধর্ম্মাক্রান্ত আধ্যাত্মিক বাষ্পোদ্গম বিশেষ, অথবা চিজ্জড়াত্মক বৈদ্যুতিক বায়ুকোষ বিশেষ যাহা থিওসফিতে আকাশিক বা তাড়িত অরা বলিয়া আখ্যাত হয়; এই অরা বা বায়ু-কোষ এক জাতীয় বাষ্পোদ্গম নহে। ইহা অতি জটিল এবং ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ধাতু আছে। কতকগুলি ধাতু স্থূল দেহ হইতে বিনির্গত হয়, কতকগুলি লিঙ্গশরীর হইতে, এবং কতকগুলি আধ্যাত্মিক বৃত্তি সমূহ হইতে বিনির্গত হয়।

৯। সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্নব্যক্তিদিগের দৃষ্টিতে অরা বা বায়ু-কোষের উপর্য্যুপরি পাঁচটী স্তর লক্ষিত হয়। প্রথম স্তরের অরা জড় শরীর হইতে বিনির্গত হয়। ইহাকে অনাময়াত্মক অরা বলা যাইতে পারে, কেননা শরীরের যে ভাগ অপ্রকৃতিস্থ হয় সেই খানে এই অরা বিকৃত হইয়া যায়। এই অরা বর্ণহীন, কিন্তু ইহা ভূরি ভূরি সমান্তরাল রেখাময় বলিয়া ইহাকে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু দেহ রোগ-গ্রস্ত হইলে এই রেখাগুলি সমস্ত বক্র ও জটিল হইয়া পড়ে।

১০। লিঙ্গশরীরের মধ্যে যে জীবনীশক্তি চলাচল করে, ২য় স্তরের অরা সেই শক্ত্যাত্মক। লিঙ্গশরীর মধ্যে যখন এই শক্তি সঞ্চরণ করে তখন ইহার গোলাপী বর্ণ দেখা যায়, কিন্তু বায়ুকোষের আকারে যখন ইহা দেহ হইতে বহির্গত হয়, তখন ইহার এক প্রকার নীলাক্ত শ্বেত বর্ণ হয়। স্থূলদেহে অনামায়াত্মক অরার রেখাগুলি যে সরল

ও সমান্তরাল থাকে সে এই দ্বিতীয় স্তরের অরার প্রভাবেই। সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা দেখিতে পান যে দেহ অসুস্থ হইলে, অসুস্থ দেহের অরার প্রথম স্তরের সরল সমান্তরাল রেখাগুলি বক্র ও জটিল হইয়া যায় এবং মিসমেরিজম্ প্রক্রিয়া দ্বারা সেই দেহের শান্তি বিধান করিবার সময় তাঁহারা দেখিতে পান যে যে ব্যক্তি মিসমেরাইজ করে, তাহার শরীরের দ্বিতীয় স্তরের অরাকে আশ্রয় করিয়া যে জীবনীশক্তি রুগ্ন ব্যক্তির দেহে প্রবাহিত হয়, তাহার প্রভাবে সেই বক্র ও জটিল রেখা গুলি সরল হইয়া পড়ে। নিদাঘকালীন সূর্য্যের খরতর রশ্মির প্রভাবে সরস উত্তপ্ত ভূমি হইতে যে বাষ্প উদ্গম হয়, এই জীবনী শক্তিময় অরার আকার সেই বাষ্পের ন্যায়। দূষিত বায়ু সহকারে শরীরের মধ্যে যে সমস্ত রোগের বীজ প্রবিষ্ট হয়, তাহা সেই জীবনী-শক্ত্যাত্মক অরা দ্বারা প্রতিহত ও অপসারিত হয়। এই-রূপে দ্বিতীয় স্তরের অরা দ্বারা শরীর রক্ষিত হয়। শরীরে কোন আঘাত লাগিলে, কিম্বা তাহা রোগাক্রান্ত হইলে, অথবা অতিরিক্ত পরিশ্রম দ্বারা দুর্ব্বল হইলে, এই জীবনী-শক্ত্যাত্মক অরার নির্গম মন্দীভূত হয়, এবং তাহা হইলে রোগ বীজের শরীর মধ্যে প্রবেশ নিবারিত হয় না। এই জীবনীশক্তিময় অরার একটি বিশেষ ধর্ম্ম এই যে ইহা সংকল্পের নিতান্ত অনুগামী। যাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক বৃত্তি সমুহের বিশেষ স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, তাঁহারা মনে করিলে এই অরা নির্গম রোধ করিতে পারেন অর্থাৎ জীবনীশক্তি

যাহাতে তাঁহাদিগের শরীরের বাহিরে না গিয়া তাঁহাদিগের অরার সহিত সংলগ্ন থাকে, থাকিয়া শরীরের এক প্রকার আবরণের ন্যায় হয় এবং বায়্বাদি ভৌতিক পদার্থের প্রভাবে তাহাকে অভিভূত হইতে না দেয়, তাহা তাঁহারা সংকল্প করিলেই করিতে পারেন। এইরূপে মহাত্মারা দূষিত বায়ুর মধ্য দিয়া অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহাদিগের শরীরে কোন বিকার উপস্থিত হয় না। কল্পনাশক্তি সঙ্কল্পের একটি বিশেষ সহায়; যে ব্যক্তি আপনার দেহকে তাড়িত আবরণ দ্বারা রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সর্ব্বাগ্রে পূরক দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করা আবশ্যক, পরে শনৈঃ শনৈঃ সেই শ্বাস রেচন করিতে করিতে কল্পনা করিবেন যে তিনি রাশীকৃত জীবনীশক্তি রেচন করিলেন, তাঁহাকে আরও কল্পনা করিতে হইবে যে এই জীবনীশক্তি তাঁহার দেহের "অরার" সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে এবং মনে করিবেন যে যতবার রেচক করেন, ঐ জীবনীশক্তি তাঁহার দেহের অরার সহিত তত দৃঢ়তর রূপে সংলগ্ন হইতেছে। যিনি এই প্রক্রিয়ার ফলোপধায়কতাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া এই প্রক্রিয়া করেন, তিনি অবশ্যই ফললাভ করিবেন, অর্থাৎ তাঁহার দেহে রোগের বীজ কোন মতেই প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। এই আবরণ দশ মিনিট হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত বলবৎ থাকা সম্ভব, কিন্তু যে ব্যক্তি এই প্রক্রিয়া করেন, তাঁহার সঙ্কল্প যতক্ষণ অবিচলিত থাকে, ততক্ষণই তিনি সংরক্ষিত হন।

১১। তৃতীয় স্তরের অরাকে কামিক অরা বলা যায়। মানুষের পশুবৃত্তির সহিত ইহার সংস্রব। এই অরাটি দর্পণের স্বরূপ, যাহাতে মানুষের কাম ক্রোধাদি যাবতীয় চিত্তবিকার প্রতিবিম্বিত হয়। ইহার বর্ণ ও চাকৃচিক্য প্রতি মূহুর্ত্তে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; অত্যন্ত ক্রোধের উদয় হইলে এই অরা অন্ধকারময় হয় ও ইহাতে যেন লোহিতবর্ণ অগ্নি-শিখা উঠিতে থাকে, আবার অতিরিক্ত ভয় হইলে এই অরা ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ নীলাভ হয়। মানুষের রাগদ্বেষাদিসম্ভূতপিশাচ সকল যাহারা চক্ষুর অগোচর অথচ নিরন্তর অলক্ষিত ভাবে জীবের অনিষ্ট করিতেছে, সেই সমস্ত নিরবয়ব পিশাচ এই তৃতীয় স্তরের অরার সহায়-তায় সাবয়ব হইয়া সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্নব্যক্তিগণের গোচর হয়। যাঁহারা জড়দেহকে সুষুপ্ত অবস্থায় রাখিয়া সূক্ষ্মদেহ ধারণ পূর্ব্বক দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষে বিচরণ করেন, এই তৃতীয় স্তরের অরা সেই সূক্ষ্মদেহের উপাদান।

১২। আধুনিক ইতিহাসবেত্তাদিগের এই রীতি দেখা যায়, যে তাঁহারা কোন প্রাচীনজাতির ইতিবৃত্ত লিখিতে লিখিতে যদি উক্ত জাতির এমন কোন অনুষ্ঠান বা ক্রিয়ার কথা উপস্থিত হয়, যাহার নিদান কি জানেন না এবং তাৎপর্য্য কি বুঝেন না, তাহা হইলে সেই অনুষ্ঠান বা ক্রিয়া ভ্রম বা কুসংস্কারমূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এইরূপ কথিত আছে, যে দিল্লীর মোগলরাজবংশের আদিম পুরুষ বাবর, তাঁহার পুত্র হুমায়ুন অতিশয় পীড়াগ্রস্ত হইলে, যখন

চিকিৎসকেরা স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, "হুমায়ুনের আর জীবনের আশা নাই," তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন, যে পুত্রের পীড়া নিজ দেহে চালিত করিয়া আনিয়া পুত্রকে রক্ষা করিয়া আপনি প্রাণত্যাগ করিবেন। আপন প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন এ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া, তাঁহার মরণান্তে বিষয় বিভবের কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, তৎসম্বন্ধে উইল করিয়া পীড়িত সন্তানের শয্যা বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিলেন ও ঈশ্বরকে চিন্তা ও মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, "আমি ইহাকে বাহির করিয়া লইয়াছি", "আমি ইহাকে বাহির করিয়া লইয়াছি"; অর্থাৎ হুমায়ুনের রোগ চালিয়া তিনি আপন দেহে আনিয়াছেন। অবিলম্বে বাবর অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন ও তাঁহার প্রাণাত্যয় হইল, এবং হুমায়ুন আরোগ্য লাভ করিয়া সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইলেন। ইংরাজীইতিহাসবেত্তারা বলেন যে, "বাবর যে প্রক্রিয়া করিয়াছিলেন, সে একটা কুসংস্কার এবং তিনি পূর্ব্ব হইতেই পীড়াগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেই পীড়াতে তাঁহার মৃত্যু হইল এবং হুমায়ুন চিকিৎসার বলে ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিলেন।" বস্তুতঃ হুমায়ুনের দেহ হইতে বাবরের স্বদেহে রোগ চালনা করিয়া আনা বোধ হয় এই জীবনীশক্ত্যাত্মক অরা ও সঙ্কল্প ঘটিত ব্যাপার বিশেষ। হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিতে করিতে এমন অনেক যোগী মহাত্মাগণের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, যাঁহারা আপন আয়ু অপরকে দান করিয়াছেন;

অর্থাৎ যাঁহারা স্বদেহ ত্যাগ করিয়া অপরের মৃতদেহে প্রবেশ করিয়াছেন ও সেই দেহকে সজীব ও সচেতন করিয়াছেন। লোকে মনে করিয়াছে যে মুমুর্ষু ব্যক্তি ক্ষণকাল অচৈতন্ত হইয়াছিল, আবার চৈতন্যলাভ করিয়া আরোগ্য প্রাপ্ত হইল।

"ক্ষণাৎ প্রবোধমায়াতি তমসা লজ্যতে পুনঃ।
নির্ব্বাস্যতঃ প্রদীপস্য শিখেব জরতোমতিঃ॥"

যোগীপ্রবর শঙ্করাচার্য্য এইরূপে অমরক রাজার মৃতদেহে প্রবেশ করিয়া বহুদিন তাঁহার রাজ্যভোগ করেন; অনন্তর নিজের ত্যক্ত দেহ, যাহা তাঁহার আদেশক্রমে শিষ্যগণ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে পুনঃপ্রবেশ করিয়া আবার শাস্ত্রচর্চ্চা ও শিষ্যগণকে উপদেশ করিয়াছিলেন।

১৩। চতুর্থ স্তরের অরার নাম অধস্তনমানস অরা। এই অরার প্রভাবেই মানুষের স্বভাব চরিত্র ও তাঁহার পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত অনেক জানা যাইতে পারে। অরার বর্ণ, গুরুত্ব ও আকারের পরিস্ফুটতা প্রভৃতি কয়েকটি লক্ষণ দ্বারা চরিত্র ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় যদিও পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা ঘটনাবলীর বিবরণী বা আধার হয় কিরূপে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ঘটনা বিবরণ রক্ষা করিবার জন্য প্রকৃতি একটি অপূর্ব্ব আধার রচনা করিয়াছেন। আকাশ সেই আধার এবং চতুর্থ স্তরের অরা সূক্ষ্মদৃষ্টি-সম্পন্নলোকদিগকে এই আকাশের সহিত এরূপে যোজনা করিয়া দেয়, যে তাঁহারা সেই বিবরণ আধার হইতে মানুষের পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অনায়াসে সেই সমস্ত বিবরণ

বলিয়া দিতে পারেন। মানুষের মেধা বা ধারণাশক্তি যে প্রকার, আকাশ প্রকৃতির সেইরূপ ধারণাশক্তি ; এই আধার থাকাতে চিরস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী কোন ঘটনার বিন্দুমাত্র বিলুপ্ত হয় না। *

* ফলতঃ ঘটনাবলীর বিবরণ যে এইরূপে রক্ষিত হয়, তাহা আমরা সর্ব্বদাই আমাদিগের জীবনে প্রত্যক্ষ করিতেছি ; কাব্য, পুরাবৃত্ত ও কিম্বদন্তী তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। শৈশবকালে যাহা বলিয়াছি, কি করিয়াছি, যে সকল ঘটনা দেখিয়াছি কি শুনিয়াছি এবং স্মৃতিপটে যাহার চিহ্নমাত্রও নাই ; পিতা মাতা স্মরণ করাইয়াদিলেও যাহা স্মরণ হয় না, সময়, স্থল বা অবস্থা বিশেষে সেই কথা বা কার্য্য বা ঘটনা স্বতঃই স্মৃতিপথে উদিত হয়। পীড়িত অবস্থায় প্রলাপ উক্তির সহিত সেই সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ শুনিয়া বন্ধুগণ হয়ত বিস্ময়াবিষ্ট হন। "রোজে কেয়ামৎ" Day of Judgement ও চিত্রগুপ্তের বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, যে ঘটনাবলীর বিবরণ যে কোন কৌশলে জগতে সংরক্ষিত হয়, তাহা সকল কালে সকল জাতি বিশ্বাস করিত। পাঠক, শ্রবণ কর, বিবি হানাগুল্‌ড তাঁহার সুন্দর কাব্যে কি লিখিয়াছেন।

And yet with him who counts the sands,
And holds the waters in his hands,
I know a lasting record stands,
Inscribed against my name,
Of all this mortal part has wrought,
Of all this thinking soul has thought,
And from the fleeting moments caught,
For glory or for shame.

এ বিবরণ তবে কোথায় রক্ষিত হয় ? মানুষের স্মৃতিপটে থাকা সম্ভাবিত নহে, কেননা স্মৃতিশক্তির বিশেষ উত্তেজনা ও অনুশীলন করিয়াও স্মৃতিপথাতিক্রান্ত বিষয় সকলের স্মরণ হয় না। অপর ইহজীবনে যে সকল ব্যাপার অনুভূত বা প্রত্যক্ষ হয় নাই, স্বপ্নাবেশে বা অন্য অবস্থা বিশেষে মনোমধ্যে তাহারও বিকাশ হইয়া থাকে। যাহাকে হিন্দুশাস্ত্রকারেরা সংস্কার

১৪। এই আকাশরূপী বিবরণী ও কোন ব্যক্তি-বিশেষের সহিত তাহার যে তাড়িত সম্বন্ধ থাকে, সেই তাড়িতের প্রবাহের সহিত সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্নব্যক্তি তাঁহার আভ্যন্তরিক দৃষ্টিকে যোজনা করেন, করিলেই সেই ব্যক্তি-বিশেষের পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত কি তাহা জানিতে সমর্থ হন।

১৫। পঞ্চমস্তরের অরা অথবা ঊর্দ্ধতনমানস অরা সকলের অরাতে থাকে না। যাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিশিষ্টরূপ হইয়াছে, সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্নব্যক্তিগণ তাঁহাদের অরাতেই এই পঞ্চমস্তরের অরা দেখিতে পান। এই অরার বর্ণ অতি উজ্জ্বল এবং অন্যান্য স্তরের অরার বর্ণ ইহার জ্যোতির নিকটে নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।

১৬। অরা সম্বন্ধে উপরে যে সমস্ত সূক্ষ্ম কথা বর্ণিত হইল, হিন্দুশাস্ত্রে তাহার কোন উল্লেখ নাই। তবে অরা যে পদার্থ, সেইরূপ পদার্থ যে মনুষ্যের দেহ হইতে বিনির্গত হয়, হইয়া নিকটস্থ অপর দেহকে তাহার প্রভাব দ্বারা অভিভূত করে, হিন্দুশাস্ত্রে এতদর্থে ভূরি ভূরি বচন আছে। কিন্তু অরা বা অরার পাঁচটিস্তর ও তাহাদিগের পৃথক পৃথক ধর্ম্ম ও বর্ণ চক্ষুর গোচর নহে। যাঁহাদিগের পবিত্রতা ও তপঃ প্রভাবে সূক্ষ্মদৃষ্টি জন্মিয়াছে, অথবা যাঁহারা স্বভাবত সূক্ষ্মানুভবশীল, তাঁহারাই এই সমস্ত বিচিত্র দর্শনের

বলিয়া থাকেন। তবে মানুষের স্মৃতিপটে যে এই সমস্ত বিবরণ অঙ্কিত থাকে, তাহা কিরূপে সম্ভবে? অতএব থিওসফিষ্টগণ আকাশকে ঘটনাবলীর আধার বলিয়া যে অবধারণ করিয়াছেন, তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

অধিকারী। এইরূপ লোকও বড় বিরল নহে, অর্থাৎ তাঁহাদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। যদি এক আধ জনের এরূপ ক্ষমতা থাকিত ও সেই এক আধ জনের এই সকল বিচিত্র দর্শন গোচর হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া কোন সত্য সংস্থাপন করিতে পারা যাইত না। সর্ব্বসাধারণের গোচর না হউক, অনেকেই এই বিচিত্র ব্যাপার দর্শন করিয়াছেন। এ বিষয়ে এত লোকের সাক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে যদিও কখন কখন কোন বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষ্যের অনৈক্য হয়, তবে সে বিষয়ের সত্যাসত্য অপরের সাক্ষ্য দ্বারা সহজেই নির্ণয় করা যায়; কিন্তু এইরূপ সাক্ষ্য ও ইহা দ্বারা যে সত্য নির্ণয় হয়, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা গ্রহণ করেন না। আজি কালি প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞান ও প্রত্যক্ষবাদিদিগের রাজ্য, এ রাজ্যে অনুমান বা আপ্তবাক্য স্থান পায় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলে এ রাজ্যে কোন মতের আদর নাই। অনুমিতি, উপমিতি প্রভৃতি অপর সকল প্রকার প্রমাণ থাকিলে, কেবলমাত্র প্রত্যক্ষের অভাব হইলে প্রত্যক্ষবাদিরা কোন মত গ্রহণ করেন না। বৈজ্ঞানিক মূল অথবা প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলে, যদি তাঁহারা কোন মত স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের "প্রত্যক্ষ" ঠাকুরের কোপ হয় ও তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশ হয়; এমন কি যদি সর্পাঘাত হইয়া আশীবিষের বিষের জ্বালায় কেহ অস্থির হয় ও তাহার শরীর অবসন্ন হইতে থাকে, হয়ত তাহা হইলেও যতক্ষণ সর্প না দেখিবে সর্পাঘাত

স্বীকার করিবে না। অধিক কি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ফলোপধায়কতা সকলেই দেখিতেছেন। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা যে সকল রোগের চিকিৎসা করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ, প্রাচীন, বহুদর্শী, বিচক্ষণ এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা বিশেষ চেষ্টা করিয়া যে রোগীকে আরোগ্য দান করিতে পারেন নাই, সেই রোগী রোগের ও চিকিৎসার প্রভাবে অবসন্ন হইয়া মুমুর্ষুপ্রায় হইলেও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক অনেকস্থলে তাহাদিগকে বহু আয়াস ভিন্ন আরোগ্য দান করিয়াছেন। কিন্তু শারীরস্থানবিজ্ঞানবিৎপণ্ডিতদিগের এতই প্রতীপতা ও আত্মমতসমর্থনপ্রিয়তা, যে তাহার প্রভাবে তাঁহারা অন্ধীভূত হইয়া এই প্রত্যক্ষকল্যাণকরচিকিৎসাতন্ত্রকে অবজ্ঞা ও অগ্রাহ্য করিতেছেন এবং রাজাও প্রচলিতপ্রথার পক্ষপাতী হইয়া অদ্যাপি ইহার প্রতি বিরূপ হইয়া রহিয়াছেন।

১৭। হিন্দুশাস্ত্রে এক দেহ হইতে দেহান্তরে পাপ বা পুণ্যসংক্রমণের যে উল্লেখ আছে, এবং থিওসফিষ্টেরা অরা বা অরার বিবিধ বর্ণ ও ধর্ম্মের কথা যাহা বলিয়া থাকেন, তৎসমুদায় সর্ব্বসাধারণের প্রত্যক্ষের বিষয় নয় ও সেইজন্য বৈজ্ঞানিকেরা তৎপ্রতি অনাদর ও অনাস্থা প্রদর্শন করেন। কিন্তু থিওসফিষ্টেরা যে অরার উল্লেখ করেন, তৎসদৃশ আর একপ্রকার অরা আছে, যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নয় অথচ বৈজ্ঞানিকেরা তাহার অপলাপ করিতে অসমর্থ এবং সেই অরা একটি বৈজ্ঞানিক সত্যের ন্যায় পরিগৃহীত

হইয়া আসিতেছে। জর্ম্মানিদেশের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক শ্রীমৎ রাইখেনব্যাক্ চুম্বক ও স্ফটিকাদি স্বচ্ছ পদার্থ হইতে যে জ্যোতিঃ নির্গম হইতে দেখিয়াছেন, এই জ্যোতিঃ নির্গম সেই অরা। চুম্বকের লৌহ-আকর্ষণশক্তি সকলেই স্বীকার করেন। রাইখেনব্যাক্ চুম্বকের লৌহ-আকর্ষণ সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন অর্থাৎ কোন শক্তি সংযোগ ভিন্ন কেমন করিয়া চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, আর যদি শক্তি থাকে সে শক্তি কোথায় কিরূপে তাহার বিকাশ হয়? এই সমুদয় বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হইয়া তিনি এক অসূর্য্যম্পশ্য প্রদেশে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন, প্রবেশের একটিমাত্র ক্ষুদ্র দ্বার ভিন্ন আলোক ও বায়্বাগমাদির জন্য বাতায়নাদি কিছুই রাখিলেন না। অনন্তর তাঁহার নিজের একটি চুম্বক ছিল, সেইটি একদিন যদৃচ্ছাক্রমে সেই গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া একটি ক্ষীণাঙ্গী তীক্ষ্ণজ্ঞানেন্দ্রিয়সম্পন্না সূক্ষ্মানুভবশীলা স্ত্রীলোককে সেই গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া কহিলেন, "আমার চুম্বকটি এই গৃহমধ্যে কোথায় ফেলিয়াছি পাইতেছি না; দেখ দেখি, তুমি যদি বাহির করিতে পার।" স্ত্রীলোকটি দণ্ডাধিক কাল ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সহসা একস্থান হইতে চুম্বকটি উঠাইয়া লইয়া রাইখেনব্যাককে দিলেন। রাইখেনব্যাক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি অন্ধকারে কেমন করিয়া দেখিতে পাইলে?" তিনি উত্তর করিলেন, "কেন, চুম্বক হইতে জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল?" রাইখেনব্যাক কৃতার্থম্মন্য ও পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং ৫০।৬০ বার সেই চুম্বক ও অপর

চুম্বক ও স্ফটিকাদি অপর স্বচ্ছপদার্থ উক্ত অন্ধকারময় গৃহ-মধ্যে ফেলিয়া দিয়া পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোক ও অপর স্ত্রী ও পুরুষ দ্বারা তাহা অনায়াসে উঠাইয়া লন, এবং কিরূপে তাহারা দেখিতে পাইল এ কথা পৃষ্ট হইলে, সকলেই এক উত্তর দিল, "ঐ স্ফটিক বা চুম্বক হইতে জ্যোতির্ম্ময় প্রবাহ বহিতেছিল, তাহা দেখিয়া তাহারা উহাকে উঠাইয়া লইয়াছে।" চুম্বকাদি হইতে যেমন জ্যোতির্ম্ময়প্রবাহ প্রবাহিত হয়, ঐরূপ প্রবাহ মনুষ্যদেহ হইতে অর্থাৎ মানুষের হস্তপদের অঙ্গুল্যগ্র হইতে প্রবাহিত হয়, তাহা ঐরূপ নিবিড় অন্ধকারময় গৃহে ঐরূপ ক্ষীণাঙ্গী সূক্ষ্মানুভবশীলা স্ত্রীলোক দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, রাইখেনব্যাক উপর্য্যুপরি বারম্বার এক প্রক্রিয়া দ্বারা এক ফল লাভ করিয়া পরিশেষে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিলেন, যে পৃথিবীতে চেতন অচেতন যাবতীয় পদার্থ আছে, স্বাভাবিক অবস্থায় সকল পদার্থ হইতে এক প্রকার সূক্ষ্ম ও তরল ধাতু তেজঃস্ফূরণ আকারে নিরন্তর প্রবাহিত হইতে থাকে।

১৮। এই সময় হইতে ইউরোপ ও আমেরিকার যাবতীয় প্রদেশে এই বিষয় সম্বন্ধে বিজাতীয় আন্দোলন পড়িয়া গেল। বিজ্ঞানবিৎ ও শারীরস্থানতত্ত্ববিৎপণ্ডিতেরা অনেক প্রকার গবেষণা করিতে লাগিলেন। অদ্যাপিও এই আন্দোলনের তরঙ্গ নিবৃত্ত হয় নাই। এতৎসম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, মানুষের মস্তিষ্ক একটি প্রবল তড়িৎউৎপাদক যন্ত্র।

ইহাতে স্নায়বিক শক্তি বা তেজঃ উদ্ভূত হয়। এই তেজঃ বা শক্তি চিত্তবৃত্তির অবিশ্রান্ত ক্রিয়া বা অনুশীলন প্রভাবে এক প্রকার স্নায়বিক জীবনীশক্তিপ্রদ রসে পরিণত হইয়া অলক্ষিতভাবে বাহির হইতে থাকে। চিত্তবৃত্তির ক্রিয়া না হইলেও কেবল দেহ ধর্ম্ম প্রভাবে, অর্থাৎ দৈহিক যন্ত্রাদির ক্রিয়া বা চলাচল প্রভাবে এই স্নায়বীয় জীবনীশক্তিপ্রদ তরল ও অদৃশ্য পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে। যদি এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে স্বায়ত্ত করিবার উদ্দেশে চিত্ত সংযম করে, অর্থাৎ একাগ্রচিত্ত হইয়া অপর ব্যক্তিকে ধ্যান করে, তাহা হইলে এই স্নানবীয় রসোদ্গম হয়, হইয়া ২য় ব্যক্তির মনকে পরিপ্লুত ও আচ্ছন্ন বা অভিভূত করিয়া ফেলে। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা ইউরোপে ও আমেরিকায় অনেক চিকিৎসক রোগের চিকিৎসা করেন।

১৯। ১৮০০ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে অষ্ট্রিয়া দেশের অন্তর্গত ভিয়েনা নগরে মেস্‌মর বলিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ী এক ব্যক্তি মনুষ্যদেহ বিনিষ্ক্রান্ত তাড়িৎপ্রবাহ পরিচালনা দ্বারা রোগীদিগকে নিদ্রাভিভূত করিয়া, তাহাদিগের চিকিৎসা করিতেন। শস্ত্রচিকিৎসাতেই এই প্রক্রিয়ার বিশেষ উপযোগীতা ছিল। যেহেতু রোগী তাড়িতপ্রভাবে নিদ্রাভিভূত হইলে শস্ত্রাঘাতের যন্ত্রণা কিছুই অনুভব করিতে পারিত না এবং শস্ত্রচিকিৎসা অতি সহজেই সম্পন্ন হইত। অস্ত্রচিকিৎসা ভিন্ন রোগ বিশেষের অর্থাৎ স্নায়ুবিকারমূলক রোগের এ প্রক্রিয়া দ্বারা শান্তি হইত।

মেস্মর্ এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করাতে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন ও প্রতিপত্তি লাভ করেন, এবং তিনি যে চিকিৎসা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা মেস্মেরিজম্ বলিয়া আখ্যাত হয়। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী হইল, ডাক্তার ইজ্‌ডেল নামক জনৈক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত ডাক্তার প্রথমে হুগলীতে পরে কলিকাতায় মেস্মেরিজমের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন, করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। অনন্তর ক্লোরোফরম প্রভৃতি ঔষধের আবিষ্কার হওয়ায় তাহার সহায়তায় রোগীর নিদ্রা জন্মাইয়া শস্ত্রচিকিৎসা হইতে লাগিল এবং মেস্মেরিজম পরিত্যক্ত হইল।

২০। এই মেস্মেরিজম্ রূপান্তরে পরিণত হইয়া এখন হিপ্‌নটিজম্ নামে চলিতেছে। হিপ্‌নটিজম্ যে কেবল রোগের চিকিৎসার জন্য অবলম্বন করা হয় এমত নহে, এই তাড়িতপ্রবাহজনিত নিদ্রার অবস্থায় লোকের অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মে এবং তাহারা অনেক অশ্রুতপূর্ব্ব কথা ও অদৃষ্টপূর্ব্বদর্শনের বৃত্তান্ত-বলে যাহাতে শ্রোতার বড়ই কৌতূহল হয়। সেইজন্য হিপ্‌নটিজম্ তামাসা দেখাইবার জন্যও অবলম্বন করা হইয়া থাকে। ফলতঃ রাইখেনব্যাক্ তাঁহার চুম্বক সহকারে চেতন অচেতন যাবতীয় পদার্থ হইতে যে অরা বা তাড়িতপ্রবাহ নির্গত হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা এক প্রকার স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। হার্‌হার্টজ্ বলিয়া এক ব্যক্তির এই তাড়িতপ্রবাহ পরিচালনার অদ্ভুত শক্তি জন্মিয়াছিল। তিনি বলেন, যখন এই

অদৃশ্য সূক্ষ্ম তরল পদার্থ তাঁহার বাহু হইতে শড়্ শড়্ করিয়া নামিয়া আইসে, তিনি স্পষ্ট অনুভব করিতে পারেন। চিকিৎসার সময় এই তড়িতোদ্গম বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে। যে দিবস চিকিৎসা করিতে হয় না, অর্থাৎ যে দিবস রোগী তাঁহার নিকট চিকিৎসার জন্য আইসে না, সে দিবস দেহে অধিক পরিমাণে তড়িৎ উদ্গম হওয়াতে দেহ অসচ্ছল হয় এবং মনে করিলে তিনি অতিরিক্ত তড়িৎ দেহান্তরে পরিচালিত করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন।

২১। তড়িতের ধর্ম্ম ও শক্তি প্রাচীন আর্য্যদিগের অপরিজ্ঞাত ছিল না। তাঁহাদিগের রাজ্য বিস্তার বা বাণিজ্য বিস্তার ছিল না, সুতরাং নিমেষের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সংবাদ আনাইবার বিশেষ আবশ্যক হইত না। এইজন্য তাঁহারা তড়িৎকে বার্ত্তাবহ করিতে চেষ্টা করেন নাই; কিন্তু আধুনিকেরা তড়িৎ দ্বারা আর আর যে সকল কার্য্য সাধন করেন, তাহা আর্য্যগণও করিতেন। তাঁহাদিগের উচ্চ অট্টালিকা ছিল না,—সুতরাং তড়িৎ পরিচালক লৌহদণ্ড তাঁহাদিগের গৃহরক্ষণার্থ ব্যবহার ছিল না; কিন্তু উচ্চ দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিলে তাহার শিখর-প্রদেশে ধাতুময় চক্র প্রোথিত করিবার রীতি তাঁহাদিগের ছিল। হিপ্‌নটিজম্ সহকারে এক ব্যক্তির নিদ্রা আনাইয়া প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা নিদ্রিত ব্যক্তির ক্লেয়ার্‌ভয়ান্‌স্ বা সূক্ষ্ম-দৃষ্টির স্ফূর্ত্তি করিয়া তাহা দ্বারা চোর অনুসন্ধান করা ও ধরা,

যাহা লইয়া আধুনিকেরা এত আস্ফালন করেন, এইরূপ তড়িৎপ্রভাবে চোর অনুসন্ধান করা ও ধরা হিন্দুসমাজের ভিতরে নিত্য ঘটনা। হাত চালা, বাটী চালা, নল চালা প্রভৃতি নানা প্রক্রিয়া দ্বারা প্রায় সর্ব্বদাই চোর ধৃত হয় ও অপহৃত দ্রব্যের উদ্ধার হয়। তড়িৎ সহকারে রোগের চিকিৎসা করা আধুনিকেরা যেরূপ মেসমেরিজম্ ও হিপ্‌-নটিজম্ আদি প্রক্রিয়া দ্বারা করিয়া থাকেন; যদিও সে সমস্ত প্রক্রিয়া হিন্দুদিগের অবিদিত, তথাপি তজ্জাতীয় অপর অনু-ষ্ঠান অর্থাৎ ঐ তড়িতমূলক অন্য চিকিৎসা প্রণালী হিন্দু-সমাজে বহু পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত আছে। যথা তেল-পড়া, জলপড়া, ঝাড়ফুক্ ইত্যাদি। হাতচালা, বাটী-চালা কি তেলপড়া, জলপড়া, ঝাড়ফুক্, ইহা যে কেবল মনুষ্য দেহ বিনিস্ক্রান্ত তাড়িতপ্রবাহের পরিচালনা মাত্র, তাহার আর কোন সংশয় নাই। অতএব তাড়িত-প্রবাহের বার্ত্তা যে প্রাচীন আর্য্যেরা বিশেষ অবগত ছিলেন, সে পক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

২২। অতএব তাড়িতপ্রবাহ রাইখেনব্যাকের ভ্রম বা কল্পনাপ্রসূন নহে। তাড়িতপ্রবাহ একটি সত্ত্বা; অতি প্রাচীন-কাল হইতে আর্য্যেরা ইহার তত্ত্ব জানিতেন এবং ইহা দ্বারা অনেক কার্য্য সাধন করিতেন। আধুনিকেরাও এই প্রবাহ দ্বারা চিকিৎসা প্রভৃতি নানা কার্য্য সাধন করিতেছেন, বৈজ্ঞানিকেরা তদ্দর্শনে ইহার অস্তিত্বের অপলাপ করিতে পারেন না। যদিও মুক্তকণ্ঠে ইহাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া

স্বীকার না করেন, তথাপি সর্ব্বসাধারণকর্ত্তৃক ইহা যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলিয়া পরিগৃহীত হইতেছে, তাহার প্রতিবাদ করেন না। ফলতঃ আজি কালি তাড়িতপ্রবাহ বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। অরা তাড়িত প্রবাহের ন্যায় সর্ব্বসাধারণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, কিন্তু অনেকেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং ইহার প্রভাবে নানা প্রত্যক্ষ ফল হইতেছে, তাহাও লোক দেখিতেছে। অরা বা সংসর্গ ও সংস্রবের প্রভাবে যে পবিত্রতা বা অপবিত্রতা জন্মে, কি স্বভাব চরিত্র বিকৃত বা সংস্কৃত হয়, ইহা নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয়। এমন কি, যদি এক জাতীয় জীব অপর জাতীয় জীবের সংসর্গ করে, তবে প্রবলবীর্য্যজীবের প্রভাবে হীনবীর্য্যজীব অভিভূত হয় দেখা গিয়াছে। আমরা শুনিয়াছি এবং অনেকে দেখিয়াছেন, যে মানবশিশু যদি দৈবাৎ নিকৃষ্ট জন্তুর স্ত্রীজাতির আয়ত্ত হয়, তবে সেই জন্তু শিশুকে নিজের গর্ত্তে বা আবাস স্থানে লইয়া যায়, গিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে তাহাকে লালন পালন করে, অনন্তর সেই শিশুপালয়িত্রী জন্তুর ভাবাপন্ন হয়। তাহার মানুষের ন্যায় বাক্‌স্ফূর্ত্তি হয় না, সে জন্তুর ন্যায় চীৎকার করে, জন্তুর ন্যায় চতুষ্পদেই গমনাগমন করে অর্থাৎ ২ হাতে ২ পায়ে হামাগুড়ি দিয়া চলে এবং বিজাতীয় জন্তু দেখিয়া নিকৃষ্ট জন্তুর ন্যায় আঁচ্‌ড়ায় কামড়ায়। চেতনপদার্থের কথা দূরে থাকুক. সাহিত্য পর্য্যন্ত সংসর্গ প্রভাবের আয়ত্ত হয়। যথা,—

"নূনং নীচ জনৈঃ সঙ্গোহানয়ে স্থুরসেবিতা।
দাস যোগেন সাকালী দৃশ্যতে হ্রস্বতাংগতা॥"

অর্থাৎ নীচের সংসর্গে নিশ্চয়ই হানি হয়। এমন যে স্থরসেবিতাকালী তিনিও দাসযোগে হ্রস্ব হইয়া যান। কালী দীর্ঘ ঈকারান্ত শব্দ, কিন্তু দাস শব্দ তাহাতে যোগ করিলে অর্থাৎ কালিদাস লিখিতে হইলে দীর্ঘ ঈকার স্থানে হ্রস্ব ইকার হয়। সংসর্গ প্রভাব সকল কালে সকল স্থানে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন; যে সময় যীসস্ ক্রাইষ্ট পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া জীবের পরিত্রাণার্থে জীবকে ধর্ম্ম উপদেশ দেন এবং উৎকট ও দুশ্চিকিৎস্য রোগাক্রান্ত লোকদিগের শান্তি বিধান করেন, সেই সময় একটি স্ত্রীলোক রক্তস্রাব রোগে একাদিক্রমে দ্বাদশবর্ষ আক্রান্ত হইয়া যথাসর্ব্বস্ব চিকিৎসায় ব্যয় করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারে নাই। সেই স্ত্রীলোক এক দিবস প্রচ্ছন্নভাবে ক্রাইষ্টের পশ্চাদ্দেশে আসিয়া তাঁহার গাত্রাবরণপ্রাবারক স্পর্শ করিল; করিবামাত্র তাহার শোণিতস্রাব বন্ধ হইল। ক্রাইষ্ট বুঝিতে পারিয়া সহচর অনুচরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আমাকে স্পর্শ করিল?" তাহারা উত্তর করিল, "এত লোক আপনার সঙ্গে চলিতেছে, আপনাকে কেহ স্পর্শ করিবে তাহার আশ্চর্য্য কি?" ক্রাইষ্ট বলিলেন, "হাঁ, অবশ্যই কেহ-না-কেহ আমাকে স্পর্শ করিয়াছে, কেন না আমার শক্তি ক্ষয় হইল বলিয়া অনুভূতি হইতেছে।"

২২। অনতিদীর্ঘকাল হইল, কলিকাতার কিঞ্চিৎ

উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নামধারী যে পরমহংসদেব ছিলেন, এক দিবস তাঁহার আহারের সময় হইয়াছে, যথাস্থানে স্থান মার্জ্জনা করিয়া আসন বিস্তার করিয়া দেওয়া হইয়াছে, দেব আসনে উপবেশন করিলেই আহার দ্রব্য দেওয়া হইবে। পরমহংসদেব আসনে বসিতে যাইতেছেন, বসিতে পারেন না, ২।৩ বার উদ্যম করিলেন; কিন্তু যেন ধাক্কা খাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আসিতে লাগিলেন। অনন্তর বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আসন পাতিয়াছে? এ আসন উঠাইয়া আসনান্তর বিস্তার করিয়া দাও।" তাহাই করা হইল। তখন পরমহংসদেব আসনে বসিয়া আহার করিলেন। পশ্চাৎ অনুসন্ধান দ্বারা জানা গেল, যে ব্যক্তি প্রথম আসন বিস্তার করিয়া দেয়, সে অতি অন্ত্যজ ও অপবিত্র লোক।

এই সকল বৃত্তান্তে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, যে সংসর্গ প্রভাব সকলেই স্বীকার করেন। এবং যীসস্ ক্রাইষ্ট নিজে তাহা স্বীকার করিয়াছেন; ফলতঃ সংসর্গ প্রভাব কেহই অপলাপ করিতে পারে না। তবে শাস্ত্রে এক দেহ হইতে দেহান্তরে পাপসংক্রমণের কথার যে উল্লেখ আছে, তাহা অবিশ্বাসী নাস্তিকগণের পক্ষে নিতান্ত দুর্ব্বোধ; কেননা পাপ পুণ্যের আকার তাহারা কখন দেখে নাই, অথবা কিরূপ যান অবলম্বন করিয়া তাহারা অন্য দেহে সঞ্চরণ করে, তাহাও তাহারা দেখে নাই, কিন্তু পাপীর সংসর্গে থাকিলে পাপী ও পুণ্যবানের সংসর্গে থাকিলে পুণ্যবান হয়, ইহা সকলেই দেখে ও

স্বীকার করে। সে পাপ ও পুণ্য যদি নিকটস্থ পাপী ও পুণ্যবানের দেহ হইতে না আইসে, তবে আর কোথা হইতে আইসে? অতএব থিওসফিষ্টরা যে অরার আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই অতি যুক্তি যুক্ত ও সুন্দর মত বলিয়া বোধ হইতেছে এবং এতৎসম্বন্ধে এত বিচার ও এত বাগাড়ম্বর কেবল প্রত্যক্ষবাদিদিগের জন্যই আবশ্যক হইল। আমরা যদিও অরা প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে অসমর্থ হইয়াছি, তথাপি রাইখেনব্যাকের তাড়িতপ্রবাহের কথা যাহা আমরা উপরে বলিয়াছি, তদ্দ্বারা অরার অস্তিত্ব যে সম্ভব, তাহা বোধহয় প্রতিপন্ন হইয়াছে।

২৩। অরার যে সকল প্রত্যক্ষ ফল উপরে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মেস্‌মেরিজম্‌, হিপ্‌নটিজম্‌ অপেক্ষা আশ্চর্য্য ও বিস্ময়জনক, অতএব তাড়িৎপ্রবাহ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, অথচ তাহার ফলের প্রত্যক্ষতা দেখিয়া যখন বৈজ্ঞানিকেরা তাড়িৎপ্রবাহ বৈজ্ঞানিক সত্য এ কথার প্রতিবাদ না করেন, তখন অরার প্রভাবে যে আশ্চর্য্য ফলোদয় হয়, তদ্দর্শনে তাহার প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ না করিবেন কেন? অর্থাৎ অরাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিতে কেন আপত্তি করিবেন? ফলতঃ অরা বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইবার সম্পূর্ণ অধিকারী। হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র, ও বৈদ্যক হইতে উপরে যে সকল বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা অরামূলক বলিয়া তাহারও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। শাস্ত্রোদ্ধৃত

বচনগুলি অরামূলক বলাতে এই আপত্তি হইতে পারে যে শাস্ত্র অতি প্রাচীন, কিন্তু অরা থিওসফিষ্টগণ আজি দুই দিন আবিষ্কার করিয়াছেন, তবে শাস্ত্রের বচন কিরূপে অরামূলক হয়? থিওসফিষ্টগণ সম্প্রতি এই বিষয়ের চর্চ্চা করিতেছেন বলিয়া অরা আজি দুই দিবস আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু অরা পদার্থটি আবহমান কালই আছে। আর্য্যেরা যখন এ বিষয়ের অনুশীলন করেন, এই পদার্থ তাঁহাদের গোচর হয়; তাঁহারা কোন্ বিশেষ শব্দদ্বারা এই পদার্থকে অভিহিত করিতেন, তাহা আমরা জানি না সুতরাং আমরা তাহার বায়ুকোষ নাম দিলাম। অরা সম্বন্ধে জ্ঞান আর্য্যদিগের স্বতঃই স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, থিওসফিষ্ট বা অন্য কোন তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের নিকট হইতে তাঁহারা এই জ্ঞান লাভ করেন নাই। যদি রাইখেনব্যাকের তাড়িতপ্রবাহ ও অরা উভয়কেই বৈজ্ঞানিকেরা অগ্রাহ্য করেন, তবে ডাক্তার য্যাগর যে এক নূতন মতের অবতারণা করিয়াছেন, হিন্দুশাস্ত্রের মত সমর্থন করিবার জন্য আমাদিগকে সেই মতের সহায়তা অবলম্বন করিতে হইবে। সে মত নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে যথা;—

২৪। জীব শরীরের অভ্যন্তরে যে জীবনীশক্তির আধার আছে, যাহাকে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা প্রটোপ্লাজম্ বলেন, এই প্রটোপ্লাজমের পরমাণু সমূহের অন্তরে যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির বীজ নিহিত থাকে, যাহা ক্রমশঃ অঙ্কুরিত ও স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই

প্রটোপ্লাজমের আকার সকল দেহেই—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষাদির—সকল শরীরেই এক প্রকার; অর্থাৎ অতি কোমল, স্বচ্ছ, সচল, তরল পদার্থ যাহা স্পর্শ করিলে হাতে লাগিয়া যায় ও বায়ু বা কোন বস্তুর আঘাত বিনা যাহার মধ্যে নিরন্তর বিধূনন হইতে থাকে। রাসায়ণিক বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে, যে প্রটোপ্লাজম্ সকল জীবেতেই সমান, কোন পার্থক্য নাই। এই এক প্রকার পদার্থ হইতে এত বিচিত্র আকার, বিচিত্র ধর্ম্ম, বিচিত্র স্বভাব, প্রকৃতির কিরূপে উদয় হয়, ইহার মীমাংসা বৈজ্ঞানিকেরা এ পর্য্যন্ত কিছুই করিতে পারেন নাই। ডাক্তার য্যাগর সংপ্রতি এই বিষম সমস্যার এক অপূর্ব্ব মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন, পৃথিবীতে যত জাতি ও যত শ্রেণীর জীব আছে, প্রত্যেক জাতি ও শ্রেণীর জীবের গাত্রে বিশেষ বিশেষ গন্ধ আছে; যে গন্ধ অপর জাতি বা শ্রেণীর জীবের শরীরের গন্ধ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক;—যথা কপোত জাতির গাত্রের গন্ধ একপ্রকার এবং সেই জাতির অন্তর্গত লক্কা, গোলা ও গ্রহবাজ প্রভৃতির গাত্রের গন্ধ আর এক প্রকার; অর্থাৎ কপোত জাতীয় গন্ধের সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে কিন্তু সেটী একটী পৃথক গন্ধ। আবার এই সমস্ত গন্ধের সহিত কাক বা অন্য জাতীয় পক্ষীর গাত্রের গন্ধের সাদৃশ্য নাই। পুনশ্চ, একজাতীয় জীবের গায়ে ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ আছে; অর্থাৎ তাহার মাংসে একপ্রকার গন্ধ ও তাহার শরীরাভ্যন্তরে যে সমস্ত যন্ত্র আছে, তাহা হইতে যে রস ও ক্লেদাদি ক্ষরণ হয়, তাহার অপর এক প্রকার গন্ধ।

এই মাংসের গন্ধ ও ক্লেদাদির গন্ধের সমষ্টিতে জাতীয়গন্ধ হয়, এই বিষয় সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। লেখকের এক নপ্ত্রীর বাল্যকাল হইতেই দুগ্ধে অতিশয় বিতৃষ্ণা, এক বিন্দু দুগ্ধ তাহার গলাধঃকরণ করায় কাহার সাধ্য? এখন সে বয়স্থা হইয়াছে, এখনও দুগ্ধে বিতৃষ্ণা। লেখক এক দিবস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, তুই দুধ খাইস্ না কেন?" সে তাহার সরল সুস্পষ্ট ভাষায় উত্তর করিল, "ঠাকুরদাদাবাবু, দুধে কেমন গরু গরু গন্ধ কয়।" জীবের দুগ্ধে যখন গন্ধ, তখন তাহার মাংসে বা রক্তে কত তীব্র গন্ধ হইবে! কোন জীবের শরীরের এক বিন্দু রক্ত যদি কোনও প্রকার রাসায়নিক অম্লসহকারে বিশ্লেষণ করা যায়, অর্থাৎ যে যে পদার্থে তাহার উৎপত্তি, তৎসমুদয়ের অণুগুলি পৃথক করা যায়, তাহা হইলে অম্ল যদি মন্দবীর্য্য হয় এবং বিশ্লেষণক্রিয়া ধীরে ধীরে হয়, সেই জীবের মাংসের বা জাতীয়গন্ধ নির্গত হয়। অম্ল প্রবলবীর্য্য হইলেও বিশ্লেষণ শীঘ্র হইতে থাকিলে, তদিতর অন্য ক্লেদাদির গন্ধ বিকাশ পায়। জীবের আহারদ্রব্য পরিবর্ত্তন করিলে এ গন্ধের পরিবর্ত্তন হয় না,—সামান্য তারতম্য হইতে পারে; কিন্তু সে জাতীয়গন্ধের সামান্য বিকার মাত্র।

এতদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে, যে জীবশরীরে যত রক্ত আছে, তাহার প্রতি বিন্দুতে এমন কি যাবতীয় পরমাণুতে এই গন্ধ নিহিত আছে, আর এ গন্ধ যখন আহারের অনুগামী নয়, অর্থাৎ আহার্য্যদ্রব্যের গুণে ইহার উৎপত্তি হয়না, তখন

ইহা যে আভ্যন্তরিক জীবের ধর্ম্ম, সে পক্ষে কোন সংশয় নাই, ইহা জীবের প্রটোপ্লাজমের ধর্ম্ম। ভিন্ন ভিন্ন জীবের প্রটোপ্লাজমে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গন্ধময় পদার্থ নিহিত আছে। এই গন্ধময় পদার্থই সকল বৈচিত্র্যের মূলীভূত, ইহাই প্রকৃত প্রটোপ্লাজম, জীবনীশক্তির আধার ; আকার, স্বভাব, প্রকৃতির প্রকৃত নিদান। স্বভাবতঃ গন্ধ সচল, ব্যাপক, বিস্তারশীল ; ইহার সূক্ষ্মরেণু সকল সহজেই এক দেহ হইতে দেহান্তরে যাইতে পারে। অতএব বৈজ্ঞানিকেরা যদি অরা বা তাড়িতপ্রবাহ সাধারণের দৃষ্টিগোচর নয় বলিয়া তাহাদিগের অস্তিত্ব স্বীকার না করেন, তথাপি এক দেহ হইতে পাপ পুণ্যের বীজ দেহান্তরে সঞ্চরণের পথরোধ হইতেছেনা। ডাক্তার য্যাগরের এই মতানুসারে সকল দেহে যে গন্ধময় পদার্থ নিহিত আছে, সেই পদার্থের রেণুকে আশ্রয় করিয়া তত্তদ্দেহের পাপ ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বীজ নিকটস্থ দেহান্তরে সহজেই প্রবিষ্ট হইতে পারে।

২৫। বিজাতীয়েরা ও আমাদিগের দেশের ইংরাজী-শিক্ষিত যুবকেরা যতই বিজ্ঞতা করুন্, যতই উপহাস করুন্, যদি দেহের শুদ্ধি, পবিত্রতা চান্, তবে শাস্ত্রের আদেশানুসারে কার্য্য না করিলে কোন ক্রমেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

২৬। হিন্দুরা দরিদ্র জাতি ; অর্থাৎ সাংসারিক সুখ ও সমৃদ্ধির দিকে তাঁহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি কোন কালে না থাকাতে, তাঁহাদিগের আর্থিক সচ্ছলতা কখনই দেখা যায় না।

এরূপ লোকে ব্যয়ের লাঘবতা খুঁজে, অতএব পৃথক শয্যাসন-যানাদির ব্যবস্থা করিয়া যাহাতে ব্যয়ের বাহুল্য হয়, তাহার কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে তাঁহারা কেন করিবেন? অপর একত্র শয়ন, ভোজন গমনাগমন করাতে পরস্পর প্রণয় বৃদ্ধি হয়; অতএব তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে এই সমস্ত সুবিধা ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা কোন মতে সম্ভবে না। মনুষ্যদেহ হইতে অরা নির্গম নিরন্তর হইতেছে; তাহা তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিতেন এবং দূষিত অরা দ্বারা যাহা স্পৃষ্ট বা আলোড়িত হয়, তাহাও যে দূষিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এইজন্য তাঁহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন, যে শয্যা-সনাদি সম্বন্ধে বিচার করিয়া ব্যবহার করিবে। শয়নোপ-বেশনে শয্যাসনাদির বিচার ও আহার আলাপনে সংসর্গের বিচার, শ্রেয়োর্থী পুরুষ অবশ্যই করিবেন। আমাদের বোধ হয়, শাস্ত্রের উপদেশ বিশিষ্টরূপে প্রতিপালন করিতে হইলে অর্থাৎ অরার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইলে, আমাদিগের দাস দাসী দ্বারা পাদসম্বাহন, পাদপ্রক্ষালন, গাত্রমর্দ্দন বা তৈলাভ্যঙ্গাদি করান উচিত নহে। অতি নিকৃষ্ট জাতীর দাস দাসী দ্বারা শিশুপালন করানও অনু-চিত; কেন না সুকুমারমতি ও সুকুমারদেহ শিশু সর্ব্বদা নিকৃষ্ট জাতীর লোকের অরার মধ্যে থাকিলে তাহার দেহ ও মতি নিশ্চয়ই বিকৃত হইবে। ফলতঃ দূষিত অরা বা বায়ুকোষের প্রভাব হইতে আমাদিগকে রক্ষা করাই ধর্ম্ম শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, অতএব যে স্থলে বা কার্য্যে দূষিত

অরার প্রভাবে অভিভূত হওয়ার সম্ভাবনা, সেই স্থল ও সেই কার্য্য হইতে অবসৃত ও পরাঙ্মুখ হওয়া আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। দেহ ও স্বভাবের পবিত্রতার উপর আমাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মঙ্গল সম্যক্‌রূপে নির্ভর করে। যাঁহাদিগের এই আধ্যাত্মিক মঙ্গল ও উন্নতির প্রতি বিশেষ অনুরাগ নাই, অর্থাৎ যাঁহারা আধ্যাত্মিক মঙ্গলকে মঙ্গল বলিয়া গণনা করেন না, তাঁহারা এই অরা ও অরা সম্বন্ধীয় উপদেশের প্রতি ঔদাস্য করিতে পারেন, কিন্তু তদ্ভিন্ন আর কেহ সেরূপ আচরণ করিলে তাঁহার সর্ব্বনাশ হয়!

২৭। হিন্দু, শাস্ত্রের উপদেশানুসারে বিশুদ্ধ, সদাচার, সচ্চরিত্র, পবিত্র লোক ভিন্ন, কাহারও সংসর্গ করেন না, অর্থাৎ কাহারো সহিত একাসনে উপবেশন বা একত্রে বসিয়া আহার আলাপন করেন না। অনেক কৃতবিদ্য-লোক বলেন, যে হিন্দুর এই ব্যাবর্ত্তকতাই তাঁহার অবনতির নিদান এবং এই মত সমর্থনের জন্য তাঁহারা প্রাচীন জিউ বা ইহুদীদিগের ও আধুনিক জাপানীয়দিগের দৃষ্টান্ত দেন; তাঁহারা বলেন যে জিউগণ আচার লইয়া যৎপরোনাস্তি গোলযোগ করিতেন, সেই জন্য তাঁহারা, এখন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, এবং জাপানীয়েরা জাতীয়তার মস্তকে পদার্পণ করিয়া উন্নতজাতির আচার ব্যবহার অনুকরণ করিয়া বিলক্ষণ উন্নতিশীল হইয়াছেন। এই কথা নিতান্ত অমূলক। হিন্দুর কোন বিষয়েই উন্নতি লাভের ত্রুটী ছিল

না। ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, দর্শন, বেদ বেদান্ত, ধর্ম্ম-নীতি, রাজনীতি, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি, বিদ্যার সকল বিভাগেই হিন্দু অতি প্রাচীন কালে যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, আধুনিক উন্নতিশীল জাতিদিগের মধ্যে কেহ সেইরূপ উৎকর্ষ অদ্যাপিও লাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু হিন্দুর যখন এই উন্নতি হয়, তখন তাঁহার অতি ঘোরতর অপ্রতিহত ব্যাবর্ত্তকতা ছিল, এখন সেই ব্যাবর্ত্তকতার শৈথিল্য হইতেছে, আর তাঁহার অবনতি ও দ্রুতবেগে আরম্ভ হইয়াছে। জাপানীয়েরা যে স্বজাতীয় ভাষা, স্বজাতীয় বেশ ভূষা, স্বজাতীয় আচার ব্যবহার বিসর্জ্জন করিয়া ইংরাজি ভাষা, বেশ ভূষা, আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে তাঁহারা যাহা ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। হিন্দু কি সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ইংরাজি অবলম্বন করিতে পারেন। পৃথিবীর কোন জাতি সংস্কৃতভাষার সহিত পার্থিব উন্নতির বিনিময় করিতে পারেন? সকল পার্থিব উন্নতিতে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল মাত্র সংস্কৃতভাষার স্বামিত্ব অর্থাৎ "সংস্কৃতভাষা আমাদিগের" এই কথা বলিবার অধিকার লইয়া আমরা সুখী হইতে পারি। ফলতঃ জাপানীয়দিগের উন্নতি যে অনুকরণপ্রিয়তা ও অনুকরণশীলতামূলক অর্থাৎ তাহারা ইংরাজি আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া, বেণী* সংহার করিয়া, যে

* চীন জাতীয়দিগের ন্যায় জাপানীয়দিগের কেশপাশ বিন্যস্ত হইয়া পুচ্ছের আকারে পৃষ্ঠদেশে লম্বমান থাকিত। এই বিন্যস্ত কেশপাশ বা বেণী

উন্নত হইয়াছেন এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা জাতি-তত্ত্বের রহস্য কিছুই জানেন না। হিন্দু সকলের সহিত সংসর্গ করেন না, অবাধে সকলের সহিত মিলিত হইয়া একত্র আহারালাপনাদি করেন না বলিয়া তিনি কাহাকেও ঘৃণা বা দ্বেষ করেন না; তাঁহার শাস্ত্র তাঁহাকে স্পষ্টাভিধানে উপদেশ দিতেছে, "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।" একত্রে সহবাস, একত্রে আহারাদি করিলে প্রণয় বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু এইরূপ ব্যবহার যে প্রণয় ও মিত্রতার একমাত্র কারণ, তাহা নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, ১৭৭২ কি ১৭৭৩ সালে মুর্শিদাবাদে মির-কাশীমের সহিত যুদ্ধে ইংরাজেরা পরাজিত হইয়া যখন পলায়ন করেন, হেষ্টিংস্ সাহেব যিনি পরে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারল হন, তিনি কান্তবাবুর বিপনির মঞ্চের নীচে লুক্কাইত থাকেন। কান্তবাবু সাহেবকে ৩।৪ দিন খেচরান্ন খাওয়াইয়া লুকাইয়া রাখেন। অনন্তর শত্রুহস্তে পতিত হইবার ভয় তিরোহিত হইলে, হেষ্টিংস সাহেব স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কান্তবাবু সাহেবদিগের সহিত আহার করিতেন না. সাহেবদিগের সংসর্গ করিতেন না, তথাপি

কেহ স্পর্শ করিলে, জাপানীয়েরা তাঁহাদিগের ধর্ম্মের উপর অত্যাচার হইল বলিয়া মনে করিতেন এবং যে স্পর্শ করিত, তাহার উপর বিজাতীয় ক্রোধ করিতেন। এখন তাঁহারা সাহেব হইবার জন্য এই মহাপুণ্যময়বেণী কর্ত্তন করিয়াছেন।

তাঁহার সাহেবের প্রতি দ্বেষ ভাব ছিল না এবং বিপৎ-কালে অজ্ঞাতকুলশীল সাহেবকে সাহায্য করিতে ক্রটী করেন নাই।

"পরোঽপি হিতবান বন্ধুঃ বন্ধুরপ্যহিতঃ পরঃ
অহিতোদেহজ ব্যাধিঃ হিতমারণ্যমৌষধং ॥"

২য় অধ্যায়।

যেখানে ইচ্ছা সেই খানে বসিলাম, কি শয়ন করিলাম, যাহা উপস্থিত হইল তাহাই খাইলাম, যখন যেখানে যাইতে ইচ্ছা হইল, সেইখানে চলিলাম, এইরূপ আচরণকে যথেচ্ছাচার বলে। যথেচ্ছাচারি হিন্দুর পক্ষে শক্ত গালি। যথেচ্ছাচারি হওয়া হিন্দুর বড় নিন্দার বিষয়। হিন্দুর সকল কার্য্যেরই নিয়ম আছে। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলা আজিকালি হিন্দুসন্তানের পক্ষে বড় অরুচি ও বড় বিরক্তিকর হইয়াছে। এই সকল নিয়ম ও শাসনের প্রভাবে অধীর হইয়া তাঁহারা বলিয়া উঠেন, "নিজের স্বাধীনতার উপর এরূপ হস্তার্পণ করা নিতান্ত অশাস্ত্রীয়, এই জন্যই শাস্ত্রের মান থাকেনা।" আরে অবোধ! যাহাতে অমঙ্গল হইবে, অনিষ্ট হইবে, তাহার প্রতিষেধ করিলে কি স্বাধীনতার প্রতি হস্তার্পণ হইল? যাহা মনে আইসে তাহাই কর, করিয়া রোগগ্রস্ত হও, দায়গ্রস্ত হও, বিপন্ন হও, যন্ত্রণা পাও, মর, ইহা হইলে কি স্বাধীনতা রক্ষা হইল? ফলতঃ আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদিগের শাস্ত্রে যে সকল নিয়ম বা শাসন আছে, সমস্তই মানুষের হিতের জন্য।

হিন্দু-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, কিরূপে তাঁহার চিত্তশুদ্ধি ও পবিত্রতা হইবে, যদ্দ্বারা তিনি পরব্রহ্মের ধ্যান-ধারণার

অধিকারী হইবেন এবং চরমে সেই পরম পদার্থ লাভ করিবেন, অর্থাৎ প্রত্যক্ষানুভূতি করিয়া তাহাতে লীন হইবেন। অতএব হিন্দুর আচারব্যবহারগত যাবতীয় নিয়ম সকলই এই লক্ষ্যসাধনের অনুকূল ও উপ-যোগী। এই জন্য হিন্দুর আচারগত বিধি, নিষেধ, ধর্ম্ম্য বিধি নিষেধের ন্যায় পরিগণিত হয় এবং তাহাদিগের অপালনে অধর্ম্মাচরণ হয় ও আচারভ্রষ্টব্যক্তি ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া নিন্দিত ও ঘৃণিত হয়। সাত্ত্বিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসনা, সত্যনিষ্ঠা, জীবে দয়া ও দানাদি-কার্য্য এবং সাত্ত্বিক আহারাদি দ্বারা পবিত্রতা জন্মে ও পূর্ব্বা-ধ্যায়ে যে অরা বা বায়ুকোষের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই অরা বা বায়ুকোষঘটিত নিয়ম সকল পালন দ্বারা অর্থাৎ সংসর্গ ও সংস্রব সম্বন্ধে যে সমস্ত শাস্ত্রীয় শাসন আছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে এই পবিত্রতা সংরক্ষিত ও সংবর্দ্ধিত হয়। হিন্দুর আচারগত বিধি নিষেধ প্রধানতঃ এই অরা বা বায়ুকোষমূলক।

হিন্দুদিগের এত বড় বিস্তীর্ণ চিকিৎসা শাস্ত্র, ইহার প্রণ-য়ন ও তাঁহাদিগের সাধন ভজনের সৌকর্য্যার্থ। ঋষিগণ যখন দেখিলেন, যে শারীরিক পীড়া ও গ্লানিতে তাঁহাদিগের ভজন কার্য্যের বিশেষ বিঘ্ন হয়, তখন তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া চিকিৎসাশাস্ত্রের সৃষ্টি করিলেন। আচার সম্বন্ধে অনেক বিধি নিষেধ এই চিকিৎসাশাস্ত্রমূলক দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক বিধি নিষেধ ফলিত জ্যোতিষ-

মূলকও আছে এবং রুচি ও অভ্যাসমূলক অনেকগুলি আছে। অনেক বিধি ও অনেক নিষেধের মূল আমরা পাই না এবং তাহার যুক্তিও আমরা উদ্ভাবন করিতে পারি না; কিন্তু তাই বলিয়া যে সে সকল অযৌক্তিক, তাহা বলা যায় না। এই সংসর্গ ও সংস্রবঘটিত বিধি নিষেধত এত কাল উপহাসের বিষয় ছিল, বিজাতীয়েরা তৎসমুদয়কে বাতুলতা বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেন, এবং অস্মদ্দেশীয় কৃতবিদ্যপুরুষেরা সেই রূপ করিতেন; কিন্তু থিওসফিষ্ট-দিগের অরার আবিষ্কারে তৎসমুদয়ের বৈজ্ঞানিকমূল আছে বলিয়া সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে। এইরূপ যে সকল বিধি নিষেধের যুক্তি বা মুল এখন আমাদিগের অপরিজ্ঞাত, কালসহকারে তাহাদিগের মূল ও যুক্তিও আবিষ্কৃত হইবে ও উপহাসকারী বিজ্ঞবরদিগের ভ্রমপ্রমাদ স্পষ্টীকৃত হইয়া তাঁহারাই শেষে উপহাসাস্পদ হইবেন। এই গ্রন্থ প্রণয়নে, আমাদিগের এমন উদ্দেশ্য নহে যে হিন্দুদিগের যাবতীয় আচার ব্যবহার যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমরা প্রতিপন্ন করিব। ইদানীং ভারতবর্ষে নানা জাতীয় লোকের সমাগম হইয়াছে, তাঁহারা ভারতবর্ষীয়দিগের আচার ব্যবহার সম্যক্‌রূপে না জানিয়া, ভারতবর্ষীয়দিগকে অজ্ঞান বশতঃ অনেক বিষয়ে দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, যে বিষয়ে তাঁহাদের দোষের লেশ মাত্র নাই। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক যখন ভারত-বর্ষে গভর্ণরজেনারেল অর্থাৎ শাসনকর্ত্তার পদে অধিরূঢ় ছিলেন, তিনি কলিকাতার জনৈক প্রাচীন, প্রবীণ, বহুদর্শী

বিচক্ষণ বাঙ্গালিবাবুকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। বাবুটি জাতিতে কায়স্থ এবং কলুটোলাগ্রামে তাঁহার বাস ছিল। তিনি অতীব ধার্ম্মিক, শ্রদ্ধাস্পদ এবং সমাজে সকলের মান্য ছিলেন। লাটসাহেবের নিকট তিনি সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। এক দিবস প্রাতঃকালে তিনি কৃতস্নান কৃতাহ্নিক হইয়া দক্ষিণহস্তে মালা ধারণ পূর্ব্বক জপ করিতে করিতে রাজপ্রতিনিধির দর্শনার্থী হইয়া লাটসাহেবের বাটীতে চলিলেন। প্রাসাদে উপনীত হইয়া বাবু লাটসাহেবের নিকট তাঁহার টিকিট পাঠাইয়া দিলেন। লাটসাহেব তাঁহাকে এতই স্নেহ করিতেন যে, তিনি সাক্ষাৎ করিতে গেলে সকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন। বাবুর টিকিট পাইবামাত্র, লাটসাহেব প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতে সোপানাবলীর উপর আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং বাবু নিকটস্থ হইলে, হস্ত মর্দ্দন করিবার জন্য দক্ষিণহস্ত প্রসারণ করিলেন। বাবু দক্ষিণহস্তে জপ করিতে-ছিলেন,সুতরাং বামহস্ত দ্বারা লাট সাহেবের হস্ত গ্রহণ করি-লেন। লাটসাহেব তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইলেন না। তবে বাবু ইউরোপীয়জাতির শিষ্টাচার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা-প্রযুক্ত এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, মনে করিয়া, লাটসাহেব বলিলেন, "বাবু, আমি ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল, আমি দক্ষিণহস্ত তোমাকে দিলাম,তুমি আমাকে বামহস্তটা দিলে ?" বলিয়া কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। বাবু তখন জপমালা লাটকে দেখাইয়া বলিলেন, "আমি এই হস্তে যাঁহার কার্য্য

করিতেছি, তাঁহার কার্য্য হইতে ইহাকে অপসারিত করিয়া যদি আপনার কার্য্যে নিয়োগ করিতে বলেন, তবে তাহাই করি।” লাট সাহেব দেখিয়া অপ্রতিভ হইলেন এবং তাঁহার অনুচিত উক্তি হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিলেন। এইরূপে হিন্দুর আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত অনেক স্থলে তাহাকে অকৃতাপরাধে অপরাধী করা হয়; অতএব সে আচার ব্যবহার কি, তাহা বিজাতীয়দিগের জ্ঞাপনার্থ আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে প্রকাশ করিব, ইহাই আমাদিগের বিনীত উদ্দেশ্য।

৩য় অধ্যায়।

"আচারাল্লভতেহ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণম্ ॥"

মানুষের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক পুষ্টি ও শান্তির জন্য যে কতকগুলি নিত্য অনুষ্ঠেয় কার্য্য আছে এবং যে কার্য্যগুলি এক সমাজের যাবতীয় লোকে এক প্রণালীতে নিত্য অনুষ্ঠান করে, তাহাকে আচার বলা যায়। প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করা অবধি আবার রাত্রিকালে শয্যাতে গমন করা পর্য্যন্ত হিন্দু যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহা আমরা ক্রমশঃ বলিতেছি।

পশ্চিমযামে গাত্রোত্থান।—হিন্দুর প্রভাতে গাত্রোত্থান করিবার সময় ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত (অর্থাৎ রাত্রির চারিদণ্ড কাল অবশিষ্ট থাকিতে যে সময়) রাত্রিকে ত্রিযামা যামিনী কহে, অর্থাৎ তিন প্রহর পরিমিত কাল রাত্রির অবস্থিতি। দিবা রাত্রির সমান মান, অর্থাৎ চারি প্রহর দিবা ও চারি প্রহর রাত্রি; কিন্তু রাত্রির প্রথম প্রহরের প্রথম চারি দণ্ড ও শেষপ্রহরের শেষ চারি দণ্ড দিবামানের মধ্যে পরিগণিত হয়, এই জন্য রাত্রির চারি দণ্ড থাকিতে দিবা গণনা করা যায় এবং সেই সময়েই গাত্রোত্থান করা বিহিত বলিয়া শাস্ত্রে উদিত হইয়াছে।

নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়াই, হিন্দুকে কতকগুলি সংস্কৃতশ্লোক পাঠ করিতে হয় যথা ;—

প্রভাতেযঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ং,
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।
অহং দেব নচান্যস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি নশোকভাক্,
সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং নিত্য মুক্তস্বভাববান্।
লোকেশ চৈতন্য ময়াধিদেব মঙ্গল্য বিষ্ণোর্ভবদাজ্ঞয়ৈব,
হিতায় লোকস্য তব প্রিয়ার্থং, সংসারযাত্রা মনুবর্ত্তয়িষ্যে।
জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তি জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তি,
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।
ইত্যাদি।

আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই এই শ্লোকগুলি পাঠ্য। যাহাদিগের সংস্কৃত আয়ত্ত নাই, তাহারা অন্ততঃ দুর্গানাম স্মরণ করিবে। নিতান্ত বালক যার দুর্গা কি সামগ্রী বোধ নাই, তাহাকেও কলের মত দুর্গা দুর্গা শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়। অভ্যাস গঠনের নিমিত্ত এইরূপ শাসন আছে।

প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, দুর্গা দুর্গা এই দুইটি অক্ষর যে ব্যক্তি প্রভাতে উঠিয়া স্মরণ করে, সূর্য্য উদয়ে যেমন অন্ধকার নাশ হয়, সেই ব্যক্তির বিপদ সমস্ত দুর্গানাম-স্মরণ করাতে সেইরূপ নষ্ট হয়। দ্বিতীয় শ্লোকটি পরমাত্মার ধ্যান মাত্র। আপনার আত্মায় পরমাত্মার চিন্তা, যথা ;—আমি দেবতা, দেবতা ভিন্ন আমি আর কিছুই নহি, আমি ব্রহ্ম, আমাকে শোক স্পর্শ করে না, সচ্চিদানন্দরূপ

নিত্য ও মুক্তস্বভাব। তৃতীয় শ্লোকে জীব সেই পর-ব্রহ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে, "প্রভু! তোমার আজ্ঞা-ক্রমে তোমার প্রীতিসাধন ও জীবের হিতসাধনের জন্য আমি সংসার যাত্রায় প্রবৃত্ত হইতেছি।" চতুর্থ শ্লোক দ্বারা কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ যথা ;—

ধর্ম্ম কি আমি জানি, কিন্তু জানিয়াও তাহার অনুষ্ঠান করি না ; অধর্ম্ম কি তাহাও জানি, কিন্তু তাহা হইতে নিবৃত্ত হই না ; অতএব আমার প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আমার আয়ত্ত নহে। হে হৃষীকেশ! তুমি হৃদয়ে বাস করিয়া যেরূপ নিয়োগ করিতেছ, আমি সেইরূপ করিতেছি।

হিন্দু এইরূপে নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া সর্ব্বাগ্রে সেই অনন্তবীর্য্যা বৈষ্ণবীশক্তি দুর্গাকে স্মরণ করেন, করিয়া তাঁহার ধ্যান করেন এবং সংসারযাত্রায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহেন যে, "তোমারই প্রীতিসাধ-নের জন্য এবং জীবের হিতের জন্য আমি সংসারযাত্রায় প্রবৃত্ত হইলাম।" পরিশেষে তাঁহাতেই সকল কার্য্যের কর্তৃত্ব আরোপ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এইরূপে সেই সর্ব্ব-শক্তিমতীকে স্মরণ করিয়া নির্ভীকচিত্তে সংসারে বিচরণ করেন। কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগসূচক শ্লোকটির মর্ম্ম লইয়া অনেকে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, 'জীবের কার্য্য সম্বন্ধে যদি জীবের কোন কর্তৃত্বই নাই, তাহা হইলে দুষ্কর্ম্মান্বিত দুরাত্মারা কোন অসৎকর্ম্ম করিয়া অনায়াসে বলিতে পারে যে, "আমি কি করিব, ভগবান

যেরূপ প্রবৃত্তি বিধান করিয়াছেন, আমি সেইরূপ কার্য্যই করিয়াছি।’’’ এই বলিয়া দুষ্কর্ম্মের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে।

দুরাত্মারা কি বলিতে পারে বা কি বলিবে, সেই ভয়ে যে আমরা একটি প্রত্যক্ষ সত্য যাহা মহাজন-বাক্য দ্বারা সমর্থিত হইতেছে, তাহাকে অগ্রাহ্য করিব, ইহা কোন ক্রমেই হইতে পারে না। বলুক দুরাত্মারা যাহা বলিতে চায়, আমরা “ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি” বলিতে ছাড়িব না; অধিক কি, এই শ্লোকের কোন গূঢ়কূটার্থ বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া, ইহার সহজ অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক এই বাক্যেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিব। এই বাক্যের সত্যতা আমরা অনুদিন আমাদিগের জীবনে প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমরা সমীচীনরূপে বিবেচনা করিয়া কোন বিষয় সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাবধারণ করিলাম, কিন্তু কার্য্যকালে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিতে পারি না। আমাদিগের বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হয় এবং আমরা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বসি।

এইরূপ ঘটনা সর্ব্বদাই হইয়া থাকে, তবে আমাদিগের কার্য্য সম্বন্ধে আমাদিগের কর্ত্তৃত্ব কোথায়? যাহা হউক, “যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি” এই কথা বলিয়া দুরাত্মার অব্যাহতি পাইবার যো নাই। দুরাত্মা একটি নরহত্যা করিল। পাঠক! অবশ্যই জানেন, যে হিন্দুর অভিধানে (Accident) এক্সিডেন্ট শব্দ নাই; ইংরাজিতে যাহাকে

(Accident) বলে, আমরা তাহাকে "দৈব" বা "দৈবঘটনা" বলি ; অর্থাৎ সে ঘটনা দৈব কর্ত্তৃক ঘটিয়াছে। দুরাত্মা যে নরহত্যা করিল, কিম্বা নিহত ব্যক্তি যে দুরাত্মা কর্ত্তৃক নষ্ট হইল, এতদুভয়ের কোন ঘটনাই হঠাৎ বা অকস্মাৎ হইল এরূপ নহে। নিহত ব্যক্তি সেই সময়ে সেইরূপে মরিবে নিয়তি ছিল, হন্তা বা হত্যাকারীরও নিয়তি ছিল, যে সে সেই সময়ে সেইরূপে নিহত ব্যক্তিকে মারিবে ; তাই সে মরিল এবং অপর ব্যক্তি মারিল। এখন নিয়তি কোথা হইতে আইসে ? নিয়তি কি মানুষের কর্ম্মপ্রসূন নহে ? মানুষের পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি দুষ্কৃতি অনুসারে একটি অদৃষ্ট জন্মে। এই অদৃষ্ট প্রাক্তন, প্রারব্ধ, নিয়তি প্রভৃতি নানা শব্দে অভিহিত হয়।

হত্যাকারী বা হন্তা পূর্ব্বজন্মে এমন কোন কার্য্য করিয়া থাকিবে, যাহার জন্য রাজদণ্ডে তাহার প্রাণ নষ্ট হওয়া উচিত হয়। এইটি তাহার প্রাক্তন, প্রারব্ধ বা নিয়তি। এই নিয়তি প্রভাবে তাহাকে এমন প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়, যে ইহ জীবনে তাহাকে নরহত্যা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবেই হইবে ও পরিশেষে রাজাজ্ঞায় তাহার নিজের প্রাণদণ্ড হইবে। মানুষ এই প্রারব্ধমূলক প্রবৃত্তির উত্তেজনায় কার্য্য করে, অথবা নিয়তিরূপী ভগবান হৃষীকেশ তাহার হৃদয়ে বসিয়া প্রতিক্ষণ যে প্রবৃত্তি বিধান করেন, সেই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে। ভগবান হৃষীকেশকে নিয়তিরূপী বলা হইল, তাহার কারণ এই যে, তিনি

নিয়তির নিয়ন্তা বা নিয়োজয়িতা, তাঁহারই নিয়মানুসারে সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলরূপ নিয়তির উদয় হয়। অতএব নিয়তিই জীবের কর্ম্মের মূলপ্রবর্ত্তক। কর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার স্বায়ত্ততা নাই, কিন্তু নিয়তি তাহার কর্ম্মপ্রসূন অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল; সুতরাং ইহজন্মের কর্ম্মে স্বায়ত্ততা না থাকিলেও তৎসম্বন্ধে তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রহিতেছে; কেননা, ইহা তাহার জন্মান্তরীন স্বায়ত্তকর্ম্মের অপরিহার্য্য ফল মাত্র। তাঁহারা আপত্তি করেন যে, উক্ত শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে দুরাত্মা ও দুষ্টলোকেরা প্রশ্রয় পাইবে, তাহারা যাহা মনে হইবে অকুতোভয়ে তাহাই করিবে; তাঁহাদিগের এই আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক ও অসঙ্গত। যখন মানুষের কার্য্য সম্বন্ধে কোন স্বাধীনতা নাই, সে প্রারব্ধলব্ধ প্রবৃত্তির দাস হইয়া কার্য্য করে, তখন সে যাহা মনে করিবে, তাহাই করিবে ইহা কিরূপে সম্ভবে? আদৌ যাহা মনে হইবে তাহা করিতে সে অক্ষম, তাহার পর কার্য্য সম্বন্ধে তাহার কোন দায়িত্ব নাই, ইহা যে ভ্রমাত্মক বুদ্ধি, তাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, "যদি নিয়তির ফল অপরিহার্য্য, তবে অন্না সম্বন্ধে এত বিচার, সংসর্গ বিষয়ক এত উপদেশের কি আবশ্যক?" প্রারব্ধ দুর্ণিবার বটে, কিন্তু পুরুষকার দ্বারা ইহার আংশিক বা সম্পূর্ণ খণ্ডন হইতে পারে। প্রারব্ধলব্ধ প্রবৃত্তির দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করা, দুষ্প্রবৃত্তির সঙ্কুচন, সৎপ্রবৃত্তির বিস্ফারণ ও স্ফূর্ত্তিকরণ—

ইহাকেই পুরুষকার বলে। অনেকে জপোপবাস এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদি দ্বারা এই তুঃসাধ্য সাধনে সমর্থ হইয়া থাকেন। শিক্ষা, উপদেশ, সংসর্গ ও দৃষ্টান্ত এই অধ্যবসায়ের প্রবর্ত্তক। এই জন্য শিক্ষা উপদেশাদির ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রবৃত্তি, জীবের যাবতীয় চেষ্টা ও উদ্যমের নিদান, অর্থাৎ প্রারব্ধলব্ধ প্রবৃত্তির উত্তেজনায় জীব চেষ্টাবান হয়। কিন্তু চেষ্টা, সঙ্কল্প বলিয়া আর একটি প্রবল স্বাধীন বৃত্তি আছে, তাহার আয়ত্ত অর্থাৎ সঙ্কল্প চেষ্টা রোধ করিতে পারে, অথবা প্রবৃত্তির সহায় হইয়া চেষ্টাকে বলবতী করিতে পারে। প্রবৃত্তি স্বতঃই উদয় হয় এবং যতক্ষণ সে চরিতার্থ না হয়, ততক্ষণ তাহার উত্তেজনার প্রবাহ নিরন্তর বহিতে থাকে। সঙ্কল্পের উত্তেজক, শিক্ষা, উপদেশ, সংসর্গ ও দৃষ্টান্ত, এইগুলি অপসারিত হইলেই সঙ্কল্পের ক্রিয়া বন্ধ হয়। এইগুলি নিরন্তর উপস্থিত থাকিলে, এদিকে প্রবৃত্তির উত্তেজক বিষয়গুলি অপসারিত হইলে, সঙ্কল্প প্রবল হইয়া প্রবৃত্তিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া ফেলে। এই সঙ্কল্পের জয় ও প্রবৃত্তির পরাজয়কে পুরুষকার বলে।

ব্রাহ্মণ নিত্য যে গায়ত্রী উপাসনা করেন, প্রাতঃস্মর্ত্তব্যের শেষ শ্লোকটির সহিত তাহার বিলক্ষণ সুসঙ্গতি দেখা যায়। এই উপাসনাতে ব্রাহ্মণ জগৎ-প্রসবিতার সেই বরণীয় তেজকে ধ্যান করেন, যে তেজ আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করে। "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি

তথা করোমি” ইহাতে যদি কোন আপত্তি হয়, তবে উক্ত উপাসনাতে অনুরূপ আপত্তি হইতে পারে।

এই পশ্চিমযামে গাত্রোত্থান বিধিটি অতি অপূর্ব্ব বিধি। এই বিধি উভয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্র সঙ্গত। ইহা দ্বারা শারীরিক ও অধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য দুয়েরই পরিবর্দ্ধন হয়। নিশার নিবিড় তিমিররাশি শনৈঃ শনৈঃ অস্তমিত হইতেছে, দিবার প্রখর দুর্দ্দর্শ আলোক এখনও উদয় হয় নাই, তাহার পরিবর্ত্তে এক প্রকার ম্লান মধুর আলোকের বিকাশ হইতেছে, তাহাতে প্রকৃতির সুন্দর মুখখানি সুন্দর দেখা যাইতেছে। জনপদের কোলাহল এখনও সমুত্থিত হয় নাই। গুরুভার বিশিষ্ট দ্রব্যের অধঃপতন বা যন্ত্রের আঘাত বা এক বস্তুর দ্বারা অপর বস্তুর তাড়না-জনিত ঝনৎকার শব্দ এখনও কর্ণগোচর হইতেছে না। নিশীথের নীরব ও নিস্তব্ধভাব অপ্রতিহতরূপে বিরাজমান রহিয়াছে; কেবল মাত্র বিহঙ্গকুলের চিচিকুচি ধ্বনিতে এবং সুস্নিগ্ধ মধুর প্রাতঃসমীরণের উপাংশুবাদে* ঐ নিস্তব্ধভাবের এক একবার অন্যথা হইতেছে।

---

* একদিন প্রাতঃসমীরণের স্পর্শে ও শব্দে লেখকের মনে হইল, যেন এ শব্দ সেই পরমপ্রীতির আস্পদ পরমাত্মার অথবা তাঁহার সখীর উপাংশুবাদ, তিনি যেন তাঁহার নায়ক জীবাত্মাকে প্রাতঃসমীরণ স্বরূপ সখীদ্বারা প্রেমের বার্ত্তা বলিয়া পাঠাইতেছেন। এই ভাবের উদয় হওয়াতে পরপৃষ্ঠায় গাথাটি লেখক রচনা করিয়াছিলেন :

অয়ি প্রাতঃসমীরণ ! দিশি দিশি সঞ্চরণ
কর কাহার নিদেশে ?
কার প্রেমগাথা কাণে, শুনাও স্থতানেতানে,
বল মোরে সবিশেষে।
দেহ হয় সুশীতল, মনপ্রাণ সুবিমল,
তব কোমল পরশে,
কার সখি, কহ কহ হও তুমি গন্ধবহ ?
না জানি কত কোমল—
নিরমল হয় বা সে।

প্রাতঃসমীরণের হিল্লোলে বৃক্ষের শাখা পল্লবাদি মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইতেছে, অধিক কি সেই সময়ের ছবিখানি অতি মনোহর। যাহারা এই মনোহর দৃশ্য সম্মুখে থাকিতে চক্ষু বুজিয়া চতুষ্প্রাচীরাবচ্ছিন্ন সঙ্কীর্ণ গৃহ মধ্যে পীড়া বা দুর্ব্বলতার অনুরোধ ভিন্ন কেবল মাত্র জড়তাপ্রযুক্ত বালিশে মুখ গুঁজড়াইয়া পড়িয়া থাকে, তাহারা কি মক্ষিকাদি কীটের ন্যায় নহে ? অর্থাৎ যে সকল কীট পবিত্র মধুর রস ত্যাগ করিয়া অমেধ্য রক্ত পুয পূতিগন্ধযুক্ত ক্ষতের রস আনন্দে উপভোগ করে। ইহারা কি মানুষ ? তাহা হইলে কতদূর ভ্রষ্ট হইয়াছে ! ফলতঃ পশ্চিমযামে প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন না করিয়া যাহারা ঘর্ম্মাক্তক্লেদযুক্ত কলেবরে মলিন শয্যায় শয়ান থাকিতে পারে, তাহারা অতি নীচাশয়, তাহাদিগের অতি নীচপ্রবৃত্তি। যাহারা পশ্চিমযামে গাত্রোত্থান করিয়া অমৃতায়মান প্রাতঃসমীরণ সেবন না করে, তাহারা

পৃথিবীর একটি প্রধান ভোগ হইতে বঞ্চিত। এই প্রাতঃসমীরণ সেবন ও প্রাতঃকালে প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন কেবল যে আনন্দকর তাহা নহে, ইহা অতিশয় স্বাস্থ্যপ্রদ। এই প্রাতঃসমীরণ সেবনে অনেক প্রবল বীর্য্যবন্ত ঔষধে যাহা না করিতে পারে, তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকে।

প্রাতঃসমীরণ স্পর্শে এবং প্রাতঃকালে প্রকৃতি যে একটি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেন, তাহা দর্শনে চিত্তের অতিশয় প্রসন্নতা জন্মে এবং তাহাতে হৃদয়কে ঈশ্বরাভিমুখীন করে। ফলতঃ যে সময়ে বাহ্যপ্রকৃতিগত কোন পরিবর্ত্তন ঘটে, তখনই মন ও হৃদয়ের এই প্রকার ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে।

যাহা আমরা সর্ব্বদা দেখি, তাহা দেখিলে মনের উপরে কোন প্রতিঘাত হয় না; কিন্তু নূতন বস্তু দেখিলে কিম্বা দৃষ্টবস্তুর অবস্থান্তর দেখিলে, মন কৌতূহলাক্রান্ত হয় এবং চিত্তবৃত্তি ক্রিয়াশীল হয়। নিশীথে প্রকৃতি ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া থাকে; পরে যখন সেই অন্ধকারগর্ভ হইতে জ্যোতি-রাশির সমুদ্গম হয়, অথবা দিবসের দুর্দ্দর্শ প্রখর আলোক ক্রমে ম্লান, মলিনতর, মলিনতম হইতে হইতে অবশেষে একেবারে অন্ধকারে পরিণত হয়, প্রকৃতির এই রূপান্তর বা ভাবান্তর দেখিলে বা অনুভব করিলে, মন চমকিত হইয়া উঠে, এবং এই প্রকাণ্ড বিশ্বযন্ত্রের যন্ত্রীর প্রতি ধাবমান হয়। এই জন্য হিন্দু এই দুই কালে এবং পূর্ব্বাহ্ণ ও পরাহ্ণের সন্ধি-কাল. অর্থাৎ মধ্যাহ্নকে উপাসনার কাল বলিয়া অবধারিত

করিয়াছেন, এবং উপাসনা সান্ধিকালে কর্ত্তব্য বলিয়া সন্ধ্যা বা সন্ধ্যোপাসনা বলিয়া অভিহিত হয়।

পশ্চিমযামে গত্রোত্থান হিন্দুর অবশ্যকর্ত্তব্য। এতৎ-সম্বন্ধে মনুর অতি গুরুতর শাসন আছে যথা ;—

তাঞ্চেদভ্যুদিয়াৎ সূর্য্যঃ শয়ানং কামচারতঃ
নিম্লোচেদ্বাপ্য বিজ্ঞানাজ্জপন্নুপবসেদ্দিনম্।
সূর্য্যেণহ্যভিনির্ম্মুক্তঃ শয়ানোঽভ্যুদিতশ্চয়ঃ
প্রায়শ্চিত্ত মকুর্ব্বাণোযুক্তঃস্যান্মহতৈনসা॥

তিনি যদি স্বেচ্ছাচারী ভাবে শয়ান থাকেন, আর সূর্য্য উদয় হন, অথবা অজ্ঞানবশতঃ শয়ান থাকেন, আর সূর্য্য অস্ত যান, জ্ঞানকৃত হউক আর অজ্ঞানকৃতই হউক, তাহাকে এই পাপের জন্য সারাদিন উপবাসী থাকিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হইবে।

যিনি শয়ান থাকিতে থাকিতে সূর্য্য উদিত বা অস্তমিত হন,তিনি যদি উক্ত প্রায়শ্চিত্ত না করেন, তবে মহা পাপগ্রস্ত হন। এ শাসন কেবল দ্বিজের পক্ষে, কেননা, প্রাতঃ-কালে দ্বিজ সূর্য্য দর্শন পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান হইয়া গায়ত্রী জপ করিবেন এবং সায়ংকালে নক্ষত্র দর্শন পর্য্যন্ত সমাসীন হইয়া উক্ত জপ করিবেন, ইহা মনুর ব্যবস্থা। যদি উভয়-কালে নিদ্রায় অভিভূত রহিলেন, তবে তাঁহার জপ কিরূপে হইবে? প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে নিদ্রিত থাকা যখন শ্রেষ্ঠবর্ণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইল, তখন ইতরবর্ণের পক্ষে যে বিহিত হইবে, ইহা কোন মতে সম্ভবে না। সকলের

পক্ষেই উদয়াস্তকালে নিদ্রাভিভূত থাকা গর্হিত, তবে দ্বিজের ঐ দুই কালে বিশেষ কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে বলিয়া, ঐ দুই কালে নিদ্রিত থাকিলে উক্ত কর্ত্তব্যের অনমুষ্ঠান ঘটিবে, সুতরাং তাঁহাকে মহাপাতকগ্রস্ত হইতে হইবে এবং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত-জপোপবাসের বিশেষ বিধি হইয়াছে।

পশ্চিমযামে গাত্রোত্থানের আরও বিশেষ উদ্দেশ্য দেখা যাইতেছে। নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেই, জীবের মলমূত্র-ত্যাগের বেগ উপস্থিত হয়। জীব দিবা রাত্রি যাহা আহার করে, নিদ্রার সময় তাহা পরিপাক হয়। যামদ্বয় অর্থাৎ কিঞ্চিদূন সাড়ে ছয় ঘণ্টা কাল নিদ্রার জন্য বিহিত হইয়াছে। নিদ্রার সময় অর্থাৎ এই সাড়ে ছয় ঘণ্টা কাল শরীরের পাকযন্ত্রাদির কার্য্য অপ্রতিহতরূপে সম্পন্ন হয় বলিয়া, ভক্ষিত ও পীতদ্রব্য সমস্ত এই কাল মধ্যে সুন্দররূপে পরিপাক হইয়া, ইহার সারাংশ শরীরের ধাতুতে পরিণত হয় ও অসার ভাগ মলমূত্রাদিরূপে শরীর হইতে বহির্গত হয়; এই বহিষ্করণের উপযুক্ত কাল নিদ্রাভঙ্গের পর। বিন্মূত্রোৎসর্গে নির্জনতার নিতান্ত আবশ্যক। ইষ্টক নির্ম্মিত স্থায়ী আপঙ্কর যাহাদিগের আছে, নির্জনতা সর্ব্বদাই তাহাদিগের আয়ত্ত; কিন্তু নগরের অল্প সংখ্যক আঢ্যলোক ভিন্ন আর কাহারই স্থায়ী আপঙ্কর নাই।

নগর ভিন্ন স্থানে, সকলেই পতিত ভূমিতে বিন্মূত্র ত্যাগ করে; এখন সূর্য্য প্রকাশের পর যাহারা প্রবুদ্ধ হয়, তাহা-

দিগের শৌচ কার্য্যের বড়ই ব্যাঘাত হয়। কেননা সূর্য্যে প্রকাশের পর আর অনাবৃত পতিত ভূমিতে নির্জনতা থাকে না; অতএব এই কারণেও লোকের পশ্চিমযামে গাত্রোত্থান করা নিতান্ত আবশ্যক।

মৈত্রকার্য্য।—ঈশ্বরকে স্মরণ ও ধ্যান করিয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া সকলের প্রথম মৈত্রকার্য্য, অর্থাৎ বিন্মূত্রাদি ত্যাগ। এই কার্য্য দ্বারা নিজের বা প্রতিবেশিগণের স্বাস্থ্যের হানি কোন প্রকারে না হয়, কেবল ইহারই প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এজন্য এই বিধি হইয়াছে যে, কোন বাসগৃহ হইতে অন্যূন দেড়শত হাত পরিমিত ভূমি অন্তরে মৈত্রকার্য্য করা হয়। ভূমি মাপের জন্য চেন বা ফিতা বা হাতবাড়ি লইয়া ছুটাছুটী করিতে হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তি এক একগাছি ধনুঃ নির্ম্মাণ করিয়া রাখেন এবং মলত্যাগের ভূমি নির্দ্দেশ করিবার জন্য সেই ধনুঃসহকারে একে একে তিনটি শর নিক্ষেপ করেন। যে শরটি অতি দূরতম প্রদেশে পতিত হয়, সেই শর অতিক্রম করিয়া গিয়া মল ত্যাগ করা হয়,—আর স্থায়ী আপঙ্কর নির্ম্মাণ বা শরনিক্ষেপ বাসগৃহের নৈঋতকোণে করিতে হয় বলিয়া বিধি আছে। নৈঋতকোণে বায়ু প্রবাহিত কদাচ হয়, সুতরাং উক্ত কোণে মল থাকিলে, মল দ্বারা বায়ু দূষিত হইয়া বাসগৃহাভিমুখে আসিবার সম্ভাবনা থাকে না ও স্বাস্থ্যেরও হানি হয় না। কিন্তু বিন্মূত্র উৎসর্গে এই নিয়ম সকলেই পালন করিয়া থাকে, তাহা নহে; তবে প্রত্যূষে গাত্রোত্থান

করিয়াই বাসগৃহের অনেক দূরে গিয়া মল ত্যাগ করা অধিকাংশ হিন্দুরই রীতি আছে।

মলমূত্রত্যাগের পর শৌচ।—এই দারুণ ঘৃণাকর অমেধ্যবস্তুর কণামাত্র যতক্ষণ শরীরে সংলগ্ন থাকে, ততক্ষণ পবিত্রতা-বুদ্ধি একেবারে তিরোহিত হয় এবং শয়ন, উপবেশন, দেবার্চ্চন, ভোজনাদি পবিত্রাবস্থাসাধ্য কোন কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকে না। দেহকে ইহা হইতে বিমুক্ত করিতে হইলে, নিজের হস্ত সংযোগ ভিন্ন এ কার্য্য আর কোন ক্রমে হইতে পারে না। আর যদিও নিজের হস্ত সংযোগ ভিন্ন শরীর হইতে সেই অমেধ্যবস্তুর বিশ্লেষণ কোন রূপ সম্ভবে, তথাপি সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ হইল কি না, তাহার তৃপ্তিকর প্রমাণ হস্ত সংযোগ ভিন্ন কিছুতেই পাওয়া যাইতে পারে না।

এই জন্য হিন্দু মলত্যাগানন্তর শৌচকার্য্য নিজ হস্ত দ্বারা সম্পাদন করেন। শৌচাদি যে কোন কার্য্য হউক, নাভির ঊর্দ্ধদেশে বামহস্ত আর অধোদেশে দক্ষিণ হস্ত প্রয়োগ নিষিদ্ধ, অতএব বামহস্ত সংযোগে মৃজ্জল দ্বারা শৌচকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বামহস্ত দ্বারা মলদ্বার তিনবার ও মূত্রদ্বার একবার মৃত্তিকা দিয়া লেপন করিতে হয়। অনন্তর উভয় স্থান জল দ্বারা ধৌত করা উচিত। গন্ধনাশক পদার্থ, মৃত্তিকার ন্যায় আর দ্রব্যান্তর নাই এবং মলক্ষালন জলে যেরূপ হয় তেমন আর কিছুতেই হয় না। এইরূপে মলমূত্রদ্বারের শৌচ সাধন করিয়া পরিশেষে বাম-

হস্তের শৌচ। বাম করতলে দশবার মৃত্তিকা লেপন করিতে হয়, অনন্তর তুইবার বাম হস্তের পৃষ্ঠদেশে পরিশেষে বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তে সাতবার এবং তুই পদতলে তিন তিন বার মৃত্তিকা লেপন করিতে হয়। মৃত্তিকা লেপনের পর জল দ্বারা ধৌত করিলেই শৌচ কর্ম্ম সম্পাদিত হইল।

এই মলমূত্রত্যাগের সময় ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগের যজ্ঞোপবীত দক্ষিণকর্ণে সংলগ্ন করিয়া রাখেন। যজ্ঞোপবীত ক্ষণমাত্র দেহ হইতে বিচ্যুত করা যাইতে পারে না; ইহা অতি পবিত্র বস্তু, সুতরাং অমেধ্যস্থানে অমেধ্যক্রিয়াকালে এই যজ্ঞসূত্র পাছে অপবিত্র হয়, এই জন্য শরীরের অতি পবিত্রতম ভাগ যে দক্ষকর্ণ, তথায় ইহা রাখিয়া দেওয়া বিধি।

গন্ধের সহিত অমেধ্যবস্তুর সূক্ষ্ম পরমাণু যদি শরীরের ভিতর প্রবিষ্ট হয় ও শরীরকে পীড়াগ্রস্ত করে, এই জন্য হিন্দু মলমূত্রপরিত্যাগের সময় মুখে ও নসারন্ধ্রে পরিহিত বস্ত্র দিয়া রাখেন এবং তৎকালে কাহারও সহিত সম্ভাষণ বা আলাপ করেন না।

দন্তধাবন ও মুখপ্রক্ষালন।—মলমূত্রত্যাগের পরে দন্তধাবন বা মুখপ্রক্ষালন। দন্তের সংস্কারের জন্য হিন্দু দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ কেহ মঞ্জন বা চূর্ণক ব্যবহার করেন। বৃক্ষ বিশেষের শাখা ছেদ করিয়া বা ভাঙ্গিয়া লইয়া তদ্দ্বারা দন্তকাষ্ঠ প্রস্তুত করেন, অথবা দন্তের ব্যাধি নাশ ও দন্তকে পরিষ্কার করিতে পারে এরূপ

দ্রব্য বিশেষের চূর্ণক প্রস্তুত করিয়া রাখেন, তদ্দারা দন্ত ঘর্ষণ করেন। অনন্তর জিহ্বা সংস্করণীর দ্বারা জিহ্বা নিল্লেখন অর্থাৎ চাঁচিয়া তাহার সংস্কার করেন। পূর্ব্বরাত্রির ভক্ষিত বস্তুর অতি সূক্ষ্মকণামাত্র দন্তের মূলে বা মুখের ভিতর কোথাও সংলগ্ন থাকিতে শৌচ হইবে না এবং প্রাতঃকৃত্যে অধিকার জন্মিবে না।

রৌদ্রমুহূর্ত্তে প্রাতঃকৃত্য।—মুখপ্রক্ষালনের পর বস্ত্রত্যাগ বা স্নান। স্নানই দন্তধাবনের পর কর্ত্তব্য; কিন্তু যদি অসুস্থতানিবন্ধন কি অন্য কারণে তৎকালে স্নানের প্রতিবন্ধকতা ঘটে, তবে রৌদ্রমুহূর্ত্তে প্রাতঃকৃত্য করিতে হইবে, হিন্দু আর স্নানের অপেক্ষা করিতে পারেন না। তিনি পূর্ব্বরাত্রির বস্ত্র ত্যাগ করিয়া ধৌত ও পবিত্রবস্ত্রান্তর পরিধান পূর্ব্বিক প্রাতঃকৃত্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন।

পরিধেয় বস্ত্র।—হিন্দুর বস্ত্র অতি সামান্য। দশ হাত দীর্ঘ আর আড়াই হাত পরিসর এইরূপ একখণ্ড বস্ত্রেই ও তদতিরিক্ত আর একখানি ক্ষুদ্রতর বস্ত্র হইলে হিন্দুর বেশভূষা শেষ হইল। এই বস্ত্রখণ্ড কটিদেশে এমন সুকৌশলে আবদ্ধ করা হয় যে, তাহাতে দেখিবার শোভা হয় আর গুহ্যদেশাদি সম্যক্‌রূপে আবরণ করা হয়। শরীরের মধ্যে কেবল গুহ্যদেশই আবরণীয়, গুহ্যদেশ অনাচ্ছাদিত হইলে বড় লজ্জা ও ঘৃণার কথা; কিন্তু তদ্ভিন্ন শরীরের অপরাংশে কুত্রাপি এমন কোন বীভৎস দর্শন নাই, কোন লজ্জাকর বা ঘৃণাকর দর্শন নাই, যে তৎপ্রতি দৃষ্টি পতিত

হইলে চমকিয়া, শিহরিয়া উঠিতে হয় এবং লজ্জানম্র-মুখে তথা হইতে প্রস্থান করিতে হয়; অতএব একখণ্ড বস্ত্রেই হিন্দুর শীলতা ও শিষ্টতা রক্ষা হয়। উত্তরীয় বস্ত্রখানি যদৃচ্ছাক্রমে স্কন্ধদেশে লম্বমান করিয়া দেওয়া হয়।

হিন্দু একবস্ত্র পরিধান করিয়া দীর্ঘকাল থাকেন না, এবং ঘর্ম্ম ও ক্লেদযুক্ত দুর্গন্ধময় দূষিতবস্ত্র পরিধান করা তাঁহার প্রায় ঘটে না। প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে হিন্দু-মাত্রেই বস্ত্রত্যাগ করিবে, নিকৃষ্ট জাতি ও দরিদ্র লোকও করিবে। ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের লোকেরা এই দুই কালে বস্ত্রত্যাগ করেন, আবার ইতিমধ্যে শৌচে যাইলে, কি ক্ষৌরকর্ম্ম করিলে, কি অমেধ্য বস্তু স্পর্শ করিলে, কি ম্লেচ্ছ নিকৃষ্ট জাতির সংসর্গ ঘটিলে কি আহারের সময় বস্ত্রে উচ্ছিষ্ট লাগিলে বস্ত্রত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপে পাঁচ ছয় ঘণ্টাকাল একাদিক্রমে হিন্দুর একবস্ত্রে থাকা প্রায় ঘটে না। এতদ্দ্বারা হিন্দুর স্বাস্থ্যের বিশেষ উপকার হয়। বকের পালকের ন্যায় সাদা ধপ্ ধপ্ করিতেছে, এমন বস্ত্র পরিয়া হিন্দু যদিও সর্ব্বদা না বেড়ান, কিন্তু তিনি আচার-পূত হইলে তাঁহার গাত্রে বা বস্ত্রে দুর্গন্ধ কখনই হয় না।

স্নানবিধি।—প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে, মুখপ্রক্ষালনের পরেই স্নান কর্ত্তব্য। শাস্ত্রমতে গৃহীব্রাহ্মণ দুই সন্ধ্যা ও তপস্বীর তিন সন্ধ্যা স্নান করা উচিত। প্রাচীদিক অরুণ-কিরণগ্রস্তা দেখিয়া প্রাতঃস্নান করিতে হয়।

অস্নাত্বানাচরেৎ কর্ম্ম জপ হোমাদি কিঞ্চন,
লালা স্বেদ সমাকীর্ণ শয়নাদুত্থিতঃ পুমান্।
অত্যন্ত মলিনঃ কায়ো নবচ্ছিদ্র সমন্বিতঃ,
স্রবত্যেব দিবারাত্রৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধনং।
প্রাতঃস্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্ট ফলং হিতৎ,
সর্ব্বমর্হতি পূতাত্মা প্রাতঃস্নায়ী জপাদিকং।
অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাদ্রাত্রৌ দুশ্চরিতং কৃতং,
প্রাতঃস্নানেন তৎসর্ব্বং শোধয়ন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥

স্নান না করিয়া জপ হোমাদি কোন কর্ম্ম করা উচিত নহে। নবচ্ছিদ্র বিশিষ্ট দেহ হইতে দিবা রাত্রি কত লালা, স্বেদ, ক্লেদ স্রাবিত হইতেছে। নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি এই সমস্ত ক্লেদাদিতে যারপরনাই মলিন হইয়া থাকে, প্রাতঃস্নানে সেই মলা ক্ষালিত হয়। রাত্রিকালে অজ্ঞান বা মোহ-বশতঃ যদি ব্রাহ্মণ কোন দুষ্কর্ম্ম করে, তবে তজ্জনিত অন্তর্ব্বাহ্যমালিন্য ও প্রাতঃস্নানে বিশোধিত হয়, হইয়া ব্রাহ্মণ জপ হোমাদি কার্য্যের অধিকারী হয়।

অপর দুই সন্ধ্যায় স্নান ও তত্তৎ সন্ধ্যার প্রাক্কালে করা উচিত। নাভিমাত্র জলে গমন করিয়া, অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণকুহর অবরোধ করিয়া ও শ্বাস রোধ করিয়া (দীর্ঘকেশ-ধারী ব্যক্তি কেশরাজি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া) তিনবার জলে মজ্জন করিবে। কেশরাজি দ্বিভাগ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, জল ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করিবে।

যাঁহাদিগের গঙ্গার কূলে বা গঙ্গার অদূর প্রদেশে বাস,

তাঁহাদিগের তিন সন্ধ্যায় স্নানই গঙ্গায় করা উচিত। হিন্দুর গঙ্গাস্নানে অতিশয় প্রীতি। বহুদূর পর্য্যটন করিয়া প্রত্যহ গঙ্গায় আসিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া থাকে। নিকটস্থ সুন্দর পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা যাহার জল অতি স্বচ্ছ ও সুখসেব্য, তাহা ত্যাগ করিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে, কি বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে, কি আতপ তাপে তাপিত হইতে হইতে, গঙ্গায় আসিয়া স্নান করিয়া তাহারা তৃপ্তিলাভ করে।

গঙ্গে, তোমার কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুমি কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি, ভগবানের কি অপূর্ব্ব রচনাই তুমি! সংসারে চারিদিকে প্রলোভন, চারিদিকে অমেধ্য দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন; দুর্ব্বল জীব এই অমেধ্যসঙ্কুল প্রলোভন পূর্ণ আবর্ত্ত মধ্যে পড়িয়া কিরূপে পবিত্রতা অর্জ্জন করে, আর যদি বহু-কষ্টে কিছু সংগ্রহ করিতে পারে, তবে কিরূপে তাহা রক্ষা করিয়া কিছুকাল দেবার্চ্চনাদি পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে? ভগবান জীবের প্রতি দয়াপরতন্ত্র হইয়া এই পুণ্যময়ী গঙ্গার সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহাতে অবগাহন করিলে, যাহার কণামাত্র জলস্পর্শে, যাহার নামমাত্র স্মরণ করিলে সদ্যঃ সকল পাপ ক্ষয় হয় এবং জীব দেবোপম পবিত্র হইয়া দেবা-রাধনার অধিকারী হয়। ভগবানের জীবের প্রতি এত দয়ার পরিচয় আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

গঙ্গার এই উৎপত্তিবিবরণ পৌরাণিক বা শাস্ত্রীয় নহে, পাঠকের রুচিকর হইবে বলিয়া একটি যৌক্তিক বিবরণ দেওয়া গেল। পাঠক। তোমার কি লেখকের সহিত

এই বিষয়ে সহানুভূতি হইতেছে না? কেন না হইবে, বুঝিতে পারি না।

হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ,
হরিতো জগতো নহি ভিন্ন তনুঃ।

এ জগতে হরি ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু নাই, আর যাহা কিছু দেখা যায়, হরির রূপান্তর মাত্র; অতএব গঙ্গা সেই স্বয়ং পুণ্যপ্রস্রবণ হরিরই রূপান্তর মাত্র। পাঠক, এ কথায় কোন আপত্তি হইতে পারে না, তবে তুমি এই বলিবে যে জর্দ্দান্, টেম্‌স্ প্রভৃতি নদীকে তুমি হরির রূপান্তর বলিবে, আমার তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু তাহাদিগের জলে যে গঙ্গাজলের ন্যায় শুদ্ধিলাভ হয় এ কথা আমাকে কেহ কখন বলে নাই, শাস্ত্রেও বলে নাই, পিতৃ পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণ বলেন নাই, কিম্বা কিম্বদন্তীও বলে নাই। গঙ্গাজলে শুদ্ধি হয়, ইহা শাস্ত্র ও পূর্ব্বপুরুষ সকলেই এক বাক্যে সাক্ষ্যদান করিতেছে। তাহার পর ইহার পবিত্রীকরণোপযোগীতা যুক্তি দ্বারাও উপলব্ধি হইতেছে,—আর অন্য নদী অপেক্ষা ইহার অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা আছে।

গঙ্গাজলসেবনে ও গঙ্গামৃত্তিকালেপনে শরীরের কান্তি, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বর্দ্ধন হয়। গঙ্গামৃত্তিকালেপনে চর্ম্মরোগের শান্তি হয়। গলিত কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তি কেবল গঙ্গামৃত্তিকা লেপন দ্বারা আরোগ্যলাভ করিয়াছে, অনেকে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। গাত্রের চর্ম্ম পরিষ্কার করিতে এমন আর

দ্বিতীয় বস্তু নাই। লেখকের জনৈক বন্ধু জাতিতে কায়স্থ, বিলাতে গিয়া শিক্ষিত ও পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের চিকিৎসা বিভাগে এক প্রধান কর্ম্মচারীর পদে বহুদিন নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, "গঙ্গামাটী 'Is the best soap going.' অর্থাৎ গঙ্গামৃত্তিকা অতি উৎকৃষ্ট সাবান।" তোমার জর্দ্দানের, তোমার টেম্‌সের এ সকল বিশেষ ধর্ম্ম আছে কি? গঙ্গা যে জীবপাবনের জন্য ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বলিতে তোমার আপত্তি কি? যখন গঙ্গাজল ও মৃত্তিকায় এই সকল বিশেষ ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ হইতেছে, গঙ্গা যখন হরিরই রূপান্তরমাত্র, আর শাস্ত্র যখন চীৎকার করিয়া বারংবার বলিতেছে যে, "গঙ্গা পতিতপাবনী!" তখন গঙ্গা জীবপাবণের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, এ কথার অপলাপ কিরূপে কর? গঙ্গা হিন্দুদিগের ক্রাইষ্টস্বরূপ! খ্রীষ্টিয়ানেরা বলেন, "জীব ক্রাইষ্টকে আশ্রয় করিলে তিনি তাহাদিগের পাপভার হরণ করিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করিয়া দেন, দিলে তাহারা মুক্ত হয়।" হিন্দু সেইরূপ পাপপঙ্কিল দেহ ও হৃদয় লইয়া সর্ব্বদা গ্লানিযুক্ত, একপ্রকারে পুণ্যসঞ্চয় করিতেছেন, আবার প্রকারান্তরে পাপগ্রস্ত হইতেছেন; একদিক রক্ষা করিতেছেন, অপর দিকে দুরত্যয় মোহের আবর্ত্তে পড়িয়া পাপে প্লাবিত হইয়া যাইতেছেন, এই ঘোরসঙ্কটে তিনি ভগবতী ভাগীরথীর শরণাপন্ন হন। গঙ্গা তাঁহাকে স্বীয় পুণ্যবারি দ্বারা ক্ষালিত, ধৌত ও দেবোপম নির্ম্মল করিয়া দেন, তিনি পবিত্রহৃদয়ে দেবারাধনা করিয়া চরিতার্থ হন। গঙ্গা

নদ নয়, নদী নয়, দেব নয়, দেবী নয়, ভগবানের দয়া দ্রবীভূত হইয়া গঙ্গারূপে পরিণত হইয়াছে। গঙ্গা আমাদিগের ক্রাইষ্ট, গঙ্গাই আমাদিগের সর্ব্বস্ব !

গঙ্গা যথার্থই পতিতপাবনী, জীবের উদ্ধারের জন্য দয়াপরবশ হইয়া ভগবান তাঁহার সৃষ্টি করিয়াছেন। লোকও তেমনি ব্যাকুল হইয়া গঙ্গাকে অন্বেষণ করে। তিথি নক্ষত্র বিশেষের সংযোগে শুভযোগের উদয় হয়। এই সকল শুভযোগে গঙ্গাস্নান করিলে ফলাধিক্য হয় বলিয়া, তদুপলক্ষে বহুদূর হইতে আবালবৃদ্ধবনিতা ব্যাকুল হইয়া গঙ্গাতীরে আগমন করে এবং এইরূপে তথায় অসংখ্য লোকের সমাগম হয়; আবার সময় বিশেষে গঙ্গাস্নানে ফলাধিক্য হয়। সূর্য্য যখন মেষ, তুলা এবং মকররাশিস্থিত, বৎসরের মধ্যে এই তিন মাস ব্রাহ্মণ ও ইতরবর্ণের মধ্যে যাহাদিগের ধর্ম্মে বিশেষ অনুরাগ আছে, তাহারা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া বিন্মূত্র ত্যাগ ও মুখপ্রক্ষালনাদি করিয়া অতি ভক্তি সহকারে গঙ্গায় গমন করেন। সকলে শীতে কম্পান্বিতকলেবর! ব্রাহ্মণেরা এই সময়ে শীতের প্রভাবকে খর্ব্ব করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে বারংবার হরিধ্বনি করিতে থাকেন। এই তিন মাস অতি প্রত্যূষে হিন্দু-জনপদে হরিনামের রোল উত্থিত হয় এবং স্ত্রী পুরুষ সকলেই আনন্দময় ও উৎসাহপূর্ণ। বিজাতীয়েরা এই আনন্দের গূঢ়তত্ত্ব কিছু বুঝিতে পারে না এবং যে সময়ে সকলের শরীরে উষ্ণতা হয়, যাহাতে

এমন বস্ত্রের দ্বারা আপাদমস্তক অবগুণ্ঠিত হইয়া আপন আপন গৃহমধ্যে সুখে শয়ান থাকেন, সেই সময়ে দারুণ শীতের প্রাদুর্ভাবে এই ক্ষীণাঙ্গাকুলমহিলারা ও বর্ষভারাবনত প্রাচীন নরনারীগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কিরূপে জলমগ্ন হয়, তাহা তাঁহাদিগের নিতান্ত আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ প্রবাদ আছে, যে একবার হুগলীর একজন নবাগত মাজিষ্ট্রেট মাঘমাসের প্রাতঃকালে তাঁহার গঙ্গাতীরস্থ ভবনে বারাণ্ডায় বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন, যে এক অতিবৃদ্ধ পুরুষ কাঁপিতে কাঁপিতে ও বিড় বিড় করিয়া কি বকিতে বকিতে গঙ্গার ঘাট হইতে নগরাভিমুখে যাইতেছে। সাহেব এই লোককে এই অবস্থান্বিত দেখিয়া তাঁহার চাপরাসীকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন. "ইয়ে কোন্ হায়্?" চাপরাসী জাতিতে মুসলমান, হিন্দুর আচার সম্বন্ধে সাহেবের নিজের যত অভিজ্ঞতা ছিল, তাহার তদপেক্ষা অধিক ছিল না। তবে যে ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে তাঁহাকে জানিত এবং সাহেবের প্রশ্নের উত্তর তৎক্ষণাৎ না দিলে সাহেব বিরক্ত হইয়া তাহার অনিষ্ট করিবেন, এই ভয়ে সে আর না ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিল, "খোদাবন্দ! উয়ো তর্কালঙ্কার হায়!" সাহেব এই উত্তর পাইয়া নিরস্ত হইলেন; ফলতঃ যে ব্যক্তি সম্বন্ধে সাহেব প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তিনি তর্কালঙ্কার উপাধিধারী ঐ স্থানীয় একটি ব্রাহ্মণপণ্ডিত। অনন্তর সেই দিবস সাহেব কাছারিতে মোকদ্দমা করিবার

সময় তাঁহার সম্মুখে একটি অপরাধী আনীত হইল। সাহেব তাহার সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া দেখিলেন যে, উহার অপরাধ অতি সামান্য এবং সামান্য দণ্ড হইলেই তাহার শাসন হইবে, এই বিবেচনা করিয়া তিনি হুকুম দিলেন যে, "এ 'গিল্টি' ইসকো তর্কালঙ্কার বনায় দেও।" প্রাতঃকালে বৃদ্ধব্রাহ্মণ সম্বন্ধে চাপরাসির উত্তর পাইয়া সাহেব মনে করিয়াছিলেন যে, সেই বৃদ্ধ কোন অপরাধ করিয়াছিল, সেই জন্য এত শীতের সময় তাহাকে জলে চুপিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। "উস্‌কো তর্কালঙ্কার বনায় দেও" এই হুকুমের এই অভিপ্রায়, যে অপরাধীকে শীতের সময় জলে চুপিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

গঙ্গাস্নান ভিন্ন অন্য উপলক্ষেও এই তিন মাস অর্থাৎ কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাস হিন্দুজনপদ হরিনামের ধ্বনিতে ধ্বনিত হয়। ভিক্ষোপজীবিগণ গৃহস্থকে এক আধটি গান শুনাইয়া এক আধটি পয়সা ভিক্ষা করে। তাহারা এই তিন মাস পুণ্যকাল বলিয়া ও এইকালে সকলে হরিনাম শুনিতে ভালবাসে বলিয়া, গৃহে গৃহে হরিনাম শুনাইয়া বেড়ায়। নিদ্রোত্থিত গৃহস্থ প্রবুদ্ধ না হইতে হইতে, তাহারা হরিনাম গান করিতে আরম্ভ করে। গৃহস্থ নিদ্রা হইতে উঠিয়াই হরিনাম শুনিয়া কৃতার্থ হয়, এবং একাদিক্রমে একমাস এইরূপে হরিনাম শ্রবণ করিয়া মাসের শেষে গায়ককে দুই আনা কি চারি আনা পয়সা দিয়া বিদায় করেন।

হিন্দু, হরিনাম শ্রবণ ও মননের জন্য নানা কৌশল করেন। শুক, সারিকা প্রভৃতি যে সকল পক্ষী মানুষের রব ও বাক্যের অনুকরণ করিতে পারে, অনেক হিন্দু সেই সকল পক্ষী পিঞ্জর মধ্যে রাখিয়া, পরম যত্নে প্রতিপালন করেন ও তাহাদিগের কর্ণকুহরে বারংবার হরিনাম উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগকে হরিনাম শিক্ষা দেন ও অভ্যাস করান। পক্ষী শিক্ষিত হইয়া যখন স্বতঃই হরিনাম বলিতে থাকে, তখন পক্ষীর পালনকর্ত্তার আনন্দের সীমা থাকে না এবং ইতিমধ্যে শিক্ষা দিবার ব্যপদেশে তাঁহার নিজেরও প্রত্যহ বারংবার হরিনাম করা হয়।

তৈলাভ্যঙ্গ।—হিন্দুর স্নানের একটি অঙ্গের কোন উল্লেখ করা হয় নাই, অর্থাৎ তৈলাভ্যঙ্গ। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য করেন, তদ্ভিন্ন আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই স্নানের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে তৈল ম্রক্ষণ করেন। তৈল দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ হয় এবং তদ্দ্বারা লোমকূপের মুখ কিয়ৎপরিমাণে রুদ্ধ থাকে বলিয়া, স্নানকালে শরীরের মধ্যে অধিক জল প্রবিষ্ট হইতে পারে না। তৈলম্রক্ষণের এই দুই উদ্দেশ্য; ফলতঃ তৈল চর্ম্মপোষক। ইহাতে চর্ম্মের পুষ্টি, চিক্কণতা ও মসৃণতা হয়, এবং তৈল ব্যবহার করিলে অনেক চর্ম্মরোগ হইতে পারে না। অধিকাংশলোকে সর্ষপতৈল ব্যবহার করেন। যাঁহারা ভোগবিলাসী তাঁহারা পুষ্পবাসিত সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করেন। স্ত্রীলোকেরা কেশরাজীর চিক্কণতার জন্য কেশে সুগন্ধি-নারিকেল তৈল ও অঙ্গে সর্ষপতৈল ব্যবহার করেন। সাহেবেরা

বঙ্গবাসী হিন্দুগণকে Sleek-skinned Babus বলিয়া উপহাস করেন। Sleek-skinned শব্দের কোন অপরাধ নাই, ইহার অর্থ চিক্কণচর্ম্মবিশিষ্ট, নিন্দাজনক নহে। বাবু শব্দের বিশেষণ বলিয়া শব্দটি নিন্দাজনক অর্থেয়ব্যঞ্জক হইয়াছে; অর্থাৎ চিক্কণচর্ম্মবিশিষ্ট হওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রশংসা, পুরুষের সম্বন্ধে এই বিশেষণ ব্যবহার হইলে সাহেবেরা বুঝি মনে করেন, পুরুষের পুরুষত্বের গৌরব নষ্ট হইল, তাই তাঁহারা কখন কখন রসিকতা করিয়া বঙ্গবাসী হিন্দু-গণকে এই শব্দ দ্বারা বিশেষ করেন। বোধ হয় এই কারণে অনেক নব্যহিন্দু তৈল ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন। যদি চর্ম্মরোগাদি না জন্মে, তবে ত্যাগ করিলেই ভাল, কেননা তৈল হিন্দুশাস্ত্রে অমেধ্য বলিয়া পরিগণিত হয়; কিন্তু অর্ব্বাচীন বা অবোধ লোকের উপহাসে ত্যাগ করা বড় হাস্যাস্পদ ব্যবহার, এবং তৈলের পরিবর্ত্তে চর্ম্মকে রক্ষা করিবাব জন্য যদি সাবান প্রভৃতি অমেধ্যবস্তুর ব্যবহার করিতে হয়, তবে হাস্যাস্পদ কি, সে ব্যবহার নিতান্ত ঘৃণাকর!

সন্ধ্যোপাসনা।—প্রাতঃস্নানের পর প্রাতঃকৃত্য অর্থাৎ প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাবন্দনা। দ্বিজাতির সন্ধ্যা তিন কালেরই এক প্রকার, অর্থাৎ প্রথমে মার্জ্জন বা মান্ত্রিক স্নান;—জলকে সম্বোধন করিয়া কল্যাণ ও শুচিত্ব প্রার্থনা করা। শৌচ প্রার্থনার পর প্রাণায়াম, আত্মদেহের অভ্যন্তরে প্রণব-প্রতিপাদ্য দেবতা বিধি, বিষ্ণু ও মহেশের ধ্যান। অনন্তর

আচমন ও পুনর্ম্মার্জ্জন এবং অঘমর্ষণ জপ। তদনন্তর সূর্য্য-রক্ষা ও সূর্য্যোপস্থান। সূর্য্যোপাসনার পর দেব, ঋষি ও পিতৃতর্পণ। তাহার পর গায়ত্রীর আবাহন, গায়ত্রীর ন্যাস, গায়ত্রীধ্যান, গায়ত্রী জপ ও গায়ত্রী বিসর্জ্জন। পরে আত্ম-রক্ষার মন্ত্র পাঠ ও রুদ্রোপস্থান এবং দেবোদ্দেশে জলদান, অবশেষে সূর্য্যার্ঘ দান ও সূর্য্যের নমস্কার। বৈদিক মন্ত্রে এই কয়প্রকার অনুষ্ঠান করাকে সন্ধ্যা বলে। বৈদিক সন্ধ্যার পর যাঁহারা দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ইষ্টমন্ত্র জপ ও তদানুসঙ্গিক ক্রিয়া। ইহাকে তান্ত্রিক সন্ধ্যা বলে। স্ত্রী ও শূদ্রাদির বৈদিক সন্ধ্যা নাই, যেহেতু তাঁহাদিগের বেদে অধিকার নাই। তাঁহাদিগের কেবল তান্ত্রিকসন্ধ্যা।

তান্ত্রিক দীক্ষার আবশ্যকতা।—গায়ত্রী দীক্ষাই দীক্ষা, ইহাতেই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব। তবে আবার তান্ত্রিক দীক্ষার সৃষ্টি হইল কেন? গায়ত্রী দ্বারা জগৎপ্রসবিতার সেইবরণীয় তেজকে ধ্যান করা হয়, যে তেজ হইতে আমরা বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রাপ্ত হই। যদি অপর বিষয় অপেক্ষা বিষয়বিশেষের জন্য আমাদিগের ভগবানের প্রতি অধিক কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত হয়, সে বিষয়টি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি; কেননা, ইহাদ্বারাই আমাদিগের মনুষ্যত্ব, ইহার প্রভাবেই আমরা যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং ইহার প্রভাবেই আমরা আমাদিগের স্রষ্টাকে অনুভব করিয়া, তাঁহার ধ্যান-ধারণার অধিকারী হই,—যে উচ্চ অধিকার আর কোন জীবের নাই। অতএব ভগবানের কিরূপ

তেজঃ ধ্যাতব্য ইহা নির্দ্দেশ করিতে হইলে, যে তেজঃ হইতে আমরা বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রাপ্ত হই, ইহা বলাই উচিত। অতএব গায়ত্রী দ্বারা ব্রাহ্মণ ভগবানের যে ধ্যান করেন, সে অতি উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক ধ্যান। কিন্তু এই ধ্যান যত তীব্র হউক না, যত গাঢ় ও গভীর হউক না, ইহা একটি অনুভূতি মাত্র। অনুভূতির সহিত প্রেম হয় না। ভগবানের প্রতি প্রেম করিতে হয়, ভগবানকে ভালবাসিতে হয়; এত ভালবাসিতে হয়, যে তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে চিন্তা করিতে করিতে জগৎ, শেষে আপনাকেও ভুলিয়া যাইতে হয়। এরূপ প্রেম কোন প্রকার অনুভূতির সহিত হওয়া অসম্ভব। অতএব গায়ত্রীদীক্ষা দ্বারা একটি ঈশ্বরবুদ্ধি জন্মিলে, এবং ক্রমে সেই ঈশ্বরের ধ্যান অভ্যস্ত হইয়া আসিলে, উচ্চ ও গাঢ়তর সাধনের জন্য তান্ত্রিকদীক্ষার আবশ্যক হয়। জগৎ-গুরু ভবমহাদেব জীবের হিতের জন্য অর্থাৎ গায়ত্রীদীক্ষিত ব্রাহ্মণদিগের উচ্চসাধনের জন্য ও স্ত্রী শূদ্রাদি যাহাদিগের গায়ত্রী বা কোন দীক্ষা হয় না, তাহাদিগের সাধনের জন্য তন্ত্রের সৃষ্টি করিলেন। তন্ত্রে ভগবানের বিভূতি বিশেষে দেবতা বিশেষের কল্পনা হইল এবং প্রত্যেক দেবতার রূপ-বিশেষ ও মন্ত্রবিশেষ কল্পনা হইল, এবং গুরূপদিষ্ট হইয়া এই রূপের ধ্যান ও মন্ত্রের জপ এবং সাধনের বিধান হইল।

এখন যে দেবতা কেবল মাত্র অনুভূতিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, তিনি ধ্যানের আয়ত্ত হইলেন, সেবাগ্রহণক্ষম

হইলেন, সাধকের আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। একটি গল্প আছে ;—"কোন এক বৈষ্ণবের বিগ্রহাদি কিছুই ছিল না, শালগ্রামশিলাতেই তিনি ভগবানের সেবা ও অর্চ্চনা করিতেন। অপর বৈষ্ণবেরা তাঁহাদিগের বিগ্রহ সকল অলঙ্কার, বস্ত্র ও পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা নানা প্রকারে সুসজ্জিত করিতেন, করিয়া বিগ্রহের শোভা সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে অপার আনন্দে মগ্ন হইতেন। শিলাসেবী বৈষ্ণবের ইচ্ছা আপন দেবতাকে সেইরূপে সাজাইয়া দেখেন ও অপরকে দেখাইয়া আনন্দ অনুভব করেন। কিন্তু শিলার কোন্ খানেই বা সে অলঙ্কার, কোথায় বা বস্ত্র আর কোথায় বা মালা পরাইবে? পরাইতে পারিতেন না বলিয়া, তাঁহার দুঃখের একশেষ হইয়াছিল। অন্তর্যামী ভগবান সাধকের অভিপ্রায় বুঝিলেন। একদিন বৈষ্ণব শিলাতে যথাসাধ্য সেবা করিয়া অলঙ্কারাদি দ্বারা সাজাইতে পারিলেন না বলিয়া নেড়াশালগ্রাম সিংহাসনে রাখিয়া বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে সিংহাসনের পাদদেশে আপনি শয়ন করিলেন। অনন্তর নিদ্রোত্থিত হইয়া প্রাতঃকালে দেখিলেন যে, শালগ্রাম শিলা হইতে বিগ্রহ বাহির হইয়াছেন,—শালগ্রাম বিগ্রহের পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন রহিয়াছেন। বৈষ্ণবের আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না, তিনি তৎক্ষণাৎ স্বর্ণকার ডাকাইয়া নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করাইলেন এবং মনেরসাধে আপন বিগ্রহকে সাজাইয়া চরিতার্থ হইলেন।" তান্ত্রিক দীক্ষা লাভ করিয়া সাধকের এইরূপ প্রীতি ও শান্তিলাভ হয়।

তখন দেবতাতে তাঁহার আত্মবুদ্ধি হয় অর্থাৎ আমার ঠাকুর বলিয়া বোধ হয়। ভক্তাগ্রগণ্য হনূমান শ্রীনাথের নিকট যখন জানকীনাথের রূপ দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন, তখন ভগবান কহিলেন, "শ্রীনাথ ও জানকীনাথ একই, তবে একমূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে অপর মূর্ত্তি দর্শনের ইচ্ছা নিতান্ত অসঙ্গত।" তখন হনূমান উত্তর করিলেন ;—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ পরমাত্মনি,
তথাপি মম সর্ব্বস্ব রাম কমললোচন !

তান্ত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইলে সাধক আপন ইষ্টদেবকে "মমসর্ব্বস্ব" বলিতে শিক্ষা করে, তখন দেবতাতে মমতাবুদ্ধি জন্মে এবং তৎপ্রতি যত্নের ইয়ত্তা থাকে না। দেবতাতে গাঢ়তর প্রেম উপস্থিত হয় এবং যে পরিমাণে প্রেম বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে সাধনের উন্নতি হইতে থাকে। বোধ হয়, এই সকল কারণে তন্ত্র ও তান্ত্রিক দীক্ষার স্থষ্টি হইয়াছে।

বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যার পর পূজা হোমাদি করা উচিত ; যেহেতু দেবপূজা পূর্ব্বাহ্লকৃত্য মধ্যে পরিগণিত হয়। শিবপূজায় আপামার সাধারণ সকলেরই অধিকার আছে এবং শিবপূজা নিত্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের শিবপূজা ভিন্ন আর একটি নিত্যপূজা আছে,—অর্থাৎ বিষ্ণুপূজা। অধিকাংশ লোকে মৃণ্ময় লিঙ্গোপরি শিবপূজা করিয়া থাকেন। কাহারও বা বাণলিঙ্গ আছে, তদুপরি শিবপূজা হয়। শিবপূজায় বাণলিঙ্গ অতি প্রশস্ত আধার। যাহার বাণলিঙ্গ নাই,

অথবা মৃন্ময় লিঙ্গ প্রস্তুত করিবার অবকাশ বা সুবিধা নাই, তিনি জলে শিবের উদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক উপচারাদি দান করেন, তাহাতেও শিবপূজা সিদ্ধ হয়। বাণলিঙ্গ যেমন শিবপূজার প্রশস্ত আধার, শালগ্রাম শিলা তেমনি বিষ্ণু-পূজার প্রশস্ত আধার। এই শিলা অতি পবিত্র পদার্থ, এবং সকল গৃহস্থের গৃহে এই শিলা রাখিবার বিধি আছে। যে গৃহে শালগ্রাম শিলা নাই, সে গৃহ শ্মশানভূমির ন্যায় অপ-বিত্র বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। শূদ্র বিষ্ণুপূজা করেন না, কিন্তু একটি শালগ্রাম শিলা তিনি বাটীতে রাখেন এবং ব্রাহ্মণ দ্বারা তদুপরি বিষ্ণুপূজা করান। নিত্যপূজায় গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ বিল্ব কি তুলসীপত্র নৈবেদ্যাদি দশোপচারে পূজা করিলেই পর্য্যাপ্ত হয়, তবে ব্রাহ্মণ গৃহে বিষ্ণুপূজায় অন্নভোগ দিবার বিধি আছে। শিবপূজার প্রধান উপচার বিল্বপত্র এবং বিষ্ণুপূজার তুলসীপত্র। এই দুই পূজায় এই দুই উপচার নিতান্ত আবশ্যক। অন্য উপচারের অভাবে গঙ্গাজল তৎপরিবর্ত্তে দেওয়া যাইতে পারে এবং যেখানে সকল উপচারের অসদ্ভাব, গঙ্গাজলে সমস্ত নির্ব্বাহ করিতে হয়, সেখানে এই দুই পত্রের পরিবর্ত্তে গঙ্গাজল চলিতে পারে ; কিন্তু যেখানে কোন একটি উপচার প্রকৃত প্রস্তাবে দেওয়া হয়, সেখানে শিবপূজার স্থানে বিল্বপত্র এবং বিষ্ণু-পূজার স্থানে তুলসীপত্র নিতান্ত আবশ্যক।

শূদ্রস্পৃষ্ট পুষ্পে পূজা হয় না বলিয়া ব্রাহ্মণ নিজে পুষ্প আহরণ করেন এবং পুষ্পাহরণ স্নানের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য বলিয়া,

ব্রাহ্মণ মৈত্রকার্য্যের পরেই পবিত্র বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পুষ্প চয়ন করিতে যান। ব্রাহ্মণের এই পুষ্প চয়নের অনুষ্ঠান অতি স্বাস্থ্যকর; কেননা প্রাতঃকালে শুষ্ক পুষ্প হইতে ওজোন বলিয়া এক প্রকার ধাতু বিনির্গত হয়, তাহার ঘ্রাণে শরীরের বিশেষ উপকার হয়।

শিবের অনাদি লিঙ্গ বা বাণলিঙ্গ ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, শূদ্র সকলেই পূজা করেন, সকলেই স্পর্শ করেন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই; কিন্তু শালগ্রাম শিলা যথাস্থান হইতে নীত হইলে অগ্রে পঞ্চগব্যাদি দ্বারা তাঁহার স্নান ও অভিষেক করিতে হয়। অভিষেকের পর সেই শিলার উপর পূজা হয় এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ তাহা স্পর্শ করিতে পরে না। অভিষেকের পর শিলা স্ত্রী, শূদ্র কি বালক দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে, তাহার পুনঃসংস্করণের অর্থাৎ পুনরভিষেকের আবশ্যক হয়, তাহা না হইলে তাহার উপর বিষ্ণুপূজা হইতে পারে না।

এই শালগ্রাম শিলা প্রত্যেকের গৃহে রাখিবার ব্যবস্থা থাকায়, হিন্দুসমাজের প্রতি গৃহেই প্রত্যহ একটি ক্ষুদ্র উৎসব হইয়া থাকে। প্রাতঃকালে উঠিয়াই পুষ্প চয়ন, দেবগৃহ সংস্কার ও সংমার্জ্জন, পূজাতে ব্যবহার্য্য যাবতীয় তৈজসাদির সংস্কার ও সংমার্জ্জন, গঙ্গাজলাহরণ, নৈবেদ্যের তণ্ডুলাদি গঙ্গাজলে ধৌতকরণ, পুষ্পপাত্র বিন্যাস অর্থাৎ প্রশস্ত তাম্রপাত্রে নানা জাতীয় পুষ্প পৃথক পৃথক করিয়া এক জাতীয় পুষ্প একস্থানে একত্রিত করিয়া রাখা, তুলসী বিল্ব-

দল ও দূর্ব্বা পৃথক রাখা চন্দনকাষ্ঠ প্রস্তরফলকে ঘর্ষণ করিয়া অনুলেপন প্রস্তুত করিয়া পুষ্পপাত্রের একপার্শ্বে রাখা এবং আতপতণ্ডুল, তিল, যব, ধূপ দীপ ও অপরাপর পূজোপকরণ পুষ্পপাত্রের যথাস্থানে রাখার নাম পুষ্পপাত্র বিন্যাস। তদনন্তর নৈবেদ্য রচনা। আতপতণ্ডুল, নানাবিধ উপাদেয় ফল ও গৃহজাত মিষ্টান্ন দ্বারা নৈবেদ্য প্রস্তুত হয়। আমিক্ষা ও শর্করা নারিকেল ও শর্করা ও ক্ষীর ও শর্করা সংযোগে হিন্দুনারীগণ গৃহে নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করেন, এই মিষ্টান্ন দেবতাকে নিবেদন করিয়া দেন। বাজারে বা ময়রার দোকানে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য অপবিত্র বলিয়া হিন্দু, দেবতাকে দেন না ও আচারপূত হিন্দু নিজেও ব্যবহার করেন না। এদিকে আর একপ্রস্ত লোক স্ত্রী হউক আর পুরুষই হউক, যাহারা অতি পবিত্র ও আচারপূত, গঙ্গাস্নান করিয়া কৃতাহ্নিক হইয়া, বিন্দুমাত্র জল মুখে না দিয়া অতি সংযতভাবে ও শ্রদ্ধাসহকারে শালগ্রামের ভোগ রন্ধন করিতে প্রস্তুত হন। নিরবচ্ছিন্ন গঙ্গাজল ও ঘৃতসৈন্ধবে এই ভোগ পাক করা হয়। অনন্তর যথাকালে অর্থাৎ প্রায় তৃতীয় যামার্দ্ধের সময় উল্লিখিত পুষ্পপাত্র ও নৈবেদ্যাদি দেবতার সম্মুখে আনিয়া দেওয়া হয়। পূজকের উপবেশনের জন্য একখানি পবিত্র রাঙ্কবাসন বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার সম্মুখে গঙ্গাজল পূর্ণ তাম্র বা রৌপ্য নির্ম্মিত কোশাকুশী ও কুণ্ডু রাখিয়া দেওয়া হয়। পূজক যথাকালে পাদপ্রক্ষালন করিয়া পূজার

জন্য আসনে উপবেশন করেন। অমনি শঙ্খ, ঘণ্টা ও কাঁসর বাজিয়া উঠে এবং ধূপ ধুনা ও গুগ্‌গুলের গন্ধে চতুর্দ্দিকের বায়ু পরিপূর্ণ হয়।

এইরূপে বাদ্যোদ্দম ও দিব্যগন্ধ বিস্তার কিঞ্চিৎ অগ্র-পশ্চাৎ একেবারে গৃহে গৃহে উদয় হয়। এই সময়ে হিন্দু-সমাজ কি পবিত্র ও আনন্দময় বলিয়া বোধ হয়! এইরূপ বাদ্যোদ্দম ও দিব্যগন্ধ বিস্তার যুগপৎ সকল গৃহ হইতে আর একবার উপস্থিত হয়; অর্থাৎ সায়ংকালে যখন শালগ্রামের আরতি হয় ও আরতির পরে তাঁহাকে শয়ান করাইয়া দেওয়া হয়।

হিন্দুর আত্মবৎ দেবসেবা, অর্থাৎ যেরূপ সেবা আপনি চান, আপনি যেরূপ সেবাতে পরিতুষ্ট হন, দেবতারও ঠিক সেইরূপ সেবা করেন। উষ্ণ কটিবন্ধে নিদাঘ কালীন সূর্য্যের প্রখর কিরণে শরীর সন্তপ্ত হইলে সর্ব্বদাই জল-সেবার ইচ্ছা হয়, তাই হিন্দু তাঁহার শালগ্রাম শিলাস্থিত বিষ্ণুকে বৈশাখমাসে ঝারায় বসান। অর্থাৎ নিত্যপূজা ভোগাদি হইয়া গেলে ব্রাহ্মণ, শিলাটি একটি তাম্রটাটে বসাইয়া এক ত্রিপদীর উপর সেই টাট্‌খানি রাখেন। পরে মৃণ্ময় কলসীর তলায় ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্র তৃণদ্বারা এরূপে অবরোধ করা হয়, যে কলসীতে জল দিলে, জল ছিদ্র দ্বারা ধারাবাহী হইয়া পড়িবে না, অথচ যতক্ষণ তাহাতে বিন্দু মাত্র জল থাকিবে, ততক্ষণ বিন্দু বিন্দু ক্ষরণ হইবে। এইরূপ তৃণদ্বারা অবরুদ্ধ ছিদ্রবিশিষ্ট জলপূর্ণ কুম্ভ সেই ত্রিপদী

বা টাটের উপর অন্ততঃ দুইহাত উচ্চে শিকা সংযোগে ঝুলাইয়া রাখা হয়। সেই সচ্ছিদ্র কুম্ভ হইতে সমস্ত দিন বিন্দু বিন্দু জল টপ্ টপ্ করিয়া শালগ্রামের উপর পতিত হয়। অনন্তর দিবা অবসানে যখন উত্তাপের খর্ব্বতা হইয়া আসিতে থাকে, ব্রাহ্মণ শিলাটি ঝারা হইতে উঠাইয়া পবিত্র বস্ত্র দ্বারা জল মুছাইয়া ভিন্ন আধারে রাখেন এবং বিবিধ সুশীতল ও সুবাসিত পানীয়, বিবিধ উপাদেয় সুস্নিগ্ধ ফল ও গৃহজাত বিবিধ মিষ্টান্ন সংযুক্ত একটি সুবৃহৎ ভোগ দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ এই ভোগ বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া দিয়া শিলাটি যথাস্থানে রাখিয়া সায়ংকাল অবধি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ভোগের দ্রব্যাদি এক এক দিন এক এক ব্রাহ্মণের বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়; কেননা দেবতা ও পিতৃলোকেরা ব্রাহ্মণের মুখে হব্য কব্য আহার করেন।

যস্যাস্যেন সদাশ্নন্তিহব্যানি ত্রিদিবৌকসা
কব্যানিচৈব পিতরঃ কিম্ভূত মধিকন্ততঃ।

অতএব দেবতা কি পিতৃলোকের উদ্দেশে কোন বস্তু দান করিয়া সেই বস্তু ব্রাহ্মণকে দিতে হয়। উপরে যে অনুষ্ঠানটী বর্ণিত হইল, ইহার নাম ঠাকুর ঝারায় বসান। কি সুন্দর অনুষ্ঠান! ইহার আনুসঙ্গিক চামর ব্যজনাদি অন্য অনেক সেবা ও অনুষ্ঠান আছে। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বোপলক্ষে শিলায় পূজার বাহুল্য হয়। নিত্যপূজা দশোপচারেই হয়, পর্ব্বে ষোড়শোপচারে ও অতিশয় সমৃদ্ধি পূর্ব্বক পূজা হয়।

সকল গৃহে শালগ্রাম শিলার সেবার ব্যবস্থা থাকাতে, প্রত্যহ প্রতি গৃহে একটি উৎসব হইয়া থাকে।

একবার মাত্র ধ্যান করিয়া দেবতার সহিত সংস্রব রহিত হইল তাহা নহে, হিন্দুর দেবতা জাগ্রত জীবন্ত দেবতা, তাঁহার সহিত হিন্দুর সমস্ত দিনই একপ্রকার না একপ্রকার সংস্রব আছে, হিন্দু ক্ষণমাত্রও দেবতাছাড়া নহেন।

শিবপূজা বিষ্ণুপূজার পর, যাঁহারা তান্ত্রিকদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা গুরুপূজা ও ইষ্টপূজা করেন।

প্রাতঃসন্ধ্যা পূজাদি হইয়া গেলে, তখন হিন্দু যদি ক্ষৌরকর্ম্মের বার হয়, তবে ক্ষৌরকর্ম্ম করেন। সপ্তাহের সকল বারেই হিন্দু ক্ষৌরকর্ম্ম করেন না। যিনি যে বেদাবলম্বী, অর্থাৎ যাঁহার যে বেদানুসারে ক্রিয়া কলাপ হয়, তিনি সেই বেদ বিহিত বারে ক্ষৌরকর্ম্ম করেন।

এই সকল ক্রিয়া করিতে করিতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হয়। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে, হিন্দু মাধ্যাহ্নিক স্নান ও মাধ্যাহ্নিক সন্ধ্যোপাসনা করেন। অনন্তর পঞ্চম যামার্দ্ধে অর্থাৎ বেলা আড়াই প্রহরে, হিন্দুর আহারের সময় হয়। আহারের সময় হইলেই যে আহার করিবেন, তাহা পারেন না। শালগ্রাম শিলার অন্নভোগের পূর্ব্বে বালক ও আতুর ভিন্ন কাহারও ভোজনের অধিকার থাকে না। মনুর বিধানানুসারে শালগ্রামের ভোগ হইয়া গেলে, অতিথিকে ভোজন করাইতে হয়। অনন্তর সখা, সহাধ্যায়ী, কুটুম্ব প্রভৃতি যদি প্রণয় উপলক্ষে কেহ গৃহে উপস্থিত হন, তবে

স্বীয় ভার্য্যার সহিত তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবেন। নব-বিবাহিতা স্ত্রী, পুত্রবধূ বা দুহিতা প্রভৃতিকে, বালকদিগকে রোগীদিগকে এবং গর্ভবতীদিগকে কোন বিচার না করিয়া অতিথির অগ্রেই ভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণদিগকে, জ্ঞাতি ও দাসাদি ভরণীয়বর্গকে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, গৃহদম্পতী তাহাই ভোজন করিবেন।

ভুক্তবৎস্বথ বিপ্রেষু স্বেষু ভৃত্যেষু চৈবহি,
ভুঞ্জীয়াতাং ততঃ পশ্চাদবশিষ্টন্তু দম্পতী।

হিন্দুর খাদ্যাখাদ্য ভক্ষ্যাভক্ষ্যের অনেক বিচার। মনুর মতে যে যে দ্রব্য বিহিত ও যে যে দ্রব্য প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বলিতে গেলে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ হয়। যে দ্রব্যের বিশেষরূপে নিষেধ বা বিধান করিয়াছেন, যথাস্থানে তাহারই উল্লেখ করা যাইবে।

আর স্থূলতঃ এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, যে হিন্দুর যখন একমাত্র লক্ষ্য কিরূপে পবিত্রতা অর্জ্জন করিয়া পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণার অধিকারী হইবেন, তখন যে আহারে সত্ত্বগুণের আধিক্য ও রজস্তমের খর্ব্বতা হয়, তাহাই হিন্দুর পক্ষে বিহিত।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ,
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিন মব্যয়ম্।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া, দেহে স্থিত নির্ব্বিকার দেহীকে সুখ, দুঃখ মোহাদি দ্বারা আবদ্ধ করে।

তত্রসত্ত্বং নির্ম্মলত্ত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ং,
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।
রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ সমুদ্ভবম্,
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্ম সঙ্গেন দেহিনম্।
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনম্ সর্ব্বদেহিনাম্,
প্রমাদালস্য নিদ্রাভি স্তন্নিবধ্নাতি ভারত।

এই গুণত্রয়ের মধ্যে নির্ম্মলত্ব হেতু জ্ঞানের প্রকাশক ও শান্ত সত্বগুণ দেহীকে সুখে, জ্ঞানে আশক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে। রজোগুণ অনুরাগাত্মক এবং তৃষ্ণা ও সঙ্গ হইতে উৎপন্ন। ইহা দেহীকে কর্ম্ম সকলে আশক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে এবং তমোগুণ অজ্ঞান সম্ভূত, এজন্য সকল প্রাণীর ভ্রান্তিজনক। ইহা অনবধানতা অনুদ্যম ও চিত্তের অবসন্নতা দ্বারা দেহীকে আবদ্ধ করে। যে গুণের আধিক্য হইলে দেহীর যে আহারে রুচি হয়, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে ;—

আয়ুঃ সত্ব বলরোগ্য সুখ প্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ,
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাহৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।

অর্থাৎ আয়ুঃ সাত্ত্বিকভাব,শক্তি,আরোগ্য ও রুচিবর্দ্ধক,রসযুক্ত, স্নেহযুক্ত, যাহার সারাংশ দেহে স্থায়ী হয়,এইরূপ এবং দৃষ্টিমাত্রই চিত্তপরিতোষকর আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয়।

কট্বম্লঃ লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরুক্ষ বিদাহিনঃ
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদা।

অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ,অতি তীক্ষ্ণ,

অতি বিদাহি এই সকল দুঃখ মনস্তাপ এবং রোগপ্রদ দ্রব্য রাজসিক ব্যক্তির প্রিয় আহার।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চযৎ,
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং।

শীতলাবস্থা প্রাপ্ত, গতরস, দুর্গন্ধ, পূর্ব্বদিনপক্ব, অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট এবং অমেধ্য যে খাদ্য, তাহা তামসগণের প্রিয়। এখন কোন্ দেহীর কোন্ গুণের আধিক্য, তাহা দেখা যাউক। ভগবান বলিয়াছেন ;—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ,
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্য কর্ত্তারমব্যয়ম্।

হিন্দুদিগের মধ্যে যে বর্ণভেদ আছে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণ আছে, কর্ম্ম ও গুণভেদে এই বর্ণভেদ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ সত্বপ্রধান, ক্ষত্রিয় সত্ব ও রজঃ প্রধান, বৈশ্য রজঃ ও তমঃ প্রধান, এবং শূদ্র তমঃ প্রধান। তাহা হইলে—

ব্রাহ্মণের আহার, সাত্বিক—

আয়ুঃ সত্বলারোগ্য সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ,
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃস্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্বিকাপ্রিয়াঃ।

শূদ্রের আহার, তামসিক—

যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ,
উচ্ছিষ্ট মপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্।

ক্ষত্রিয়ের আহার, আংশিক সাত্বিক—

আয়ুঃ সত্ব বলারোগ্য ইত্যাদি।

আংশিক রাজসিক—

কট্বম্লঃ লবণাত্যুষ্ণ ইত্যাদি।

বৈশ্যের আহার, আংশিক রাজসিক—

কট্বম্লঃ লবণাত্যুষ্ণ ইত্যাদি।

আংশিক তামসিক—

যাতযামং গতরসং ইত্যাদি।

সাত্ত্বিক আহার রসযুক্ত, স্নেহযুক্ত, যাহার সারাংশ শরীরে অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় এবং দৃষ্টিমাত্রই যাহা চিত্তপরিতোষকর হয়। দুগ্ধ ও ঘৃত রসযুক্ত ও স্নেহযুক্ত এবং এতদুভয় গুরুপাক অর্থাৎ শীঘ্র জীর্ণ হয় না, দেহে অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। এই সকল দ্রব্যই হিন্দুর প্রধান আহার। এতদ্ভিন্ন তণ্ডুল, আতপ হউক আর উষ্ণ হউক, সিদ্ধ করিয়া অন্ন হয়। ডাইল ও শাকাদি স্নেহ লবণ ও মসালা অর্থাৎ সুগন্ধি দ্রব্য সংযোগে রন্ধন করিয়া ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়। এই অন্ন ও ব্যঞ্জন হিন্দুমাত্রেরই আহারীয় দ্রব্য। হিন্দু একাকী কি কেবলমাত্র পুত্র কলত্রাদি লইয়া আহার করেন না; তিনি অতিথি কুটুম্ব যাবতীয় ভরণীয়বর্গকে আহার করাইয়া তবে অবশিষ্ট আহারীয় দ্রব্য স্ত্রী পুরুষে আহার করেন। অতএব হিন্দুপরিবারে ভোক্তার সংখ্যা অধিক। মৎস্য মাংস আহার ব্যয়সাধ্য। যেখানে অধিক ভোক্তা, সেখানে এই সকল দ্রব্য নিত্য আহার করা ঘটেনা; অতএব যাহাদিগের আহার রাজসিক ও তামসিক এবং মৎস্য মাংস আহারে যাহাদিগের আপত্তি নাই, তাহাদিগেরও নিত্য আহার শাকান্ন।

হিন্দু এই কারণে প্রধানতঃ নিরামিষভোজী। যদিও অনেকে মৎস্য খাইয়া থাকেন এবং বিশেষ বিশেষ মৎস্য দৈব পৈত্রাদি কর্ম্মে ভক্ষণ করিতে পারা যায় বলিয়া বিধি আছে ও বৈধ অর্থাৎ মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত মাংস খাইবার বিধি শাস্ত্রে আছে, তথাপি মনু বৈধাবৈধ সকল প্রকার মৎস্য ও মাংসের বিচার কয়িয়া উপসংহার স্থলে মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদঃ তস্মান্ মৎস্যান বিবর্জ্জয়েৎ।

এবং মাংস ভক্ষণ স্থলে বলিয়াছেন,—

সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌচ দেহিনাং,
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্তেত সর্ব্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ।

মনু বলেন,—যে ব্যক্তি শতবর্ষ ব্যাপিয়া বর্ষে বর্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন মাংস ভক্ষণ না করেন, এই উভয়ের পুণ্যফল সমান। ইহা অপেক্ষা মাংস ভক্ষণের বিরুদ্ধে অধিক কি বলা যাইতে পারে? ফলতঃ মাংসাহার হিন্দুদিগের শাস্ত্রে নিষিদ্ধ এবং তাঁহাদিগের ব্যবহারেও বিরল। দেবপূজাতে যে বলি প্রদান হয়, সেই বলির মাংস পাক করিয়া দেবতার ভোগ দেওয়া হয় এবং তাহা নিবেদিত হইলে প্রসাদ বলিয়া সকলে সাদরে গ্রহণ করেন; কিন্তু বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের লোকেরা কি ব্রহ্মচারী, কি বিধবাগণ তাহাও গ্রহণ করেন না। হিন্দুর মাংসাহার বৎসরের মধ্যে দুই চারি দিন মাত্র ঘটে এবং তাহাও সকলের ঘটে না। বঙ্গদেশের মধ্যে অনেকে মৎস্য ভোজন

করেন। ব্রহ্মচারী ও বিধবারমণী ভিন্ন প্রায় সকলেই আহার করেন; কিন্তু যাঁহারা মৎস্য ভোজন হইতে বিরত, তাঁহারা অধিক শ্রদ্ধাস্পদ।

মৎস্য মাংস আহারে সত্ত্বঃগুণের হানি ব্যতীত কোন মতে বৃদ্ধি হয় না। যে পশুর মাংস আহার করা যায়, সেই পশুর ধর্ম্মগুলি সমস্তই সেই মাংসখাদকে বর্ত্তিয়া থাকে। যখন ভুক্ত-দ্রব্য আমরা পরিপাক করি, তখন সেই ভুক্তদ্রব্যে প্রসুপ্ত-ভাবে যে জীবনীশক্তি থাকে এবং সেই জীবনীশক্তির অন্তর্গত যে আধ্যাত্মিকশক্তি ওতপ্রোতরূপে মিশ্রিত থাকে, তাহাও আমরা শোষণ করিয়া লই, অর্থাৎ তাহাও পরিপাক করি, এবং তাহাও আমাদের শরীরের ধাতুভুক্ত হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে শরীরাভ্যন্তরে যাবতীয় যন্ত্র আছে, এবং সেই যন্ত্র সমূহের সূক্ষ্মতম অংশগুলি কেহই জড় নহে; অর্থাৎ তাহারা যে মস্তিষ্কের প্রভাবে পরিচালিত হইয়া ক্রিয়াশীল হয়, এরূপ নহে; তাহাদিগের স্বাধীন ক্রিয়া আছে, স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি আছে। মনোবৃত্তি যে কেবল জীবের মস্তিষ্কেই থাকে, তাহা নয়; ইহা সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া থাকে। অতএব পশুদেহের যে কোন অংশের মাংস ভক্ষণ করি না কেন, আমাদিগের মন পশুবৃত্তি দ্বারা কলুষিত হইবেই হইবে, অথবা আমরা পশুত্ব প্রাপ্ত হইব। মাংসাহার সম্বন্ধে আমাদিগের বিচার অনাবশ্যক বিবেচনায় তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। ইউরোপীয়েরা প্রধানতঃ মাংসভোজী। এই ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অনেক সুশিক্ষিত

পদস্থ ও মাননীয় লোক সভা সমিতি করিয়া বক্তৃতা প্রচার ও গ্রন্থরচনাদি দ্বারা মাংসাহার অনাবশ্যক ও দোষাবহ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং অনেকে মাংসাহার হইতে বিরত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন উদ্ভিজ্জভোজী হইয়াছেন। পাঠকবর্গ এই সকল বক্তৃতা বিচার ও গ্রন্থাদি অবশ্যই পাঠ করিয়াছেন,—না করিয়া থাকেন, তবে মনে করিলেই পাঠ করিতে পারেন। অতএব এতদ্বিষয়ে আমাদিগের বিচার চর্ব্বিতচর্ব্বণমাত্র হইবে। মাংসাহার অনাবশ্যক ও দোষাবহ, ইহা যুক্তি ও বিচার দ্বারা অবধারিত হইয়াছে এবং ইহা আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা স্পষ্টাক্ষরে নিষেধ করিয়াছেন, এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে।

হিন্দু উদ্ভিজ্জভোজী বলিয়া মৃত্তিকা ভেদ করিয়া যাহা কিছু ভূপৃষ্ঠে উদয় হয়, তাহাই যে তাঁহার খাদ্য তাহা নহে। লশুন, পলাণ্ডু, গৃঞ্জন অথবা গাজর, কবক অর্থাৎ কোঁড়ক এবং যাবতীয় অমেধ্য-সম্ভব উদ্ভিজ্জ, তাঁহাদিগের অখাদ্য। কবক অথবা কোঁড়ক যাহাকে সচরাচর ব্যাঙেরছাতা বলে, অপবিত্র স্থানেই তাহারা জন্মিয়া থাকে, তাহা খাইলে পবিত্রতা রক্ষা কিরূপে হইতে পারে? যে বস্তু দ্বারা স্থান অপবিত্র হয়, সেই সেই বস্তুর আহার আর তৎকর্ত্তৃক কলুষিত স্থানে উৎপন্ন উদ্ভিজ্জের আহার সমান, অর্থাৎ অপবিত্র বস্তুর আহারে দেহ ও মনের পবিত্রতা থাকে না এবং অপবিত্রবস্তুসম্ভূত অপর বস্তুর আহারেও দেহ মন অপবিত্র হয়। লশুন, পালাণ্ডু ও গাজর এই সমস্ত উদ্ভি-

জ্জের আহার যে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার কারণ বোধ হয়, তাহাদিগের বিজাতীয় দুর্গন্ধ। দুর্গন্ধ বা পূতিগন্ধ যে তামসিক রুচির প্রীতিকর, তাহা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। যে বস্তুতে তামসিক রুচির প্রীতি জন্মে, সে অবশ্যই তমোগুণাত্মকরসপ্রধান দ্রব্য হইবে এবং তাহার আহারে তমোগুণের আধিক্য ও হইবে। এ জন্য তমোগুণ খর্ব্ব করা যাঁহাদিগের উদ্দেশ্য, তাঁহাদের পক্ষে পলাণ্ডু ও তৎসদৃশ উগ্রগন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যের ভক্ষণ নিষেধ। আধুনিক বাঙ্গালা লেখকদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু পলাণ্ডু সম্বন্ধে তাঁহার হিন্দুত্ব নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—"আহারে পলাণ্ডু ব্যবহার করিলে শরীর মধ্যে প্রশান্তভাবের কিছু ব্যত্যয় হয়, ইহা আমরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং পলাণ্ডুরস প্লাবিত মাংসাহারে মস্তিষ্ক যে ধূমময় হইয়া উঠে এবং সমুদয় আভ্যন্তরিক মনুষ্যটা স্থূল বা মোটা (Coarse) হইয়া পড়ে ইহাও আমরাপ্রত্যক্ষ করিয়াছি।" এই কারণে পলাণ্ডু উদ্ভিজ্জ হইলেও এবং অমেধ্য সম্ভব না হইলেও, তাহার আহার শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। /

এতদ্ভিন্ন বিহিত খাদ্য অর্থাৎ যে সমস্ত উদ্ভিজ্জ প্রতিষিদ্ধ নহে, তাহাও তিথিবিশেষে নিষিদ্ধ হয়। যথা,—প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড, দ্বিতীয়ায় বৃহতী বা ব্যাকুড় (ক্ষুদ্র বার্ত্তকীবিশেষ), তৃতীয়ায় পটোল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বিল্ব, বা শ্রীফল, ষষ্ঠীতে নিম্বুক বা কাগচিলেবু, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে অলাবু বা লাউ, দশমীতে কলম্বীশাক,

একাদশীতে শিম্বী, দ্বাদশীতে পূতিকা বা পুঁইশাক, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকী, চতুর্দ্দশীতে মাষকলায় নিষিদ্ধ। বিহিত ফলমূলাদি তিথি বিশেষে নিষিদ্ধ হইবার কারণ এই যে, চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে যেমন উষ্ণানুষ্ণতার হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তেমনি জীবশরীরে ধাতুর ও বিকার হয় এবং যে ফল মূলে প্রকৃতিস্থ ধাতুর পরিপোষণ হয়, ধাতু বিকৃত হইলে তদ্দ্বারা অনিষ্ট হয়। কুষ্মাণ্ড ক্ষারগুণ প্রধান ফল উভয় পক্ষের প্রতিপদ তিথিতে শ্লৈষ্মিক ধাতু অপেক্ষাকৃত অধিক লবণরসাশ্রিত হয়। শ্লেষ্মা স্বভাবতঃ লবণরসাত্মক এবং তিথি প্রভাবে সেই রসের আধিক্য হইলে যদি তাহার উপর ক্ষার অর্থাৎ লবণরসাত্মক রুক্ষখাদ্য আহার করা যায়, তাহা হইলে ব্রণাদি ক্লেদরোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা বলিয়াই বোধ হয়, কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ উক্ত তিথিতে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। বৃহতী বা ব্যাকুড়ফলের নানা গুণের মধ্যে পিত্ত উষ্ণকর ও ক্রূরবায়ুবর্দ্ধক দুইটী গুণ আছে, দ্বিতীয়া তিথিতে পিত্ত অত্যন্ত উষ্ণ হয়, সুতরাং এই তিথিতে বৃহতী ভক্ষণ করিলে (অর্ব্বুদ) চক্ষুরোগ হইবার সম্ভাবনা বলিয়া বৃহতী ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। পটোলের আর আর গুণের মধ্যে রক্তোষ্ণকারক ও স্নিগ্ধোষ্ণ এই দুই গুণ আছে। তৃতীয়ায় রক্ত অত্যন্ত উষ্ণ হয়। ঐ সময় রক্তের উষ্ণতাবর্দ্ধক স্নিগ্ধোষ্ণ দ্রব্য ভোজন করিলে রক্ত সমধিক উষ্ণ হইয়া রক্তবাত রোগ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, এই জন্য তৃতীয়া তিথিতে পটোল ভক্ষণ নিষেধ।

মূলকের গুণ মলরোধক, আর আম ও বায়ু, পিত্ত, কফের ক্রূরতা, রুক্ষতা ও প্রবলতাদি বিকার উৎপাদক। চতুর্থীতিথিতে পৈত্তিকধাতু ও শ্লৈষ্মিকধাতু রুক্ষ ও বায়ু ক্রূরভাব ধারণ করে। এই সময়ে বাতাদি ত্রিদোষের সর্ব্বপ্রকার বিকারবর্দ্ধক মূলক ভক্ষণ করিলে, আমরোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা বলিয়া চতুর্থীতিথিতে মূলক ভক্ষণ নিষেধ। বিল্বের একটি গুণ পিত্তবৃদ্ধিকারক। পঞ্চমীতে পিত্ত অত্যন্ত প্রবল হয়, সুতরাং পঞ্চমীতে বিল্ব ভক্ষণ করিলে অতিশয় পিত্ত প্রাবল্য হয় এবং পৈত্তিক রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা বলিয়া,পঞ্চমীতে বিল্ব ভক্ষণ নিষেধ। নিম্বুক অম্লরসাত্মক, ইহা শিরানিহিত শৈত্যরস অত্যন্ত বৃদ্ধি করে। ষষ্ঠীতে শিরাসমূহ অত্যন্ত শৈত্যরসাশ্রিত হয়। এই সময়ে শৈত্যবর্দ্ধক অম্লগুণসম্পন্ন নিম্বুক ভোজন করিলে, শিরাসংস্থিত শৈত্যরস অত্যন্ত প্রবল হইয়া, কোষরোগ উৎপত্তি করিতে পারে বলিয়া, ষষ্ঠীতিথিতে নিম্বুক ভক্ষণ নিষেধ। তালের একটি গুণ, কফ ও রক্তপিত্তরোগবর্দ্ধক। সপ্তমীতিথিতে রক্ত ও পিত্ত যুগপৎ তরল হয়; এ সময় রক্তপিত্ত-রোগবর্দ্ধক তাল ভক্ষণ করিলে, রক্তপিত্ত-রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা বলিয়া, সপ্তমীতে তাল ভক্ষণ নিষেধ।

নারিকেল দুষ্পচ, মলরোধক এবং গুরু, অষ্টমীতে পাকস্থলী দুর্ব্বল এবং অগ্নিমান্দ্য হয়, সে সময় মলরোধক, দুষ্পচ ও গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ করিলে অজীর্ণরোগ উৎপন্ন হয়, এই জন্য অষ্টমীতে নারিকেল ভক্ষণ নিষেধ। অলাবু বাতশ্লেষ্মা-

রোগকারিণী, নবমীতিথিতে বায়ু কুপিত, আর শ্লেষ্মা উষ্ণ হয়। এই বাতশ্লৈষ্মিক-রোগকারিণী অলাবু ভোজন করিলে, বাতশ্লৈষ্মিক রোগ উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া, নবমীতে অলাবু ভক্ষণ নিষেধ। কলম্বী অম্লপিত্ত রোগ, শ্লেষ্মা আর মলবৃদ্ধিকারিণী; দশমীতে ক্রূরপিত্ত আর অম্লের ভাগ বৃদ্ধি হয়। এ সময়ে অম্লপিত্ত-রোগকারিণী কলম্বী ভোজন করিলে অম্লপিত্তরোগ হইবার সম্ভাবনা বলিয়া, দশমীতিথিতে কলম্বী শাক খাওয়া নিষেধ। শিম্বী শৈত্যগুণ-সম্পন্ন, রস, জ্বর এবং শ্বাসরোগকারিণী। একাদশীতে নাড়িতে শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিকজ্বর-কারক রসের সঞ্চার হয়। ঐ সময় রস ও জ্বরকারিণী শিম্বী ভক্ষণ করিলে জ্বরোৎপন্ন হইতে পারে, এজন্য একাদশীতে শিম্বী ভক্ষণ নিষেধ। পূতিকা এককালেই অভক্ষ্যা বলিয়া নির্দ্দেশিতা হইয়াছে, যেহেতু ইহা গুরুপাক, শ্লেষ্মাকারিণী এবং পিত্ত, বায়ু ও রক্তকাশ (যক্ষ্মাকাশ) বর্দ্ধিনী। দ্বাদশীতিথিতে রক্ত আর ক্রূরশ্লেষ্মার বৃদ্ধি এবং বায়ু কুপিত হয়। পূতিকা যক্ষ্মাকাশ আর বাতাদি ত্রিদোষ-বর্দ্ধিনী। দ্বাদশীতে রক্ত আর ক্রূরশ্লেষ্মা যে পরিমাণে ক্রূর হয়, ঐ তিথিতে পূতিকা ভক্ষণ করিলে, যক্ষ্মারোগের বীজোৎপন্ন করিতে পারে। এই জন্য পূতিকা এককালে নিষেধ করিয়াও দ্বাদশীতে কোন মতেই ভক্ষণ করিবে না বলিয়া, নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে তাহার প্রতিষেধ করিয়াছেন। বার্ত্তাকু বহ্নিউদ্দীপনী, বায়ুনাশিনী, রক্তবিবর্দ্ধনী এবং কণ্ডুরোগোৎপাদিনী। ত্রয়োদশী তিথিতে বায়ু মন্দ-

গামিনী এবং শরীরস্থ রক্ত অতিশয় গাঢ় হইয়া থাকে। সহজেই এই তিথিতে রক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যথোপযুক্ত চালিত হইতে না পারিয়া, স্থানে স্থানে বদ্ধ ও দূষিত হয়। ইহার উপর আবার যদি বায়ুনাশিনী, রক্তবর্দ্ধনী, কণ্ডুকারিণী বার্ত্তাকী ভোজন করা হয়, তাহা হইলে কণ্ডুরোগের উৎপত্তি হইতে পারে, এই জন্য ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকী ভক্ষণ নিষেধ। মাষকলায় মলবৃদ্ধিকারক, গুরুপাক ও অতিশয় রোগকারক। চতুর্দ্দশীতিথিতে অপানবায়ু ঊর্দ্ধগামী হয়, তাহাতে কোষ্ঠবদ্ধরোগ সঞ্চার হয়। এ সময়ে মলবর্দ্ধক অতিশয় রোগোৎপাদক গুরুপাক মাষকলায় ভক্ষণ করিলে, অতিসারাদি উদরাময় উৎপন্ন হইতে পারে। এই জন্য চতুর্দ্দশীতে মাষকলায় ভক্ষণ নিষিদ্ধ। যে যে তিথিতে যে যে ফল মূল ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ, তাহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারিত; কিন্তু ইদানীন্তন ইংরাজিশিক্ষিত-যুবকেরা এক ফল, মূল এক তিথিতে খাদ্য ও এক তিথিতে অখাদ্য কেমন করিয়া হয়, না বুঝিতে পারিয়া তিথিবিশেষে ফল মূলাদির খাদ্যাখাদ্যের বিচার গ্রাহ্য করেন না। এই জন্য সমুদায়ের কারণ নির্দ্দেশ করা গেল।

বিশেষ বিশেষ তিথিতে যে শরীরের বিশেষ বিশেষ ধাতুর বিকার হয়, উক্ত যুবকবৃন্দেরা তাহার প্রমাণ চাহিবেন, এই জন্য নিম্নে শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ সকল উদ্ধৃত হইল।

"পক্ষদ্বয়ে প্রতিপদি কফধাতুর্ভবেৎ পুনঃ,
লবণেন সমাযুক্ত দ্বিতীয়ায়াং তথৈবচ।

পিত্তধাতুশ্চ বায়ুশ্চ ক্রমাচ্চভৃশমুষ্ণতাং,
তীক্ষ্ণত্বঞ্চ সমাপ্নোতি তৃতীয়ায়াঞ্চ শোণিতম্।
অত্যন্তমুষ্ণতাং প্রাপ্তং বায়ুশ্চ ক্রূরতাং গতঃ,
ক্রূরেণ বায়ুনা রক্তসাচীভাবেন চালিতম্।
চতুর্থ্যাং পিত্তধাতুশ্চ শ্লৈষ্মিকো ধাতুরেবচ,
দোধাতুরুক্ষতাং প্রাপ্তৌ বায়ুশ্চ ক্রূরভাবগঃ।
রুক্ষভ্যাঞ্চ তদাতাভ্যাং ক্রূরভাবেন বায়ুনা,
মলাধারান্মলং সর্ব্বং নিঃসৃতং ন যথোচিতম্।
তে নৈব হেতুনাধীর বেদনোদ্বেগ এবচ,
ভবেত্যেবহি লোকানাং আমরোগস্য লক্ষণম্।
পঞ্চম্যাঞ্চ তিথৌ পিত্তং প্রবলত্বং ব্রজেত্তথা,
শিরায়াং শৈত্যভাগস্য ষষ্ঠ্যাং বৃদ্ধির্ভবেদ্ভৃশম্।
রক্তপিত্তঞ্চ সপ্তম্যাং যুগপত্তরলং ভবেৎ,
অষ্টম্যামগ্নিমান্দ্যঞ্চ পাকস্থানঞ্চ দুর্ব্বলম্।
নবম্যাং কুপিতো বায়ুঃ শ্লেষ্মাতু চোষ্ণতাং গতঃ,
দশম্যাং ক্রূরপিত্তস্তু অম্লবৃদ্ধির্ভবেত্তদা।
বাতশ্লৈষ্মিক সন্তাপ কফীয় জ্বরকারকঃ,
রসঃ সংজায়তেঽত্রাপি একাদশ্যাং ন সংশয়ঃ।
ক্রূরস্য শ্লেষ্মলোবৃদ্ধি রক্তস্যচ তথৈবহি,
বায়ুশ্চ ক্রূরভাবশ্চ দ্বাদশ্যান্তু ভবেত্তথা।
ঘনীভূতং ভবেদ্রক্তং বায়ুশ্চ মৃদুতাং গতঃ,
মৃদুনা বায়ুনা রক্ত চালিতং ন যথোচিতং।
কুত্রচিৎ কুত্রচিৎ স্থানে বদ্ধস্যাদ্দূষিতং তথা,

ত্রয়োদশ্যান্তু চৈতানি ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
চতুর্দ্দশ্যামপানস্থঃ বায়ুরূর্দ্ধং গতস্তথা,
তে নৈবানাহ রোগশ্চ উদর স্তম্ভনং তথা।
পৌর্ণমাস্যাং ভবেৎ শৈত্যং গুণস্য চাতিবর্দ্ধনম্,
সুধাংশো পূর্ণরূপত্বাদিতি বেদবিদোবিদুঃ।
কুহ্বাং চন্দ্রকলা নষ্টাদুষ্মণশ্চাতিবর্দ্ধনং,
পাকশক্তে দুর্ব্বলত্বং কফোৎপত্তেশ্চ কারণম্।

ফল মূলাদির গুণ যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ চিকিৎসাশাস্ত্র। বোধ হয়, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক হইবে না।

আহার সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা প্রায় সমস্তই বলা হইল, কেবল আহার প্রস্তুত করা অর্থাৎ পাকসম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। পাক কার্য্যটি আহার সম্বন্ধে প্রধান অনুষ্ঠান। হিন্দুর আহার বিপণি বা পণ্যশালায় প্রস্তুত থাকে না, অথবা কাহাকে পারিশ্রমিক দিলে, সে প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে না। অতিশয় আঢ্য ব্যক্তি, যাঁহার পরিচর্য্যার জন্য বহু দাস দাসী আছে, তাঁহাকেও নিজের আহার নিজে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। কোন আহার্য্য পাক করিতে হইলে, পাচক পাচ্যদ্রব্যকে বারংবার হস্ত দ্বারা আলোড়িত ও মথিত করে; সুতরাং পাচকের অরাতে তাহা সর্ব্বতোভাবে ম্রক্ষিত হয় এবং সে দ্রব্য আহার করিলে, পাচকের অরা উদরস্থ করা হয়।

অতএব নিজের পবিত্রতা রক্ষা করিবে যে তাহাকে

নিজের আহার নিজেই প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। যত্যাচারী ব্রাহ্মণ, বিধবা রমণীগণ, যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বিনী, ইহাঁরা আপনার আহার আপনারা প্রস্তুত করিয়া লন। এতদ্ভিন্ন সকলেরই নিজের আহার নিজে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়, তবে যাঁহারা কার্য্য বা অবস্থার অনুরোধে স্বয়ং পাক করিতে অসমর্থ, তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিনীগণ তাঁহাদিগের জন্য পাক করেন, অথবা স্বগোত্রের কোন পবিত্রা নারী তাঁহাদিগের পাক কার্য্য সমাধা করেন। এই জন্য দেখিতে পাওয়া যায়, যে হিন্দুপরিবারের ভিতর গৃহস্বামীর পত্নী কি তাঁহার পিতৃব্য বা জ্যেষ্ঠতাতপত্নী কিম্বা ভ্রাতৃজায়া অথবা পুত্রবধূ গৃহস্থের পাচিকা। সেই পাচিকা কৃতস্নান, কৃতাহ্নিক ও সর্ব্বতোভাবে পবিত্র হইয়া পাক কার্য্য সমাধা করেন এবং সমস্ত প্রস্তুত হইলে, তিনিই সকলকে পরিবেশন করেন; অপর কাহারও সে অন্ন স্পর্শ কবিবার অধিকার থাকে না এবং পাকশালায় ইতর বর্ণের কি স্ববর্ণের কোন অপবিত্র লোকের প্রবেশাধিকার থাকে না। সংসর্গে অরার পরোক্ষ কার্য্য হয়, আহারে তাহার প্রত্যক্ষ ক্রিয়া, এই জন্য পাক সম্বন্ধে এত কঠিন নিয়ম।

এবম্প্রকারে প্রস্তুত অন্ন যদি ভ্রূণঘাতী কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, কি ঋতুমতী নারী অথবা কুকুর কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, কি গাভী কর্ত্তৃক আঘ্রাত হয়, কি পক্ষিগণ কর্ত্তৃক অবলীঢ় অর্থাৎ ঠোক্রান হয়, তাহা হইলে সে অন্ন ত্যাগ করিতে হয়।

আঁহার করিবার নিয়ম এই যে, ব্রাহ্মণ প্রতিদিন হাত,

পা ও মুখ ধুইয়া, আর্দ্রপদে পূর্ব্বমুখে শুচি হইয়া অনন্য-মনে ভোজন করিবেন। ভোজনান্তে আবার ঐরূপ উপ-স্পর্শন করিবেন এবং জল দ্বারা মুখের ছয়টি ইন্দ্রিয়স্থান স্পর্শ করিবেন। ভোজন কালে প্রতিদিন অন্নকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন। অন্নের নিন্দা করিবেন না, অন্ন দেখিয়া হৃষ্ট হইবেন, মনের সঙ্কোচভাব পরিত্যাগ করিবেন এবং যাহাতে প্রতিদিন অন্নলাভ হয়, এইরূপ প্রতিনন্দন করিবেন। প্রতিদিন এইরূপে ভক্তিভাবে অন্ন ভোজন করিলে, সামর্থ্য ও বলবীর্য্য লাভ হয়। পরন্তু অশ্র-দ্ধার সহিত ভোজন করিলে উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়। উচ্ছিষ্ট অন্ন কাহাকেও প্রদান করিবেন না এবং সায়ং-প্রাতর্ভোজন কালের মধ্যে আর ভোজন করিবেন না।

হিন্দুর আচারগত সকল নিয়মই শিথিল হইয়া গিয়াছে এবং অনেকের একেবারে লোপ হইয়াছে; কিন্তু আহার সম্বন্ধে নিয়ম সকলে সহসা অতিক্রম বা উল্লঙ্ঘন করে না। উপরে বলা গিয়াছে যে, সংসর্গে অরার পরোক্ষ কার্য্য হয়, কিন্তু আহারে তাহার প্রত্যক্ষ ক্রিয়া। বোধ হয়, এই জন্য আহারের নিয়ম যত্নে প্রতিপালিত হয়। যাহারা দুষ্ক্রিয়ান্বিত (চোর, ঠগ প্রভৃতি) তাহারাও আহারের নিয়ম পালনে অতিশয় যত্নবান্। এরূপ শুনা গিয়াছে, কোন কারাগারে জনৈক উচ্চবর্ণের অপরাধী কারাগারের প্রস্তুত অন্ন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। কারাগারের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইহাতে উক্ত অপরাধীকে অনেক ভৎ‌র্সনা, তাড়না, ভয়প্রদর্শন ও

শাসন করিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই কারাগারের প্রস্তুত অন্নগ্রহণে স্বীকৃত হইল না। উপর্য্যুপরি তিন চারি দিন অনশনে কাটাইল। অনন্তর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ভীত হইলেন, যদি লোকটি অনাহারে মারা পড়ে,তাঁহাদিগকে অনুযোজ্য ও দণ্ডার্হ হইতে হইবে; তখন তাঁহারা যাহাতে সেই ব্যক্তির কোন আহার দ্রব্য গলাধঃকরণ না করাইয়া শরীরের পুষ্টি হয়, এরূপ কৌশল করিলেন। এক বৃহৎ মৃণ্ময় পাত্র অর্থাৎ গামলা আনাইয়া, মধু ও জল দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া, অপরাধীকে তাহাতে আকণ্ঠনিমগ্ন করিয়া রাখিলেন। গাত্র-চর্ম্মের শোষণী শক্তি দ্বারা সেই মধু ও জল তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল এবং প্রাণ রক্ষার উপযোগী পুষ্টি হইতে লাগিল। লেখকের জনৈক আচারবান আত্মীয় ব্যক্তি যত বার কলিকাতা হইতে জাহাজে করিয়া পুরু-ষোত্তম দর্শনে গিয়াছেন, যে কয়েক দিবস জাহাজে থাকিতে হইয়াছিল, সে কয় দিবস মলমূত্রত্যাগ কি স্নান আহার কিছুই করেন নাই। এ ব্যক্তি একজন উন্নতসাধক, সুতরাং ইহাঁর পক্ষে এরূপ ব্যবহার বড় বিচিত্র নহে; কিন্তু আর একটি বৃত্তান্ত বর্ণিত হইতেছে, পাঠক তাহা পাঠ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন। লেখকের এক পুত্র রাজকীয় কর্ম্মের অনুরোধে সপরিবারে একবার অতি দূরদেশে গমন করেন,—লেখককেও সেই সমভিব্যাহারে যাইতে হইয়াছিল। এই বিদেশযাত্রায় একদিন রেলে, অর্থাৎ বাষ্পীয়শকটে ও তিন দিবস একাদিক্রমে জাহাজে যাইতে হইয়াছিল।

লেখকের পুত্র, বালক, বালিকা ও দাস দাসীগণ যথাকালে মৈত্রকার্য্য ও স্নানাদি করিয়া, যে আহার্য্য দ্রব্য গৃহ হইতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং পথিমধ্যে যাহা সংগ্রহীত হইয়াছিল, তাহা আহার করিয়া দিন যাপন করিলেন। লেখকও যৎকিঞ্চিৎ গঙ্গাজল সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার সাহায্যে ও "পথি শূদ্রবদাচরেৎ" এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া, যথাকথঞ্চিৎ শৌচাদি ও সন্ধ্যোপাসনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া স্বয়ং যে সঙ্কীর্ণস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহারই চতুস্পার্শ্বে গঙ্গাজল অভ্যুক্ষণ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ ফল মূলাদি আহার করিলেন ; কিন্তু তাঁহার পুত্রবধূ ত্রিংশৎ বৎসরের অনধিক বয়স্কা, তিনি তিন দিবস জলস্পর্শ করিলেন না ;—এমন কি, মলমূত্রত্যাগ পর্য্যন্ত করিলেন না। লেখক শ্বশুর, তাঁহার বারংবার অনুরোধ, তাঁহার পতির অনুরোধ, কিছুই মানিলেন না। তিনি তিন দিবস অনাহারে শুখাইতে শুখাইতে চলিলেন। সাহেবদিগের খানা প্রস্তুত হইতেছে, চারিদিকে পলাণ্ডু ও লশুনের উগ্রগন্ধ বিস্তার হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে খানসামাগণ খানা লইয়া যাত্রিগণের মধ্য দিয়া হুম্ হুম্ করিয়া চলিয়া যাইতেছে ; কখন বা মেথর সম্মার্জ্জনী লইয়া আসিয়া যেখানে যাত্রিগণ বসিয়া আছে, সেই স্থান পরিষ্কার করিতেছে। এ স্থলে আচারবতী পবিত্রা হিন্দুমহিলার কিরূপে আহারে প্রবৃত্তি হইবে ? যদিও গঙ্গাজলে সমস্ত শুচি হইয়াছে এরূপ বোধ হয়, তথাপি প্রবৃত্তি বুদ্ধি বিচারের আয়ত্ত নহে, অভ্যাসের নিতান্ত

অধীন। ইংরাজি-সমাচারপত্রিকার সম্পাদকেরা কখন কখন যে বড় আস্ফালন ও গর্ব্ব করিয়া বলিয়া থাকেন যে, এতদ্দেশীয় লোকদিগের দেশদেশান্তরে গমনাগমনের সৌকর্য্যার্থে রেল, জাহাজ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া, ব্রিটিস গভর্ণমেণ্ট কি মহান্ উপকার করিয়াছেন! এই কি সেই মহান্ উপকার? বাষ্পীয়শকট ও বাষ্পীয়পোতের সৃষ্টিতে বহুতর কল্যাণ সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে, কে তাহার অপলাপ করিতে পারে? কিন্তু এই কল্যাণকর সুখাবহযান সকল এতদ্দেশীয় লোকদিগের সম্যকরূপে আয়ত্ত হইতেছে না। অনায়ত্ত হইবার কোন কারণ নাই; দেশীয়লোকদিগের সুবিধা অসুবিধার প্রতি যদি কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের কিঞ্চিৎ লক্ষ্য থাকিত, তবে যাহারা ছয় মাসের পথ ছয় দিনে উত্তীর্ণ হইবার যান প্রস্তুত করিতে পারে, তাহারা সেই যানকে সকল জাতির সুবিধাজনক করিতে পারিত। বাণিজ্য বিস্তার প্রভৃতি দ্বারা হিন্দুদিগের পরোক্ষে অনেক উপকার হইতেছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ উপকার অতি অকিঞ্চিৎকর।

প্রকৃত প্রস্তাবে উপকার রাজপুরুষদিগের স্বজাতীয়লোকদিগেরই হইয়াছে ও তাঁহাদিগের শিক্ষাপ্রভাবে যে এক প্রকার হিন্দুবিকার জন্মিয়াছে, অর্থাৎ "ইয়ং বেঙ্গল" নামে যে এক অভিনব যুবক শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে, এই মহান্ উপকার তাঁহাদিগের ভোগে আসিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত হিন্দুদিগের দেশদেশান্তর গমনাগমনের বিশেষ কিঁ উপকার

হইয়াছ বুঝিতে পারা যায় না। তাঁহাদিগেকে পূর্ব্বে নৌকাদি যানদ্বারা বড় বড় নদী ও সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে হইত, এবং অনেকে জলমগ্ন হইয়া মারা পড়িতেন। এখন রেল জাহাজে সেই সমস্ত দুর্গম, দুস্তর পথ ও জলাশয়াদি উত্তীর্ণ হইয়া অনাহারে ও বেগরোধে রোগগ্রস্ত হইয়া মারা পড়িতেছেন। সেই মৃত্যু এখনও রহিয়াছে, মাত্র অপঘাত কথাটি নাই, এই বিশেষ। দেশের ভিতর এক প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে যাইতে যখন তিন দিন মাত্র অধিকাংশ স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় লোকের সংসর্গে জাহাজে থাকিয়া জাতি অর্থাৎ পবিত্রতা রক্ষা করা এত কঠিন ব্যাপার, তখন যাহারা একাদিক্রমে দুই তিন সপ্তাহ কি মাসাবধি কাল নিরবচ্ছিন্ন ম্লেচ্ছসংসর্গে জাহাজে থাকিয়া বিলাতে গমন করেন, সেই ম্লেচ্ছভূমিতে দীর্ঘকাল বাস করিয়া আবার সেইরূপে দেশে প্রত্যাবৃত্ত হন, তাঁহারা কিরূপে জাতিরক্ষা করেন ও হিন্দুসমাজভুক্ত হইবার অধিকারী হন, তাহা বুঝিতে হইলে আধুনিক অধ্যাপকদিগের ন্যায় বিশ্বাস ও পবিত্রতাবুদ্ধির স্থিতিস্থাপকতা চাই।

রেলে হিন্দুযাত্রিগণের আর এক প্রকার সর্ব্বনাশ হয়! একাদিক্রমে তিন চারি দিন অবিশ্রান্ত গাড়ি চলিতে চলিতে চারি পাঁচ শত কি সহস্র মাইল পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইতেছে; কিন্তু এই সুদীর্ঘপথে হিন্দুযাত্রিগণের গাড়িতে মলমূত্র ত্যাগের কোন ব্যবস্থাই নাই, এ ব্যবস্থা কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে আছে। তথায় রাজ-

পুরুষদিগের স্বজাতীয়েরা সে সুখভোগ করেন। হিন্দু-যাত্রিগণ মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে বেগ রোধ করিয়া পথ পর্য্যটন করে। যখন বেগ ধারণে নিতান্ত অসমর্থ হয়, তখন পথিমধ্যে কোন ষ্টেসন বা আড্ডায় গাড়ি হইতে নামিয়া পড়ে। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য ব্যবস্থার কোন অপ্রতুল নাই। ষ্টেসনে সংলগ্ন দুই দিকে, এক দিকে ইউরোপীয় ও অপর দিকে দেশীয়যাত্রিগণের জন্য অতি উৎকৃষ্ট আপঙ্কর নির্ম্মিত আছে এবং তাহার মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষগণের পৃথক্ পৃথক্ আপঙ্করের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং কোন্‌টি স্ত্রীলোক ও কোন্‌টি পুরুষদিগের জন্য তাহা বড় বড় অক্ষরে সুস্পষ্টরূপে প্রতি আপঙ্করের সম্মুখভাগে লিখিত আছে।

এক একটি ষ্টেসনে রেলওয়ে সাহেবদিগের কৌতুকাবহ বঙ্গানুবাদ দেখা যায়। যে আপঙ্করের সম্মুখভাগে For men লিখিত আছে, তাহার নীচে লিখিত আছে, 'মনুষ্য দিগের জন্য।' কোন স্ত্রীলোক এমন বিচার করিলেও করিতে পারেন যে, অপর আপঙ্কর নিকৃষ্টজীবদিগের জন্য, যাহাতে মনুষ্যদিগের জন্য লিখিত আছে, তাহাই মনুষ্যের জন্য। আমি মনুষ্যজাতির অন্তর্গত, অতএব আমার গন্তব্য এই আপঙ্কর। ফলতঃ Men শব্দের অর্থ "মনুষ্য" তাই রেলের সাহেবেরা "For men" যেখানে আছে, সেখানে বাঙ্গালায় "মনুষ্যদিগের জন্য" লিখাইয়াছেন, ইহার প্রসঙ্গাধীন বিশুদ্ধ অনুবাদ "পুরুষদিগের জন্য" এবং ঐই বিশুদ্ধ

অনুবাদই এখন প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, হিন্দুর মল ত্যাগ ছাগাশ্বগবাদির ন্যায় নহে যে মল নির্গত হইলেই নিষ্কৃতি হইল। তাহাদিগের জলশৌচ-মৃত্তিকাশৌচ উভয়বিধ শৌচের দ্বারা মলদ্বার ক্ষালন ও হস্ত পদাদি ধাবন করিতে হয়। এ সমস্ত ক্রিয়া সময় সাপেক্ষ এবং রেলের গাড়ি প্রতি ষ্টেসনে পাঁচ, দশ, পনর মিনিটের ঊর্দ্ধ থাকেনা; সুতরাং এমন ঘটনা মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে যে, কোন কুলবধূ মলমূত্র ত্যাগের জন্য গাড়ি হইতে অবরোহণ করিয়াছে, তাহার কার্য্য সাধন না হইতে হইতে গাড়ি চলিয়া গেল; সে একাকিনী, অসহায়া মাঠের মধ্যে পড়িয়া রহিল; অথবা, তাহার পতি কি অন্য কোন অভি-ভাবক যাহার সঙ্গে সে রেলের গাড়িতে আসিতেছিল, সে ঐরূপ গাড়ি হইতে নামিয়াছে, এবং তাহার কার্য্য সাধন না হইতে হইতে গাড়ি চলিয়া গেল; তাহার সহায় মাঠে পড়িয়া রহিল, সে কুলবধূ অজ্ঞাতকুলশীল উদাসীন ব্যক্তি-দিগের সঙ্গে সন্তান সন্ততি দ্রব্য সামগ্রী লইয়া কোন্ দেশে চলিয়া গেল। এ সর্ব্বনাশ হিন্দুর পক্ষে বড় সহজ নহে! ইহাতে জাতি, মান, কুল, সমস্তই নষ্ট হইবার কথা। তাড়িতবার্ত্তাবহ ও ভদ্রলোকের সাহায্যে কোন কোন স্থলে এই ঘোর বিপদ হইতে লোক উদ্ধার হইয়াছে,—আর কোন কোন স্থলে কুলবধূ দুরাত্মাদিগের হাতে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে এবং পরিশেষে সন্তান সন্ততি সতীত্ব ও প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইয়াছে! এই ত দেশদেশান্তরে গমনা-

গমনের সৌকর্য্য!! এই ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকৃত মহান্ উপকার!!!

বাষ্পীয়শকট ও বাষ্পীয়পোত হইতে যে বিপুল অর্থাগম হয়, রাজা যদি তাহার সূক্ষ্মতম ভগ্নাংশ ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত না হন, অথবা তৃতীয় ও মধ্য শ্রেণীর যাত্রিগণের টিকিটের মূল্য যদি তিল প্রমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেন, তাহা হইলে উক্ত দুই শ্রেণীর গাড়ির সহিত অনায়াসেই এক একখানা আপঙ্করগাড়ি সংলগ্ন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং বাষ্পীয়পোতে হিন্দুযাত্রিদিগের জন্য এমন আসনের ব্যবস্থা হইতে পারে, যাহার সহিত বিজাতীয়দিগের আসনের কোন সংস্রব না থাকে; ফলতঃ এইরূপ না করিলে, এই সকল যানের সৃষ্টি করা পণ্ডশ্রম মাত্র। যাহা করিতে হইল, তাহা যদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইল, তবে সে করা না করা সমান কথা। আমাদিগের রাজপুরুষেরা এ কথা বিশিষ্টরূপ অবগত আছেন, তবে এ দেশীয় লোকেরা বিজিত, এই জন্য তাহাদিগকে তাঁহারা অবজ্ঞা করেন। এই অবজ্ঞাবুদ্ধির পরিহার করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহারা এ দেশীয়দিগের সম্বন্ধে যে কোন কার্য্য করেন, অশ্রদ্ধার সহিত করেন, সুতরাং সে কার্য্য নিন্দনীয় হইয়া পড়ে।

সে যাহা হউক লেখকের পুত্রবধূ উপর্য্যুপরি তিন দিন বেগরোধ করিয়া ও অনাহারে থাকিয়া স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ নিবন্ধন তাহার অপরিহার্য্য ভোগ শেষে ভুগিতে লাগিলেন। তখন লেখক মনে মনে করিতে লাগিলেন, যদি

কোন আঢ্যব্যক্তি কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করিয়া অস্মদ্দেশীয় ব্রাহ্মণেতরবর্ণের কতিপয় যুবককে নাবিক বিদ্যার শিক্ষা দেন, তাহা হইলে তাহারা জাহাজ পরিচালিত করিতে পারে এবং হিন্দুদিগের ব্রাহ্মণ, সজ্জন, স্ত্রী পুরুষ সকল শ্রেণীর ও সকল অবস্থার লোকে ম্লেচ্ছ সংস্রব রহিত জাহাজে অনায়াসে ভ্রমণ করিতে পারে। তাহাদিগের মৈত্রকার্য্য পূজা আহ্নিক আহারাদির কোন বিষয়ের ব্যাঘাত ঘটে না এবং ক্রমে ক্রমে জাহাজ পরিচালনা কার্য্যে নৈপুণ্যলাভ করিয়া বাণিজ্যার্থে দেশ দেশান্তরে গমন করিতে পারিবে এবং দেশের অশেষ প্রকারে উন্নতি সাধিত হইতে পারিবে। লেখক যখন এই সমস্ত কথা মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে কলিকাতা হইতে এক ইংরাজিসমাচারপত্র আসিয়া তাঁহার হাতে পড়িল; তাহাতে প্রথমেই পড়িলেন, যে এলাহাবাদে উচ্চ-ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব কৃতবিদ্য আঢ্যযুবকদ্বয় চর্ম্মকারের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। কি সর্ব্বনাশ! কি অধঃপাত! বিদ্যা বুদ্ধির কি অপনিয়োগ! কি সর্ব্বনাশ! ব্রাহ্মণ হইতে একেবারে চামার! পাশ্চাত্য সাহিত্যালঙ্কার ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের জ্ঞান চর্ম্মকারের কার্য্যে বিনিয়োগ! আঢ্যলোকের সন্তান, না জানি কত অর্থই এই জঘন্য নিকৃষ্ট কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন। যুবকযুগল! বর্ষপরম্পরা পরিশ্রম, রাত্রি-জাগরণ করিয়া, পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া রাশীকৃত অর্থ ব্যয় করিয়া যে বিদ্যা অর্জন করিলে, এই কি তাহার পরিণাম?

সে বিদ্যা ত্যাগ করিয়া অতি গৌরবের চর্ম্মকার বিদ্যা অর্জন করিতে গেলে! আহা! যে অর্থটা এই অধম কার্য্যে নিয়োগ করিলে, সেইটিতে যদি একটি নাবিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে, কত উপকার হইত। এ কার্য্যে কি নূতন শিক্ষা করিবে? কি বিপুল অর্থাগম হইবে যে একেবারে আভিজাত্য, জ্ঞান, বিদ্যায় জলাঞ্জলি দিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইলে? "কুসংস্কারপন্ন, আচারানুষ্ঠানের দাস স্থবির! আমাদিগের মহদুদ্দেশ্য তুমি কি বুঝিবে? অকিঞ্চিৎকর অর্থলাভের জন্য আমরা এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। ইংরাজ বাহাদুরেরা নানা প্রকার যন্ত্র ও কলের সৃষ্টি করিয়া বস্ত্র প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য স্বল্পব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া স্বল্প মূল্যে এদেশীয়দিগকে দিতেছেন, সুতরাং এতদ্দেশী-য়েরা তত্তদ্দ্রব্য বহু পরিশ্রমে বহু ব্যয়ে হস্ত দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করেন বলিয়া, তাহাদিগের নিকটে কেহ ক্রয় না করিয়া বিলাতীযন্ত্রজাত দ্রব্য সুলভ বলিয়া তাহাই ক্রয় করেন; এই প্রযুক্ত এদেশের কারুক্রিয়া ও শিল্পকর্ম্মের লোপ হইয়া গিয়া স্থানীয় ব্যবসায় বন্ধ হই-য়াছে এবং যাহারা উক্ত শিল্প ও কারুকার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত, তাহাদিগের জীবনোপায় বন্ধ হইয়াছে। নূতন ব্যবসায় উদ্ভাবন করিতে হইবে, ব্যবসায়ের নূতন পথ খুলিতে হইবে, তবে দেশের দুর্দ্দশার শান্তি হইবে।" যুবক যুগল! নাবিকবিদ্যালয়ে কি উক্ত উদ্দেশ্য সাধিত হইত না? কি অন্য কোন ব্যবসায়ের পথ খুলিলে হইত

না? "স্থবির! ব্যবসায়ের পথ খুলিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে আমাদিগের নিজের উন্নতির পথ ও খুলিতে হইবে। কি অধঃপাত! ব্রাহ্মণ হইতে চামার বলিয়া তুমি যেমন চমকিয়া উঠিলে, সকলকে ঐরূপ চমকিত করাও আমাদিগের উদ্দেশ্য। শাস্ত্রের ও পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষদিগের মস্তকে পদার্পণ করিয়া, সমাজকে তৃণজ্ঞান করিয়া কেমন নির্ভীকচিত্তে আমরা চর্ম্মকারের ব্যবসায় অবলম্বন করিলাম! জগৎ আমাদিগের বীরত্ব দেখুক, কেমন অবলীলাক্রমে কুসংস্কারের দুর্ভেদ্য নিগড় ভেদ করিয়া ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিলাম। স্থবির হাস্য করিতেছে, আমাদিগকে মূর্খ ও বাতুল জ্ঞান করিতেছে; কিন্তু তোমার সময় যদি না ঘনাইয়া থাকে, যদি আর কিছু দিন বাঁচ, দেখিতে পাইবে আমরা কেহ হয়ত সি, আই, ই, কেহ বা সি, এস্, আইয়ের উচ্চ পদবীতে অভিষিক্ত হইব, সমাজের শীর্য স্থানে অধিরূঢ় হইব। তোমরাইত সর্ব্বদা উপদেশ দাও, "বড় হ'বি ত ছোট হ'" আমরা এই নীচ কার্য্যে রুচি করিয়াছি, পারিণামে অতি উচ্চতম পদে আরোহণ করিব বলিয়া।"

মুখশুদ্ধি অথবা তাম্বুলচর্ব্বণ।—আহারান্তে হিন্দু পান খাইয়া থাকেন। উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিবার পর ভুক্তদ্রব্যের রস ও ঘ্রাণ আর ভাল লাগেনা। ভাললাগার কথা দূরে থাকুক, সে রস আঘ্রাণে বমন হইবার উপক্রম হয়। আহারের সময় খাদ্য দ্রব্য চর্ব্বণ ও মুখের

ভিতর আলোড়ন করিতে করিতে খাদ্যদ্রব্যের রস জিহ্বা তাল্বাদিতে এত ব্রক্ষিত হয়, যে আচমন ও মুখপ্রক্ষালনাদি দ্বারা তাহা সম্যকৃরূপে অপসারিত হয় না। এই জন্য হিন্দু আহারান্তে তাম্বুল চর্ব্বণ দ্বারা মুখশুদ্ধি করেন। পান পত্র, গুবাকু, খদির ও চূর্ণ সংযোগে এই তাম্বুল প্রস্তুত হয়। পানের রস অগ্নিউদ্দীপক, চূর্ণ অম্লনাশক, খদির উদরাময়ের পক্ষে উপকারী; ইহার ধারকশক্তি আছে এবং ইহা দ্বারা দন্তমূল শক্ত হয়। গুবাকুরও এইরূপ শক্তি আছে। তাম্বুল পরিপাকশক্তির সহায়তা করে। ইহাতে এলাচি, লবঙ্গ, কর্পূর প্রভৃতি অন্যান্য অগ্নিউদ্দীপক, বায়ুনিঃসারক সুগন্ধি দ্রব্য দিয়া সুখসেব্য করিয়া লওয়া হয়। পান খাওয়ার রীতিটি অতি সুন্দর; কিন্তু বিজাতীয়েরা অজ্ঞতাপ্রযুক্ত ইহাকে রোমন্থন বা "জাবরকাটা" বলিয়া উপহাস করেন।

তাম্বুল চর্ব্বণের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে ধূমপান করেন, অর্থাৎ তামাক খান। তামাক, তাম্রকূট বা দোখ্‌তা পত্র কুটিয়া গুড় ও নানা জাতীয় মসলা অর্থাৎ সুগন্ধি দ্রব্য সংযোগে অতি সুন্দররূপে পেষণ করিয়া একপ্রকার মিশ্রণ প্রস্তুত হয়। এই মিশ্রণ পাত্রবিশেষে অর্থাৎ কলিকায় চূর্ণ করিয়া দিয়া তদুপরি অগ্নি দিয়া যে ধূম উত্থিত হয়, সেই ধূম নলবিশেষ বা হুঁকা দ্বারা শোষণ করিলে একপ্রকার ঈষৎ মাদকগুণবিশিষ্ট সুগন্ধি মস্তিষ্করঞ্জক ধূম মুখমধ্যে আইসে, তাহা পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিয়া ফুৎকার দ্বারা বাহির করিয়া দেওয়া হয়, ইহাকে তামাক খাওয়া বা ধূমপান বলে। ইহা

একপ্রকার বিলাস মাত্র। সুগন্ধ ও ঈষৎ মধুর মাদকতায় ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ও মস্তিষ্কের তৃপ্তি হয় এবং স্নায়ুতন্ত্রের শান্তি হয়। নিদ্রাভঙ্গের পর, আহারাদির পর, পান খাইবার সময়, বহির্দ্দেশ হইতে শ্রান্ত হইয়া গৃহাগত হইলে, শ্রমসাধ্য কোন কার্য্য করিতে করিতে বা কার্য্যসমাধার পর হিন্দু তামাক খান। পুরাকালে অভ্যাগত ব্যক্তিকে মধুপর্ক দিয়া সমাদর করা হইত, ইদানীং তামাক সাজিয়া দিয়া সমাদর করা হয়। তামাকের ঈষৎ মাদকশক্তি আছে বলিয়া হয়ত ইহাতে পরিশ্রমের লাঘব বা শান্তি হয়, এই জন্য দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রমজীবিগণ কঠোরশ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে করিতে বারংবার তামাক খাইয়া থাকে। তামাক খাইলে তাহারা গতক্লম হয় ও শান্তিলাভ করে এবং উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে প্রস্তুত হয়। কেহ কেহ বলেন তামাক "Malaria" অর্থাৎ দূষিতরোগোৎপাদক বায়ুর প্রতি-হর্ত্তা; অর্থাৎ যাহারা তামাক কোন আকারে সেবন করে, ম্যালেরিয়া বা দূষিতবায়ুর প্রভাব তাহাদিগের কাছে হীনবীর্য্য ও নিস্তেজ হইয়া যায়। পৃথিবীর প্রায় সকল প্রদেশে তামাকের ব্যবহার আছে; কোন না কোন আকারে তামাক প্রায় সকল জাতিই সেবন করিয়া থাকে। কিন্তু নস্য, চুরুট, পাইপ্ কি হুক্কা, যত প্রকারে তামাক ব্যবহার হয়, সকল অপেক্ষা হুক্কায় তামাক খাওয়াই অতি উৎকৃষ্ট ও উন্নত প্রণালী। তামাক অতি উগ্রবীর্য্য, ইহা এক প্রকার বিষ! তামাক হইতে তৈল প্রস্তুত হইলে তাহার এক

বিন্দু যদি একটা বিড়ালকে খাওয়ান যায়, তাহা হইলে বিড়াল তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। হুঁকায় তামাক খাইলে মুখের বা শরীরের কোন অংশের সহিত তামাকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সংশ্রব ঘটে না। ধূমাকর্ষণ দ্বারা ফুস্‌ফুসে আঘাত হইতে পারে বটে; কিন্তু হুঁকার খোলে অর্থাৎ ধূমবাহী নল বা নলীচার নীচে যে একটি নারিকেলের খোল আছে, সেই খোলে জল থাকে এবং তামাকের ধূম সেই জল মধ্য দিয়া মুখে আইসে; ইহাতে সেই ধূমের রুক্ষতা বা উগ্রতা অনেক প্রশমিত হয় এবং সেই ধূমোপঘাতে ফুস্‌ফুসের কোন বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু চুরুট খাওয়ায় পুনঃ পুনঃ ষ্ঠীবনে অনেক লালাক্ষয় হয় এবং সেই হেতু অগ্নিমান্দ্যাদিরূপ যে অনিষ্ট হয়, হুঁকার তামাকে সে অনিষ্ট হয় না। তথাপি হিন্দুরা হুঁকায় ধূমপান করেন বলিয়া সাহেবেরা কখন কখন উপহাস করেন এবং ইহা অসভ্য ব্যবহার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই জন্য নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে হুঁকায় তামাক খাওয়া অভ্যাস করেন না। এ অভ্যাস না হইলেই ভাল, কেননা ধূমপান একটা ব্যসন মাত্র; কিন্তু নব্যেরা তৎপরিবর্ত্তে যদি চুরুট খাওয়া অভ্যাস করেন, সে অতি লজ্জাকর উপহাসাস্পদ ব্যবহার! তামাক খাওয়াটা ব্যসন বলিয়া অনেকে গুরুজন সমক্ষে তামাক খান না। হিন্দুর মাদকদ্রব্য সেবনের মধ্যে কেবল এই এক তামাক খাওয়া আছে। নীচলোকের মধ্যে ও সন্ন্যাসী, ফকির যাহারা অনাবৃত

স্থানে বৃক্ষমূলাদিতে বৃষ্টির জলে ও শিশিরে ভিজিয়া দিবা রাত্রি পড়িয়া থাকে, তাহারা গাঁজার ধূম পান করে, ইহাতে শীত তাপের ক্লেশ অনেক উপশম হয়; কিন্তু ইহার মাদক শক্তি অতি উগ্র। যে ব্যক্তি গাঁজা খায়, সে বিলক্ষণ মত্ত হয় এবং মদ্যপায়ীরা মত্ত হইয়া যেরূপ উৎপাত ও উপদ্রব করে, গাঁজাখোরেরাও অনেক সময়ে সেইরূপ করিয়া থাকে। ভদ্রসমাজে গাঁজার ধূমপান অতি নিন্দনীয় ও অতি বিরল।

ইদানীং ইংরাজরাজতন্ত্রের কল্যাণে অনেক প্রকার মাদকদ্রব্যসেবীর উদয় হইয়াছে, তন্মধ্যে মদ্যপায়ীর ভাগই অধিক এবং উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ইহা পান করে বলিয়া মদ্য দ্বারা যে অনর্থ ঘটে, তাহা অতি গুরুতর ও তাহা সর্ব্ব-সাধারণের গোচর হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষে মদ্যপানের বহুল বিস্তার ইংরাজরাজতন্ত্রের সময়েই হইয়াছে। এইটি ইংরাজরাজতন্ত্রের চিরকলঙ্ক। পূর্ব্বে কদাচ কেহ গোপনে মদ্যাকারে মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সেবন করিত বা অন্যকে খাওয়াইত বা বিক্রয় করিত এবং প্রকাশ হইলে সমাজ কর্ত্তৃক তাহার ও তাহার কৃত গরল-সেবীর দণ্ড হইত। ইংরাজরাজতন্ত্রের সময় হইতে রাজাজ্ঞা দ্বারা এই মদ প্রস্তুত ও বিক্রয় হইতে লাগিল। রাজপুরুষদিগের এই যুক্তি, যে মাদক দ্রব্য সেবন মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যাহার এই প্রবৃত্তি হয়, সে যেখান হইতে হউক, যেরূপে হউক, তাহার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া

আপনার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবে। এইরূপে মদ্যের সংগ্রহ অনিবার্য্য; নানা স্থানে গোপনে মদ্য প্রস্তুত ও বিক্রীত হইতে থাকিবে। প্রকাশ হইলে একবার দণ্ড হইবে, দণ্ডের পর এই জুগুপ্সিত আচরণ বন্ধ হইবে, আবার কিছু দিন পরেই ঐরূপ গোপনে অকার্য্য হইতে থাকিবে এবং ইহার প্রবাহ মধ্যে মধ্যে এক একবার ক্ষণিক বিরামের পর ক্রমাগত চলিতে থাকিবে। ইহা অপেক্ষা প্রকাশ্য-ভাবে প্রস্তুত ও বিক্রয় করণের অনুমতি দিয়া যদি একটি কর নির্দ্ধারণ করা হয়, তাহা হইলে কর প্রদানের ভয়ে ইচ্ছা করিলেই প্রস্তুত করিতে পরিবে না। করের আকারে যে টাকাটি রাজকোষে দিতে হইবে, সেটি মূল্য বৃদ্ধি করিয়া ক্রেতার নিকট বিক্রেতা আদায় করিবে, তাহা হইলে ক্রেতা ও সহজে ক্রয় করিতে পারিবে না। এইরূপে মদ্য প্রস্তুত ও মদ্য সেবন উভয়ের যুগপৎ দমন হইবে এবং আনুসঙ্গিক রাজকোষের আয় বৃদ্ধি হইবে। রাজকোষের আয় বৃদ্ধি করাই রাজপুরুষগণের লক্ষ্য। বর্ষে বর্ষে মদের দোকানের বন্দোবস্ত হয় অর্থাৎ মদ্য বিক্রয়ের নূতন অনুজ্ঞাপত্র দেওয়া হয়। যে সমস্ত রাজকর্ম্মচারী এই অবসরে আইন বাঁচাইয়া দোকানের সংখ্যা ও রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে পারেন, তাঁহারা প্রশংসাভাজন হন এবং যাঁহাদিগের বন্দোবস্তে দোকানের সংখ্যা ও রাজস্ব কমিয়া যায়, তাঁহারা অনুযোজ্য ও হতগৌরব হন।

অতএব গোপনে মদ্য প্রস্তুত করণ ও সেবন এই দুই

দুষ্ক্রিয়া নিবারণের ব্যপদেশে রাজপুরুষেরা রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার জন্য এই গরল অবাধে বিক্রয় করাইয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছেন! আহা! মদে যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে রাজপুরুষেরা যদি একবার অপাঙ্গে তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহারা এই নৃশংস ব্যাপার হইতে নিরস্ত হন। আমাদিগের চক্ষুর উপর এই পাইকপাড়ার এতটা বিষয়, দুই পুরুষ যাইতে না যাইতে কোথায় উড়িয়া গেল! আচ্ছা, এই বিষয়াধিপতিরা দুই পুরুষে কত মদ খাইয়াছিলেন, আর সেই মদের উপর কতই বা রাজস্ব আদায় হইয়া রাজকোষে প্রবেশ করিয়াছে? কত টাকার বিষয়টা এই সামান্য রাজস্ব আদায়ের জন্য নষ্ট হইল। সামান্য দশ কুড়ি হাজার বা লাখ দু'লাখ টাকার জন্য কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি কি কেহ সজ্ঞানে নষ্ট করিতে পারে? এই পাইকপাড়ার বিষয়ের মত কত বিষয় গিয়াছে ও যাইতেছে! শুধু কি বিষয় নষ্ট হইতেছে, বিষয়াধিপগণ গুণবান্ রূপবান্ বলবিক্রমশালী এক একটা দিক্‌পাল বিশেষ, আহা! তাহারাও অকালে কালের করালকবলে পতিত হইতেছে! কোথা হইতে মদ্যের আকারে এই ঘোর ভয়ঙ্করী রাক্ষসী ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতের পবিত্র, মিতাচারী, নিরীহ, সাধুসন্তানগণকে বিনষ্ট করিতেছে, কবে এই রাক্ষসীর হাত হইতে ভারত পরিত্রাণ পাইবে!

বালকদিগের পাঠ্য মনোরঞ্জন ইতিহাসে স্বর্ণভিম্ব

প্রসবকারিণী এক হংসীর কথা আছে। সে প্রতিদিন যুগল স্বর্ণডিম্ব প্রসব করিত। যাহার হংসী সে এক দিন মনে করিল, দিন দিন দু'টি করিয়া ডিম্ব পাওয়া অপেক্ষা হংসীর গর্ভে যত ডিম্ব আছে, সমস্ত এককালে বাহির করিয়া লই। এই সঙ্কল্প কয়িয়া এক দিবস সেই স্বর্ণলোলুপব্যক্তি হংসীর গর্ভে ছুরি মারিল। গর্ভে ডিম্বরাশি সঞ্চিত ছিল না, প্রত্যহ কোন শক্তি প্রভাবে তথায় দুইটি করিয়া ডিম্ব জন্মিত। ছুরি মারাতে দুইটি মাত্র ডিম্ব বাহির হইল, আর হংসী মরিয়া গেল। মদ খাওয়াইয়া রাজস্ব আদায় করা কি স্বর্ণডিম্বপ্রসবকারিণী হংসীর গর্ভে ছুরি দেওয়ার ন্যায় নহে? এখানে শুনা যাইতেছে যে, অমুক কালেজে লেখা পড়া শিখিয়া সোণার মেডাল, কত পুস্তক ও ছাত্রবৃত্তির আকারে কত পারিতোষিক ও প্রশংসা পত্র পাইয়াছে ও কৃতবিদ্য হইয়াছে এবং কালেজের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহার প্রতি নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন, যে তাহাকে উচ্চতম রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়। পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র ও স্বামীর চারিদিকে গুণকীর্ত্তিত হইতেছে শুনিয়া অপার আনন্দে মগ্ন হইতেছেন ও কত আশা করিতেছেন যে এই যুবক হইতে তাঁহাদের সুখ সমৃদ্ধির ইয়ত্তা থাকিবে না।

এমন সময়ে যুবক রাক্ষসীর হস্তে পড়িলেন। ক্রমে তাঁহার বিনয় ও মৃদুতা তিরোহিত হইতে লাগিল, তৎপরিবর্ত্তে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। যিনি পিতা

মাতার সহিত বিনয়নম্রমুখে সম্ভাষণ করিতেন, এখন অসঙ্কুচিতচিত্তে তাঁহাদিগকে পরুষ ও অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। হৃদয়ের পুত্তলী পত্নী যাহার চিত্ত তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে উদ্বেল হইত ও অপার সুখসাগরে মগ্ন হইত, এখন সে প্রহার ও কটূক্তির ভয়ে তাহাকে দেখিয়া ত্রাসযুক্ত হইতে লাগিল। অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে তাহার যকৃৎ পাকিয়া উঠিল এবং সাংঘাতিক শস্ত্রচিকিৎসায় তাঁহার প্রাণাত্যয় হইল। পিতা মাতা ও পত্নীর সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল, তাঁহাদিগের সুখের সংসার বিষাদে পরিপূর্ণ হইল।

স্থানান্তর হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, যে অমুক ব্রাহ্মণের পুত্রটি কালেজে পড়া শুনা করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছিল। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আহ্বান করিয়া তাঁহাকে এক অতি উচ্চতম রাজকর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক, অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ও যারপরনাই পবিত্র ও অতি শ্রদ্ধাস্পদ এবং মান্য। তাঁহার পুত্রটি কৃতবিদ্য ও কৃতকর্ম্মা হইয়াছে শুনিয়া, অমুক স্থানের ব্রাহ্মণ-জমীদার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, তাঁহার একমাত্র কন্যাকে সেই পাত্রে সমর্পণ করিলেন। একমাত্র কন্যা পিতা মাতার অতি আদরের মেয়ে, রূপে গুণে পাত্রাপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে; ফল কথা, যেমন ছেলে, তেমনি মেয়ে, এমন যোজনা প্রায় হয় না। অধ্যাপক ও জমীদার উভয়েই পরম

সুখী হইয়াছিলেন। অধ্যাপক, পুত্রের কল্যাণে এমন বড়মানুষ দেশমান্য কুটুম্ব পাইলেন। পুত্রবধূর তত্ত্ব লইতে সর্ব্বদা তাঁহার পিত্রালয় হইতে অনেক লোক জন নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী লইয়া তাঁহার আলয়ে আসিত, অধ্যাপকপত্নী কুটুম্ব প্রেরিত দ্রব্যজাত গৃহে রাখিতে ও প্রতিবেশিগণকে তাহা বিতরণ করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত। তাঁহার আর কোন দ্রব্যের অভাব অপ্রতুল রহিল না এবং প্রতিবেশি-গণকে দান বিতরণ করিয়া ও তাঁহাদের সহিত এই-রূপে সৌজন্য করিয়া পরম সুখী হইতে লাগিলেন। এ দিকে পুত্রের স্বোপার্জ্জিত অর্থ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত না হইতে হইতে, বৈবাহিক নিজ কন্যার স্বচ্ছন্দের জন্য স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া অকাতরে ব্রাহ্মণের তৃণাচ্ছাদিত গৃহের পরিবর্ত্তে উৎকৃষ্ট ইষ্টকালয় প্রস্তুত করাইলেন। জামাতা গৃহে আসিলে, জমীদার বড়ই সুখী হইতেন। আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলের নিকট রূপবান গুণবান পদস্থ জামাতাকে পরিচিত করিয়া দিয়া সুখী হইতেন।

জামাতা পদস্থ বলিয়া জমীদারের সমকক্ষ জমীদারগণ যাঁহারা পূর্ব্বে তাঁহার উপর নানা অত্যাচার করিতেন, এখন তাঁহাকে ভয় করিতে লাগিলেন ও তাঁহাদিগের অত্যাচার সকল নিবৃত্তি হইল। ফলতঃ এই বিবাহে দুইটি সংসার পরম সুখী হইল; কিন্তু যে সমাজে মদ্যপান প্রবেশ করিয়াছে, তাহার কল্যাণ কতক্ষণ? এই যে দুই সুখের আলয় অধ্যাপক ও জমীদারের বাটী, অচিরকাল মধ্যে দুঃখের আলয় হইল।

সুখের অঙ্কে যবনিকাপতন হইল, সুখ অস্তমিত হইল, দুঃখ কষ্ট মনস্তাপ ক্রমশঃ নানা আকারে দর্শন দিতে লাগিল। অধ্যাপক পুত্রের সাহেব সুবা প্রভৃতি নানা-জাতীয় লোকের সংসর্গে পানদোষ ঘটিল। পানের সঙ্গে সঙ্গে অখাদ্য ভোজনও ঘটিল। এই সমস্ত অনু-ষ্ঠান প্রথমে গোপনে চলিত; কিন্তু অধ্যাপকপুত্র পদস্থ-ব্যক্তি, অপেয় পান ও অখাদ্য ভোজনের সঙ্গিগণ তাঁহার আলয়ে আসিয়া সেই সমস্ত পান ভোজন করিতে আরম্ভ করিল। অধ্যাপক যিনি অজ্ঞাতে পথিমধ্যে মাতাল কি মদের বোতল স্পর্শ করিলে স্নান করেন, যিনি অখাদ্যের ঘ্রাণে অস্থির হইয়া পড়েন, সেই অধ্যাপকের নিজ বাটীতে অপেয় ও অখাদ্য আনীত, পীত ও খাদিত হইতে লাগিল। বালক বালিকা দাস দাসীর সংস্রবে তাঁহার ব্যবহার্য্য বস্ত্র, আসন, শয্যা ও তৈজস সমস্ত দ্রব্যে স্পর্শদোষ ঘটিতে লাগিল। তিনি একেবারে মৃতকল্প হইলেন, তাঁহার আহারে প্রবৃত্তি হয় না, সন্ধ্যোপাসনাদিতে তৃপ্তি হয় না, তিনি কোথাও যান না, কাহারও সহিত আলাপ করেন না। সহধর্ম্মিনীকে ও পরের কন্যা পুত্রবধূকে মাতালের হাতে দিয়া গৃহ ত্যাগ করিতে পারেন না। দিন দিন মলিন ও বিশীর্ণ হইতে লাগিলেন। অনাহারে ও নিরন্তর অন্ত-র্গ্লানিতে ক্রমে উৎকট রোগগ্রস্ত হইলেন। পুত্র নিকটে আসিয়া একবার জিজ্ঞাসাও করেন না। ইংরাজ ডাক্তার চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তিনি দুইবেলা

আসিয়া দেখিয়া ঔষধ দিয়া যান। অধ্যাপক সে ঔষধ স্পর্শও করেন না। বিজাতীয় অবসাদ ও আবল্য উপস্থিত হইল; অধ্যাপক আর বাঁচেন না। পরে অচৈতন্য অবস্থায় তাঁহাকে মুহুর্মুহুঃ ব্রাণ্ডি ও ব্রথ খাওয়াইয়া তাঁহার পরকাল খাইয়া তাঁহাকে যমসদনে প্রেরণ করা হইল। তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি সমৃদ্ধি সহকারে সম্পাদিত হইল। তাঁহার পিতৃহা-পুত্র এখন নিষ্কণ্টকে আপন অসদ্বৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। এখন অধ্যাপক পুত্রের বৈঠকখানায় লোক ধরে না। অশ্লীল গান হাস্য কৌতুকের শব্দে প্রতিবেশি-গণের রাত্রিতে নিদ্রার বড়ই ব্যাঘাত হইতে লাগিল। অধ্যাপকের পুত্রবধূ অতি মান্যা স্ত্রী, অতি উচ্চ সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণের কন্যা। পতি ও তাঁহার সহচরগণের অশ্লীল গান, উচ্চহাস্য ও কৌতুকাদিতে বড়ই লজ্জিত ও ব্যথিত হইতেন। স্পষ্টাভিধানে অসন্তোষ প্রকাশ করিলে পতি তাঁহাকে প্রহার করিতেন। এক দিবস মদের ঝোঁকে সহচর-গণকে পত্নীর রূপলাবণ্য দেখাইবার জন্য, পত্নীকে বৈঠক-খানায় আনিতে আদেশ অরিলেন। ভৃত্যগণ ইতস্ততঃ করিয়া বিলম্ব করিতে লাগিল। অনন্তর কোপাবিষ্ট হইয়া তাহা-দিগকে প্রহার করিয়া স্বয়ং অন্তঃপুরে গিয়া পত্নীকে বল-পূর্ব্বক টানিয়া বৈঠকখানায় আনিলেন। লজ্জানম্রমুখে বধূটি তথায় আসিয়া বসিলেন। সহচরেরা রূপলাবণ্য ও পতিব্রতার প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত ও অবাক হইয়া রহিলেন। অনন্তর বধূটিকে ঘর্ম্মাক্তকলেবর ও অতি ক্লিষ্ট

দেখিয়া সকলে একবাক্যে তাঁহাকে অন্তঃপুরে প্রেরণার্থ বাবুকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। জমীদারসুতা শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহদ্বার রোধ করিয়া সেই রাত্রিতেই উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলেন। অধ্যাপকপুত্র কলত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইলেন। কার্য্যালয় হইতে বহুদিন অনুপস্থিত রহিলেন। একে অতিরিক্ত পানপ্রভাবে ইদানীং কার্য্যে শিথিলতা হইয়াছিল, তাহাতে উপর্য্যুপরি অনেক দিন কার্য্যালয়ে অনুপস্থিত, হওয়াতে এবং তাঁহার পানাশক্তির বার্ত্তা কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের গোচর হওয়াতে তিনি পদচ্যুত হইলেন। অল্পদিন মাত্র উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়া, অর্থাগম না হইতে হইতে মদ্যপানের ব্যয় উপস্থিত হইল, সুতরাং অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে সঞ্চিত ধনক্ষয় হইয়া তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অবস্থায় পদচ্যুতি নিবন্ধন আয় বন্ধ হওয়াতে তাঁহার কষ্টের একশেষ হইল, এখন তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা অনাহারের কষ্ট সহ্য করিতে অসমর্থা হইয়া অনেক উপাসনা ও অনুরোধ উপরোধের পর, মহারাজা সার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের দাতব্য ভাণ্ডার হইতে মাসিক চারি টাকার এক বৃত্তি পাইয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া তিনি প্রাণধারণ করিতেছেন। এইরূপ ও ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ও হৃদয়বিদারক ঘটনা মদের প্রভাবে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ঘটিতেছে। আবার অভিভাবকদিগের সেই জুজু—ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউট্, সেই শ্রীমন্ত যুবকদিগকে মদ্যপায়ী

করিবার অপূর্ব্ব যন্ত্র, বর্ষে বর্ষে কত আঢ্যলোকের সন্তানকে মদ্যপায়ী করিয়া ছাড়িয়া দিতেছে। তাহারা প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া, নিজ অধিকারে প্রবেশ করিয়া অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে এবং অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে পিতৃপুরুষদিগের অচলালক্ষ্মীকে বিদূরিত করিয়া আপনি শ্রীভ্রষ্ট হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। ছেলেরা জুজু বলিলে যেরূপ ভীত হয়, উত্তরাধিকারিদিগের অভিভাবকেরা ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউটের নাম শুনিলেও তেমনি ভীত হন। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ অপ্রাপ্তবয়স্ক উত্তরাধিকারীকে ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউটে পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত। অভিভাবক জানেন, সেখানে একবার প্রবেশ করিলে ভ্রষ্টাচার ও মদ্যপায়ী হইয়া বাহির হইবে, সেই জন্য অভিভাব্যকে তথায় পাঠাইতে নানা আপত্তি করেন এবং অনেক উপরোধ অনুরোধও করান, অনুরোধ প্রবল হইলে কখন অব্যাহতি পান ; নচেৎ ছেলে-ধরার মত গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ বলপূর্ব্বক সুকুমারমতি বালককে মদ্যপায়ী করিবার যন্ত্রের মধ্যে পূরিয়া দেন। এই ইন্‌ষ্টিটিউটের ব্যবস্থা অতি সুন্দর, ইহার উদ্দেশ্য অতি উদার ; কিন্তু সদুদ্দেশে কোন ব্যবস্থা করিয়া, ঐ উদ্দেশ্য সাধনের যদি প্রকৃত উপায় অবলম্বন করা না হয়, তবে সে ব্যবস্থা কেবল লোকের চক্ষুতে ধূলি প্রদানের জন্য, ইহা ব্যতীত আর কি বোধ হয়? বহুধনের অধিকারী, অশিক্ষিত হইলে বড়ই অনর্থ ঘটে, এই জন্য অপ্রাপ্তবয়স্ক উত্তরাধিকারিগণের শিক্ষার ভার গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং গ্রহণ

করিয়া উক্ত ইন্‌ষ্টিটিউট্ সংস্থাপন করেন; কিন্তু তথায় কি প্রণালীতে শিক্ষাদান হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন না। এই রূপ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বপদে কৃতবিদ্য অথচ ধর্ম্মপরায়ণ পবিত্র বিজ্ঞলোককে নিযুক্ত করা উচিত; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী বিদ্যায় পারদর্শী হইলেই, এ পদের যোগ্য মনে করেন এবং যাহার সেই পারদর্শীতা আছে, তাহাকেই উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। অধিক ইংরাজী বিদ্যা হইলেই, এতদ্দেশীয়েরা প্রায় ভ্রষ্টাচার ও স্বধর্ম্মদ্বেষী হয়; এ দোষ ঘটিবেই ঘটিবে, ইহা একেবারে অপরিহার্য্য। সুতরাং সুকুমারমতি বালকেরা এরূপ লোকের শিক্ষায় ও দৃষ্টান্তে ভ্রষ্টাচার ও স্বধর্ম্মদ্বেষী হইবে না ত কি? প্রত্যক্ষেই হউক আর পরোক্ষেই হউক, ছলে বলে কলে কৌশলে হউক, অথবা যুক্তিপ্রদর্শন দ্বারা হউক, গবর্ণমেণ্ট বিবিধপ্রকারে মদ্যপানে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, এইটি বড় নিন্দার বিষয়! যে ব্রিটীশ সম্রাটের সমকক্ষ রাজা প্রায় এ ভূমণ্ডলে কুত্রাপি নাই, যাঁহার ঐশ্বর্য্য বল বীর্য্যের ইয়ত্তা নাই, সেই সম্রাট এত ক্ষুদ্রাশয়, যে সামান্য রাজস্বের লোভে তাঁহার অধীনস্থ এমন পুণ্যভূমিকে, এমন সোণার রাজ্যকে একেবারে ছারখার করিলেন। ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞগণের, ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের মহা কলঙ্ক! জন বুলের নামে আর স্পর্দ্ধা চলিবে না। যিনি উদগ্রীব হইয়া বীরদর্পে মেদিনী কাঁপাইয়া সর্ব্বত্র গমনাগমন করেন, এই কলঙ্কের জন্য পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যজাতির সমক্ষে তাঁহাকে মাথা হেঁট করিতে হইবে।

এই কথা লইয়া আমরা অনেকক্ষণ জল্পনা করিলাম; কিন্তু ইহা আমাদের প্রসঙ্গের অতিরিক্ত কথা, অতএব এই খানেই ইহার বিরাম হইল।

আহারান্তে পান তামাক খাইয়া হিন্দু কিঞ্চিৎক্ষণ বিশ্রাম করেন, কিন্তু নিদ্রা যান না। দিবানিদ্রা হিন্দুর নিষিদ্ধ। উভয় ধর্ম্ম শাস্ত্র ও বৈদ্যকে দিবানিদ্রার নিষেধ আছে। বৈদ্যকের কোন কোন স্থানে দিবানিদ্রার বিধান আছে; যথা—পীড়িত ব্যক্তির কিম্বা পূর্ব্বরাত্রিতে যাহার নিদ্রা হয় নাই, অথবা গ্রীষ্মকালে বৈদ্যকে দিবানিদ্রা বিহিত; কিন্তু গ্রীষ্মকালেও কোন কোন রোগীর পক্ষে দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ।

পূর্ব্বাহ্নকাল শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সেবায় অর্থাৎ শৌচাদি ক্রিয়া, স্নান, ভোজন এবং সন্ধ্যাবন্দনাদিতে অতিবাহিত হয়, এই জন্য আহারাদির পর বিশ্রামানন্তর হিন্দু সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। যাঁহারা পরাধীন অর্থাৎ পরের কার্য্য করিয়া যাঁহাদিগকে জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়, তাঁহারা পূর্ব্বাহ্লকাল সমস্ত শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সেবায় নিয়োজিত করিতে পারেন না। তাঁহাদিগকে সন্ধ্যাবন্দনাদির অনুষ্ঠান সংক্ষেপ করিয়া এবং দেবপূজা অতিথি প্রভৃতি পূজার ভার আপনার কোন প্রতিনিধির উপর অর্পণ করিয়া যথাসময়ে প্রভুর কার্য্যে যাইতে হয়। স্বাধীন ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্লকৃত্য যথা নিয়মে সম্পাদন করিয়া অপরাহ্নে আপন আপন ব্যবসায়ের কার্য্য করেন। যিনি

অধ্যাপক তিনি এই সময় ছাত্রগণ লইয়া অধ্যাপনা করেন। হিন্দুঅধ্যাপকের রীতি এই যে, নিজ বাটীতে অথবা চতুষ্পাটীতে ছাত্রগণকে বাসের স্থান দেন ও নিজ ব্যয়ে তাহাদিগকে আহার দেন। অধ্যাপনা করিয়া হিন্দু অধ্যাপক বেতন গ্রহণ করেন না, বেতন গ্রহণ করা বড় ঘৃণিত কার্য্য। যিনি বেতন লইয়া অধ্যাপনা করেন, তাঁহাকে ভৃতকাধ্যাপক এবং যিনি বেতন দিয়া অধ্যয়ন করেন তাঁহাকে ভৃতকাধ্যাপিত বলে। উভয়েই সাধুসমাজে অতিশয় নিন্দিত হন, এমন কি তাঁহারা অপাংক্তেয় বলিয়া পরিগণিত হন; অর্থাৎ পবিত্র লোকে তাঁহাদিগের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করেন না। ব্রাহ্মণ অধ্যাপনা করিয়া বেতন গ্রহণ করেন না এবং চাকুরিও করেন না। চাকুরি হিন্দুশাস্ত্রে শ্ববৃত্তি অর্থাৎ কুকুরের বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশিত হয় এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ। যাহাতে অর্থাগম হয়, অধ্যাপকগণ এমন কোন কার্য্য করেন না; তবে নিজের পরিবারের ও ছাত্রগণের ব্যয় কিরূপে নির্ব্বাহ হয়? আঢ্যলোকেরা বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে অথবা শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া উপলক্ষে পবিত্র বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক অর্থ দান করেন। ব্রাহ্মণগণ এই সমস্ত ক্রিয়া উপলক্ষে বহুসমাদরে আহুত হন এবং সকলে সমবেত হইলে মহতী সভা হয় ও সেই সভাতে পণ্ডিতগণের পরস্পর শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রীয়বিষয়ের বিচার হয়। বিচারান্তে কৃতীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহারা বিদায় গ্রহণ

করেন, এই বিদায়কালে কৃতী প্রত্যেককে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন এবং নিজের সামর্থ্যানুসারে ও তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্যের তারতম্যানুসারে সকলের চরণে কিছু কিছু অর্থ দান করেন।

বিদায়কালে এই দান দেওয়া হয়, এই জন্য দান বিদায় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই বিদায় অধ্যাপকগণের আয়। তাঁহাদিগের ভোগবিলাসিতা নাই এবং মিতাচারী বলিয়া ইহাতেই তাঁহাদিগের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া যায়। যাঁহার ছাত্রসংখ্যা অধিক এবং অপরাহ্লে অধ্যাপনা কার্য্য সমস্ত নির্ব্বাহ না হয়, তিনি সায়ংকালে সায়ংসন্ধ্যাদি করিয়া অনেক রাত্রি অবধি অধ্যাপনা কার্য্য করিতে থাকেন, তাহাতে তাঁহার আলস্য বা বিরক্তি নাই। পুণ্যলাভ হইবে, এই বিশ্বাসে ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে তিনি ছাত্রগণকে অধ্যাপনা করেন। তাহাদিগকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন তাহারাও তাঁহাকে পিতার অপেক্ষা অধিক ভক্তি করে। যখন তাঁহারা অধ্যাপকের বাটীতে থাকেন, তখন অধ্যাপকের পরিজনদিগের ও তাঁহা-দিগের মধ্যে কোন প্রভেদ লক্ষিত বা অনুভূত হয় না। তাঁহারা অধ্যাপকপত্নীকে মাতৃসম্বোধন ও তাঁহার পুত্র-কন্যাগণকে ভাই ভগিনী সম্বোধন করেন, অধ্যাপকসন্তান-গণও তাঁহাদিগকে বয়োজ্যেষ্ঠ হইলে, দাদা ও বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে ভাই বলিয়া সম্বোধন করেন। অনুগত ব্যক্তি, কি পোষ্য, কি দাস দাসী, যে হিন্দুপরিবারের ভিতর থাকে,

তাহারা সেই পরিবার মধ্যে পরিগণিত হয়। দাস দাসী গৃহস্থের কর্ত্তাকে পিতা ও কর্ত্রীকে মা বলিয়া সম্বোধন করে, তাঁহারাও তাহাদিগকে "বাপু" "বাছা" বলিয়া সম্ভাষণ করেন। চাকর মনিবে এত ঘনিষ্ঠতা যে দাসীর আর একটি নাম "ঝি" অর্থাৎ কন্যা। যখন বেতনভোগী ভৃত্যগণের প্রতি গৃহস্থের কর্ত্তা ও কর্ত্রীর এত দয়া ও স্নেহ, তখন ব্রাহ্মণসন্তান-ছাত্র যে স্নেহের পাত্র হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? এইরূপ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার রীতি ইদানীং প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে অর্থাৎ যখন সমাজ বিপ্লব হয় নাই ও সমাজের গ্রন্থি শিথিল হয় নাই, তখন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ভিন্ন প্রকার রীতি ছিল; অর্থাৎ শাস্ত্রে যেরূপ বিহিত আছে, তাহাই ছিল। তখন ব্রাহ্মণ গর্ভাষ্টমে উপনীত হইয়াই যে আচার্য্যের নিকট গায়ত্রী দীক্ষা হইয়াছে, পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার বাটীতে গিয়া ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর বা তদর্দ্ধ বা তাহার চতুর্থাংশ কাল বা যতদিনে তিন বেদের সম্পূর্ণ গ্রহণ না হয়, ততকাল তথায় বেদাধ্যয়ন করিতেন।

অনন্তর বিদ্যালাভ হইলে, গুরুর অনুমতি গ্রহণ করিয়া ব্রত স্নান সমাপনের পর দারপরিগ্রহ করিতেন। কি চমৎকার রীতি ছিল! যতদিন এই রীতি বলবতী ছিল, ততদিন ব্রাহ্মণসন্তানগণ অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া বেদাধ্যয়ন করিতেন, তাহাতে বিদ্যালাভও হইত ও চতুশ্চত্তারিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে থাকিতেন বলিয়া,

তাঁহাদিগের শুক্রক্ষয় হইত না; এজন্য তাঁহাদিগের শরীর বিজাতীয় দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইত এবং তাঁহাদিগের মেধা ও মনোবৃত্তি সকল অপ্রতিহত ও বীর্য্যপূর্ণ থাকিয়া তাঁহাদিগের বেদাধ্যয়নের পক্ষে বড়ই অনুকূল হইত ও এইরূপ শারীরিক ও মানসিক অবস্থাপন্ন লোকেরা বিবাহ করিয়া যখন সন্তান উৎপাদন করিতেন, সেই সন্তানগণ দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হইত। কালক্রমে এই সুন্দর রীতির লোপ হইয়া গিয়াছে এবং পুরাকালের ঋষিগণের মত লোকও আর জন্মে না।

যাঁহাদিগের শাস্ত্রে অধিকার আছে, কিন্তু অধ্যপনাকার্য্য করেন না, তাঁহারা অপরাহ্ণে পুরাণ শাস্ত্রের আলোচনা করেন। যেখানে এক ব্যক্তি এইরূপ আলোচনা করেন, সেখানে আরও পাঁচ সাত জন তাঁহার সমবয়স্ক বা আত্মীয় যাঁহারা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, আসিয়া সমবেত হন; সকলে মিলিয়া পুরাণ চর্চ্চা করেন। পুরাণে ভগবানের লীলা বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত আছে, সেই সমস্ত বর্ণনা পাঠ করিয়া পাঠক ও তাঁহার শ্রোতাগণ বড়ই আনন্দলাভ করেন। কখন বা কবির রচনা শক্তির প্রশংসা করেন, কখন ভগবানের অলৌকিক ক্রিয়া ও তাঁহার মহিমা কীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া সকলে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে থাকেন; আবার কখন কোন কৌতূকাবহ কথা উপস্থিত হইলে, মহা হাস্যের রোল সমুত্থিত হয়। মধ্যে মধ্যে ভৃত্যেরা তামাক সাজিয়া দেয় ও এই আলোচনার মধ্য দিয়া ধূম উঠিতে থাকে। এই

রূপে মহা আনন্দে সূর্য্যাস্তের প্রাক্‌ক্ষণ অবধি পুরাণ চর্চ্চায় অতিবাহিত হয়। সূর্য্যাস্তকাল আসন্ন দেখিয়া, একেবারে সকলে প্রস্থান করেন।

যাঁহাদিগের এ সঙ্গতি নাই অর্থাৎ যাঁহাদিগের শাস্ত্রে অধিকার নাই, সুতরাং নিজে পুরাণ আলোচনা করিতে পারেন না, তাঁহারা আহারের পর বিশ্রামানন্তর যেখানে পুরাণ পাঠ হয়, তথায় গিয়া পুরাণ শ্রবণ করেন। পুরাণ শ্রবণে পুণ্য হয়, আর পুরাণোক্ত কথাগুলি অতিশয় হৃদয়-গ্রাহী ও নীতিগর্ভ; সেই জন্য লোকে নিজে পুরাণ চর্চ্চা করিতে না পারিলেও অন্যত্র গিয়া তাহা শ্রবণ করে।

পুরাণ যে নিত্য কোন স্থান বিশেষে পঠিত হয় এবং তথায় গিয়া লোকে শ্রবণ করে, তাহা নহে। ধর্ম্মপরায়ণ আঢ্যলোকেরা পুণ্যকালে অর্থাৎ কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসে আপন আপন বাটীতে পুরাণ পাঠের অনুষ্ঠান করেন; অর্থাৎ ভাল পৌরাণিক দ্বারা পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা করান। এক ব্যক্তি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন না, কেননা পুরাণ সকল বড় বড় গ্রন্থ। যে ব্যক্তি পাঠ করেন, তিনি পড়িতে পড়িতে যদি ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে একখানি পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে বৎসরাধিক কাল লাগিতে পারে ও পড়িতে পড়িতে ব্যাখ্যা করিলে রসভঙ্গ হয়। এই জন্য এক ব্যক্তি পাঠ ও আর এক ব্যক্তি ব্যাখ্যা করিবেন, এইরূপ প্রথা হইয়াছে। যিনি পাঠ করেন, তাঁহার নাম পাঠক ও যিনি ব্যাখ্যা করেন তাঁহার নাম কথক। মূলগ্রন্থ পাঠ প্রাতঃ-

কালেই হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ প্রাতঃসন্ধ্যা না করিলে তাঁহার কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার জন্মে না; সুতরাং পাঠক প্রাতঃস্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যাদি করিয়া পাঠারম্ভ করেন। পাঠকালে আর কয়েকটি পৌরাণিক ও ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকেন। কৃতী, অর্থাৎ যাঁহার কল্যাণ বা পুণ্যার্থে পুরাণ পাঠ হয়, তিনি নিজে পাঠ শ্রবণে অসমর্থ; কেননা তিনি বড় মানুষ, বহুব্যাপারী, অনন্যকর্ম্মা হইয়া দুই তিন ঘণ্টা একাদিক্রমে বসিয়া পাঠ শ্রবণ করিতে তাঁহার অবকাশ হয় না, আর বড় মানুষ লোকেরা ইংরাজী বিদ্যারই চর্চ্চা করেন, তাঁহাদিগের সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রায়ই অধিকার থাকে না, সুতরাং পাঠ শ্রবণ করিলেও কোন ফলোদয় নাই। এই জন্য তিনি দুই চারিটি পবিত্র ব্রাহ্মণকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন যে, তাঁহারা তাঁহার পরিবর্ত্তে পাঠ শ্রবণ করিবেন। ইহাঁদিগকে শ্রোতা বলে। পাঠক পাঠ করিতে করিতে যদি অনবধানতা প্রযুক্ত কোন অংশ পাঠ করিতে ভুলিয়া যান, অথবা যদি তাঁহার পাঠ অশুদ্ধ হয়, তাহা ধরিবার জন্য দুই বা তদধিক জ্ঞানাপন্নব্রাহ্মণ পাঠকের নিকট বসিয়া পাঠ শ্রবণ করেন ও তাঁহার ভ্রম হইলে ভ্রম সংশোধন করেন। ইহাঁদিগকে ধারক কহে। এতদ্ভিন্ন আরও দুই চারি জন পবিত্র ব্রাহ্মণ সভাসৌষ্ঠবের জন্য পাঠস্থানে কোন বিশেষ কার্য্যভার প্রাপ্ত না হইলেও কেবলমাত্র পাঠ শ্রবণ করেন; ইহাঁদিগকে সদস্য বলে। পাঠক, ধারক, শ্রোতা ও সদস্য ইহাদিগের সকলকেই ব্রতী বলে। পুণ্যকালে কোন পুণ্য-

তিথিতে কৃতী পবিত্র হইয়া পুরাণ পাঠের সঙ্কল্প করেন ও ব্রতীদিগকে বরণ করিয়া তাঁহাদিগের স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করেন, তাঁহারাও কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া যথাজ্ঞানে কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হন।

এই সমস্ত প্রক্রিয়ার পর পুরাণ আরম্ভ হয়। যদি মহাভারতের পাঠ হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ তিন মাসকাল একাদিক্রমে পাঠ করিতে করিতে ভারত শেষ হয়। এই তিন মাস কৃতীর গৃহে নিত্য উৎসব। বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গনে বেদী প্রস্তুত হয়। বেদীর সম্মুখে উচ্চ কাষ্ঠাসনের উপর নারায়ণের স্বর্ণ, রৌপ্য বা ইতর ধাতুর সিংহাসন স্থাপিত হয়। ব্রতীগণের বসিবার জন্য বিচিত্র রাঙ্কবাসন প্রাঙ্গনে বিস্তৃত হয়, চারিপার্শ্বে অপর শ্রোতাদিগের জন্য অন্য আসন বিস্তৃত হয়। পুষ্পমাল্য ও দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা প্রাঙ্গনের চারিদিক সুসজ্জিত ও সুরঞ্জিত হয়। অনন্তর যথাসময়ে পাঠক কৃতস্নান ও কৃতাহ্নিক হইয়া উপস্থিত হইলে শালগ্রামশিলা বেদীর সমক্ষে নীত হন। অমনি শঙ্খধ্বনি হয় ও কাঁসর বাজিয়া উঠে এবং ধূপ ধূনার গন্ধে চারিদিকের বায়ু সৌরভময় হয়। পাঠক বেদীতে আরোহণ করিয়া যথাবিহিত আচমন ও সকল দেবতাকে প্রণাম পূর্ব্বক ভগবানের সমক্ষে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন! প্রায় সাড়েনাতটা হইতে সাড়েদশটা পর্য্যন্ত একাদিক্রমে পাঠ করিয়া পাঠক সে দিনের জন্য পাঠ বন্ধ করেন ও ব্রতীগণসহ তথা হইতে নিস্ক্রান্ত হন।

যখন ব্রাহ্মণগণ নিজালয়ে গমন করেন, তখন কৃতী তাঁহাদিগের আহারের জন্য নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য দেন। অনন্তর অপরাহ্নে কথকতা আরম্ভ হয়। কথকতাটি অতি অপূর্ব্ব অনুষ্ঠান! ইহা একপ্রকার পুরাণের গীতাভিনয়। কথক ভাষায় পুরাণের ইতিবৃত্ত বলিতে থাকেন, বলিতে বলিতে কোন উচ্চ গভীর ভাব বা রসের কথা উপস্থিত হইলে, মূল হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন এবং স্থানে স্থানে বক্ষ্যমান বিষয় স্বর যোগে তান লয়-সহকারে বলিতে থাকেন এবং পরিশেষে কালোচিত পদাবলী গান করিয়া বক্ষ্যমান বিষয়ের উপসংহার করেন। এই প্রণালীতে পুরাণ ব্যাখ্যা বড়ই হৃদয়গ্রাহী হয়। কথক মধ্যে মধ্যে কৌশলক্রমে হাস্য, মধুর, করুণ, বীর, বীভৎস প্রভৃতি নানা রসের কথা প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত করিয়া শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করেন। ফলতঃ শ্রোতৃবর্গ বড়ই তৃপ্ত ও প্রীত হন। চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া সকলে বেদী হইতে যে অমৃতনদী প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহা পান করেন ও কখন হাস্য করেন, কখন বা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকেন। ফল, কথকতার ফলোপধায়কতা অতি চমৎকার! কোন উপদেশ বাক্য বা বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে কথকতা দ্বারা যেমন হয়, এমন আর দ্বিতীয় উপায় নাই। এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টান পাদরীগণ কথকতার ফলোপধায়কতা দেখিয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্মপুস্তকের উপদেশ সকল কথকতা প্রণালীতে বিন্যাস করিয়া বাইবেলের

কথকতা মধ্যে মধ্যে করাইয়া থাকেন। এই কথকতা ভারতের নিজের সম্পত্তি, ইহা ভিন্ন দেশ বা ভিন্ন জাতির কোন অনুষ্ঠান বিশেষের অনুকরণ বা বিকার নহে। বড় বড় বক্তাদিগের বক্তৃতার যে মুগ্ধকারিণী শক্তি আছে, কথকতার শক্তি তাহা অপেক্ষা প্রবল।

আমাদিগের দেশে বক্তৃতার অনুশীলন অতি বিরল; কিন্তু আমাদিগের যে কথকতা আছে, তাহাতে বক্তৃতার অভাব আমাদিগের গায়ে লাগে না। অপরাহ্ণেও বেদীর সম্মুখে নারায়ণকে রাখিয়া কথকতা হয়। কথক ভগবানের লীলা বর্ণনা করিতে করিতে ভগবান ও দেবতাগণকে যেন শ্রোতৃবর্গের প্রত্যক্ষ করিয়া দেন; অনন্তর সায়ংকাল উপস্থিত হইলে কথা বন্ধ হয়। নারায়ণের আরতি করিয়া তাঁহাকে স্থানান্তর করা হয়, পরিশেষে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হয় এবং কৃতী ও তাঁহার পরিজনেরা মিলিত হইয়া হরিগুণ কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে বেদী প্রদক্ষিণ করিয়া সে দিনের কার্য্য শেষ করেন।

কেহ কেহ পুরাণের বঙ্গানুবাদ গৃহে বসিয়া পাঠ করেন; তাঁহাদিগের তাহাতেই অপরাহ্ণকৃত্য পুরাণালোচন সিদ্ধ হয়। অপরের বাটীতে পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিতে যাওয়াতে মানের খর্ব্বতা নাই! যেখানে হরিগুণগান হইবে, ভক্ত সেই খানেই যাইতে পারেন, আর পুরাণপাঠ স্থানে গেলে কৃতী পরম আপ্যায়িত হন এবং যিনি যান, তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করেন; তবে, যে কেহ কেহ গৃহে বসিয়া পুরাণের বঙ্গানুবাদ

পাঠ করেন, তাহার অন্য কারণ আছে। তাঁহারা কোন কোন দিন পুরাণপাঠ স্থানে যান এবং কোন কোন দিন অসুস্থতা নিবন্ধন, বা বারবেলানুরোধে যাইতে পারেন না। সপ্তাহের মধ্যে সকল বারেই বিশেষ বিশেষ ভাগ আছে; যখন সকল প্রকার কার্য্য নিষেধ এই সর্ব্ব কর্ম্মবারণ কালকে বারবেলা কহে। বারবেলায় সকল কার্য্য নিষেধ বলিয়া হিন্দু বারবেলায় কোন কার্য্য করেন না, অর্থাৎ কোন কর্ম্ম আরম্ভ করেন না। প্রারব্ধ কর্ম্ম করিতে কোন বাধা নাই। কোন স্থানে যাইবার নিতান্ত আবশ্যক হইলে, বারবেলা পড়িলে হিন্দু যাইতে পারেন না। না গেলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু গেলে নিশ্চয়ই বিঘ্ন বা অনিষ্ট ঘটে। বারবেলা ভাগ্যক্রমে চারি দণ্ডের অধিক থাকে না। দিনের মধ্যে যতবার বারবেলা হয়, চারি দণ্ডের অধিক বারবেলার স্থিতি নয়। এই জন্য বারবেলা অতিক্রম না করিয়া হিন্দু কোথায় যান না, কি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। বারবেলার ত পার আছে, অল্পকাল স্থায়ী, সে কাল গত হইলে অভিপ্রেত স্থানে গমন ও অভিপ্রেত কর্ম্ম আরম্ভ করা যাইতে পারে; কিন্তু এক এক দিন তিথি নক্ষত্র যোগাদির সংযোগে যাত্রারপক্ষে বা শুভকার্য্যের অনুষ্ঠানপক্ষে বড়ই বিরুদ্ধ হয়। সে দিন যাত্রা কি কোন শুভকর্ম্ম করা একেবারে নিষেধ; সে দিন যাত্রা কি কোন শুভকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে বড়ই অমঙ্গল হয়। আবার এক এক দিন যাত্রাদি শুভকর্ম্মের পক্ষে বড় অনুকূল হয়,

সে দিবস যাত্রা বা কোন শুভকর্ম্ম করিলে বড় শুভ হয়। এই জন্য হিন্দু কোন দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে হইলে কি কোন বিশেষ কার্য্য করিতে হইলে, পঞ্জিকা দেখিয়া কি জ্যোতির্ব্বিদ্ কোন পণ্ডিতকে দেখাইয়া শুভাশুভ কাল নির্ণয় করিয়া শুভক্ষণে যাত্রা বা কার্য্যারম্ভ করেন। সচরাচর বিবাহাদি সংস্কার শুভকর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হয়। এই সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান অবকাশ বা স্থবিধা হইলেই যে করা যায়, এরূপ নহে। এ সকল কার্য্যের বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট কাল আছে। বিশেষ বিশেষ তিথি, নক্ষত্র, যোগাদির সংযোগে সেই কালের উদয় হয়। আবার যেপ্রকার নাক্ষত্রিক যোগ বিবাহ পক্ষে শুভ, তাহা উপনয়ন বা অন্নাশন বা যাত্রার পক্ষে শুভ বা উপযুক্ত হয় না; সকল কর্ম্মের জন্য পঞ্জিকা দেখিয়া পৃথক্ পৃথক্ দিনাবধারণ করিতে হয়।

যাত্রা ও শুভকার্য্যাদির অনুষ্ঠান আরম্ভের পক্ষে আর এক প্রকার বাধা আছে। যাত্রাকালে অথবা কোন কার্য্য আরম্ভের সময় যদি কেহ হাঁচে, অথবা টিক্‌টিকী পড়ে অর্থাৎ টিক্‌টিকী বা গৃহগোধিকা টিক্ টিক্ করিয়া ডাকে, হিন্দু অমনি যাত্রা বা কার্য্যারম্ভ বন্ধ করেন। একেবারে রহিত করেন না, তবে তাৎকালিক উদ্যম রোধ করেন; আবার কিছু বিলম্বে যেখানে যাইবার সেখানে যান অথবা যাহা করিবার তাহা করেন। এরূপ ব্যবহারে নিদান কি, আমরা জানি না। বোধ হয়, হিন্দু এই হাঁচি টিক্‌টিকিকে দৈবনিষেধ বলিয়া মনে করেন।

কিছু মনে করিতে করিতে অথবা কোন কথা বলিতে বলিতে যদি ক্ষুতের শব্দ বা গৃহগোধিকার ডাক শুনিতে পান, হিন্দু বিবেচনা করেন তাঁহার মনন ও বাক্য দৈব কর্ত্তৃক সমর্থিত হইল।

বারবেলা অনুরোধে পুরাণপাঠ স্থলে যাইতে না পারিলে গৃহে বসিয়া পুরাণের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া এবং যখন নিকটে কোন স্থানে পুরাণ পাঠ না হয়, তখনও এইরূপে অপরাহ্নকৃত্য সম্পন্ন করিতে হয়।

যাঁহাদিগের ভূমি সম্পত্তি আছে কি যাঁহারা কৃষিকার্য্য করেন, তাঁহারা এই অপরাহ্নকালে স্ব স্ব কার্য্যের পর্য্যালোচনা করেন, অর্থাৎ কোন্ ভূমির কর আদায় হইয়াছে, কি হয় নাই, কোন্ ভূমিতে প্রজা নাই ও কোন্ ভূমি পতিত আছে, কত ভূমি কর্ষণ হইয়াছে ও কোন্ ভূমিতে কিরূপ শস্য জন্মিয়াছে, ইত্যাকার তত্ত্ব করা; করিয়া তত্তৎ বিষয়ের যথাবিহিত ব্যবস্থা করা। এই অপরাহ্নকালে হিন্দু সংসারের কি অভাব অপ্রতুল আছে, পরিজনেরা কে কি অবস্থায় আছে ও কাহার কি আবশ্যক এ সমস্ত তত্ত্ব লইয়া তাহার ব্যবস্থা করেন ও আত্মীয়, বন্ধু, এবং প্রতিবেশীগণের তত্ত্বাবধান করেন। এই সকল এবং এবম্বিধ নানা কার্য্যে হিন্দুর অপরাহ্নকাল অতিবাহিত হয়। অনন্তর যখন দেখেন সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই, তখন সমস্ত কার্য্য হইতে অপসৃত হইয়া হিন্দু পুনঃ শৌচাদি ও স্নানের উদ্যোগ করেন। শৌচাদির পর স্নান করিতে করিতে সায়ংসন্ধ্যার কাল

উপস্থিত হয়। নদীতে বা প্রতিষ্ঠিত জলাশয়ে স্নান ও সায়ংসন্ধ্যা করিয়া হিন্দু বাটীতে আসিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করেন। এখানে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে, আরাত্রিক দীপমালা প্রস্তুত রহিয়াছে, ধূপাধারে অগ্নিতে সর্জ্জরস মন্দ মন্দ প্রধূমিত হইতেছে। নানা জাতীয় উপাদেয় ফল মূল দুগ্ধ ক্ষীর সর নবনীত, আমিক্ষা শর্কর ও গৃহজাত মিষ্টান্ন সংযুক্ত নৈবেদ্য প্রস্তুত রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ আসনে উপবেশন ও আচমন করিয়া দীপমালা প্রজ্জ্বলিত করিলেন। প্রজ্জ্বলিত দীপমালা হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান হইয়া বামহস্তে ঘণ্টা নাড়িতে নাড়িতে দীপমালা ঠাকুরের সমক্ষে ধীরে ধীরে পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এ দিকে কেহ বা চামর, কেহ তালবৃন্ত ব্যজন করিতে লাগিলেন, কেহ প্রধূমিত ধূপাধার হস্তে লইয়া ঠাকুরের সমক্ষে তাহা দোলাইতে লাগিলেন, কেহ কাঁসর বাজাইতে লাগিলেন ও স্ত্রীলোকেরা শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং সকলে এককালে সমস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। দণ্ডাধিক কাল এইরূপে আরতি করিয়া ব্রাহ্মণ সাষ্টাঙ্গে ভগবানকে প্রণাম করিলেন ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নরনারী সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া ভগবানকে প্রণাম করিলেন; পরে ব্রাহ্মণ ভগবানকে নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়া দিলেন। পরিশেষে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় ভগবানকে শয়ান করাইয়া ঠাকুরঘর হইতে সকলে প্রস্থান করিলেন। এইরূপ অনুষ্ঠান যখন যুগপৎ প্রতি গৃহস্থের ভবনে হয়, তখন হিন্দুজনপদ

কি আনন্দময়, শোভাময় ও সমৃদ্ধিশালী বলিয়া বোধ হয়।

শালগ্রাম শিলার নীরাজন হইয়া গেলে, ব্রাহ্মণ যদি নিশ্চিন্ত হন, অর্থাৎ যদি তাঁহার পুত্র পৌত্রাদির ঝন্‌ঝট্‌ না থাকে, তাহা হইলে তিনি একান্তে বসিয়া আপন উপাস্য দেবতার ধ্যান, চিন্তা, মন্ত্র জপ করেন। পুত্র পৌত্রাদি থাকিলে তাহাদিগকে আপনার নিকট বসাইয়া ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি, যদি কুলীন হন, তাহা হইলে, কুলীনের লক্ষণ কি, পিতামহ মাতামহাদির ঊর্দ্ধতন ছয় পুরুষের নাম কি, তাঁহাদিগের গোষ্ঠীর আদিনিবাস কোথায় ছিল; ইত্যাদি বংশ ও কুলসম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সকল বলিয়া দেন। অনন্তর প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে গুরু মহাশয়ের নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছে, তাহার পর্য্যালোচনা করেন। হিন্দু-বালকের শিক্ষা প্রণালী অতি সহজ ও সরল। বালক পঞ্চ-বর্ষ বয়স্ক হইলে, শুভদিনে ও শুভক্ষণে বাগ্‌দেবীর পূজা দিয়া তাহার বিদ্যারম্ভ করান হয়। এই বিদ্যারম্ভকে সচরাচর "হাতে-খড়ি" বলে; কেননা প্রথমে বালকের হস্তে খড়ি দিয়া ঐ খড়ি সমেত তাহার হাত ধরিয়া তাহার পিতা, পিতৃব্য, কি ভ্রাতা, কি পুরোহিত বিদ্যারম্ভের অনুষ্ঠান করেন, অর্থাৎ ভূমির উপর বর্ণমালার বর্ণগুলি লিখাইয়া দেন। কয়েক দিন ভূপৃষ্ঠে খড়ি দ্বারা এইরূপ লিখাইয়া বালককে লিখিবার জন্য তালপত্র দেওয়া হয়। তাল-বৃক্ষের পত্র স্থূল ও শক্ত এবং হলবর্ণের চৌত্রিশটি বর্ণ

সমুদায় এক পৃষ্ঠায় লিখিত হইতে পারে এরূপ লম্বা। প্রথমে কোন সূক্ষ্মাগ্র লৌহ শলাকা দ্বারা হলবর্ণ কয়েকটি ঐ পত্রে খোদিত বা লিখিত হয়, অনন্তর সেই দাগ বা চিহ্নের উপর কোন বৃক্ষের দুধ বা আঠা দেওয়া হয়। তাহার পর আঠা না শুকাইতে শুকাইতে তদুপরি কয়লা-চূর্ণ দিয়া পত্রটি সূর্য্যকিরণে ধরিয়া অক্ষর চিহ্নগুলি শুকাইয়া লওয়া হয়। পরিশেষে পত্রটি ঝাড়িয়া বালককে দেওয়া হয়। বালক কলম দ্বারা সেই অক্ষর চিহ্নগুলির উপর কালি বুলাইতে থাকে। ইহাকে "দাগা-বুলান" বলে। বালক বারংবার কালী বুলাইলে পত্রটি নিতান্ত মলিন ও অপরিষ্কার হইলে, পত্রটি ধীরে ধীরে জলে ধৌত করিয়া লওয়া হয়। কালী উঠিয়া যায়, কিন্তু অক্ষরচিহ্ন অঙ্কিত ও অব্যাহত থাকে। দাগা-বুলান অভ্যস্ত হইলে, বালককে লিখিবার জন্য পরিষ্কার পত্র দেওয়া হয়। তখন সে অনা-য়াসে বর্ণগুলি নিজেই তালপত্রে লিখে। ইহাকে বলে "আদেখা-লেখা"। কয়েক দিবস এইরূপ লিখিতে লিখিতে অক্ষর পরিচয় হইয়া যায়,—আর তাহার জন্য পৃথক্ আয়াস পাইতে হয় না। হলবর্ণের পর স্বরবর্ণও এইরূপে লিখিত ও পঠিত হয়। তাহার পর যুক্তাক্ষর লিখিবার অভ্যাস হয়। ইহাকে "ফলাবানান" বলে।

হলবর্ণ, স্বরবর্ণ ও যুক্তাক্ষর লিখিবার অভ্যাস হইয়া গেলে পর অঙ্ক শিক্ষা হয়। এ শিক্ষার ক্রম প্রথম বালক শতিকা লিখে অর্থাৎ এক হইতে এক শত অঙ্ক পর্য্যন্ত

তালপত্রে লিখে। তদনন্তর কড়ানিয়া, গণ্ডাকিয়া, বুড়িকিয়া, পণকিয়া, চৌকিয়া, কাটাকিয়া, সেরকিয়া অর্থাৎ সকল রাশির ভগ্নাংশ এক হইতে এক শত অবধি লিখিতে অভ্যাস করে এবং মুখে মুখে নামতা শিখে। ইহার পর তেরিজ, জমাখরচ প্রভৃতি অঙ্ক শিখান হয় এবং এই সকল অঙ্কে পংক্তি পরম্পরা লিখিতে হয় বলিয়া, আর তালপত্র চলে না। তখন বালককে "কলাপাতা" ধরান হয়। তালপাতা ত্যাগ করিয়া কলাপাতা ধরা বালকের পক্ষে একটা উন্নতি এবং এই উন্নতির সময় গুরুমহাশয় কিছু পারিতোষিক প্রত্যাশা করেন ও পাইয়াও থাকেন। কলাপাতে ক্রমশঃ তেরিজ, পূরণ, হরণ ও যদিও গুরুমহাশয় ত্রৈরাশিক বলিয়া কোন অঙ্কের শিক্ষা দেন না, তথাপি ত্রৈরাশিকের নিয়মে যাহা সাধ্য এমন সকল অঙ্ক শিক্ষা করান; যথা—কড়িকসা, সুদকসা, মাসমাহিনা, কাঠাকালি, বিঘাকালি প্রভৃতি অন্য নানা প্রকার অঙ্ক। প্রথম কড়ানিয়া হইতেই ভগ্নাংশের শিক্ষা হয়, সুতরাং গুরুমহাশয়ের পাঠশালে অবিমিশ্র ও মিশ্র অঙ্কের পৃথক্ শিক্ষা নাই। ইহার সঙ্গে সঙ্গে কলাপাতে বালক পত্র লিখিতে অভ্যাস করে। তদনন্তর কিছু দিন পরে বালককে কাগজ ধরান হয়। কাগজ ধরাই পাঠশালের চূড়ান্ত বিদ্যা। ইহাতে আর নূতন কিছুই শিক্ষা হয় না, কেবল হস্তাক্ষরের উন্নতি হয়। ফলতঃ গুরুমহাশয়ের নিকট হস্তাক্ষরেব উন্নতি ও অঙ্ক শিক্ষা ভিন্ন আর কিছুই হয় না। পরে উপনয়ন হইলে

চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়। বালকের শিক্ষা প্রণালীটি কি সরল ও স্বল্পব্যয়সাধ্য! কাগজ, কলম, শ্লেট, পেন্‌সিল পুস্তকাদির কোন ব্যয় নাই। পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে অষ্টম বা নবম বর্ষ বয়ঃক্রম অবধি তিন চারি বৎসরে কেবল তালপাত, কলাপাত আর বাঁশের কঞ্চির কলমে লিখিয়া উত্তম অঙ্ক ও লিপি শিক্ষা হইয়া যায়। বাটীতে আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিবার জন্য, বা কৃষি-কার্য্যের তত্ত্বাবধান এবং ভূমিসম্পত্তির কর আদায় ও ব্যবস্থার জন্য যে একজন সরকার রাখা হয়, সেই বাটীর ছেলেদিগকে এই অঙ্ক ও লিপি শিক্ষা দিয়া থাকে এবং প্রতিবেশিদিগের ছেলেরা তাহাকেই দুই বা চারি আনা মাসিক বেতন দিয়া তাহারই কাছে অঙ্ক ও লিপি শিক্ষা করে; এইরূপে পাঠশালার শিক্ষা হইয়া যায়। সায়ং-সন্ধ্যার পর ব্রাহ্মণ যখন পুত্র পৌত্রাদিগণ আপনার কাছে লইয়া বসেন, তখন বালক প্রাতঃকালে ও অপরাহ্ণে গুরু-মহাশয়ের নিকট যাহা অভ্যাস করে, তাহার পর্য্যালোচনা তিনি করেন। বালকগণকে অঙ্ক জিজ্ঞাসা করেন। তদ্ভিন্ন চাণক্যশ্লোক ও বিষ্ণু শর্ম্মার হিতোপদেশের শ্লোক তাহা-দিগকে শিক্ষা করান। রাত্রি দেড় প্রহর অতীত হইলে আর আহার করিতে নাই; সুতরাং আর যে কার্য্য থাকে, তাহা সত্বর সম্পন্ন করিয়া দেড় প্রহরের মধ্যে আহার করিয়া ব্রাহ্মণ পান তামাক খাইয়া শয়নীয়ে গমন করেন এবং ভগবানকে স্মরণ করিয়া, (ভগবানের অসংখ্য নামের* মধ্যে

শয়নকালে "পদ্মনাভ" নামটি স্মরণ করিয়া) নিদ্রার আলিঙ্গনে শরীর ঢালিয়া দেন।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রবুদ্ধ হইয়া অবধি আবার রাত্রিতে শয়নীয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত হিন্দু সমস্ত দিন যে সকল নিত্য অনুষ্ঠেয় কার্য্য করেন, তাহা বর্ণিত হইল; পরাধ্যায়ে নিত্য অনুষ্ঠেয় কার্য্যের কোন বাধা হইয়া থাকে কিনা, তাহা বিবেচনা করা যাইবে।

৪র্থ অধ্যায়।

পূর্ব্বাধ্যায়ে যে সকল আচারের কথা বলা হইল, তাহা নিত্য অনুষ্ঠেয়; কিন্তু অবস্থা ও কালবিশেষে কোন কোন নিত্যকর্ম্মেরও অননুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। "অহরহঃ সন্ধ্যা-মুপাসীত" অর্থাৎ সন্ধ্যা উপাসনা দিন দিন করিবে। বেদের এই বিধান সত্ত্বেও দ্বাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও সংক্রান্তিতে সায়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ। সন্ধ্যা আহ্নিক করা যাঁহাদের কষ্টকর বোধ হয়, তাঁহারা আগ্রহের সহিত এই নিষেধ সম্পূর্ণরূপে পালন করেন। সন্ধ্যা করা কাহারও পক্ষে যে কষ্টকর, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কোন সময়ে এক স্থানে কতক-গুলি প্রাচীন ও পরিণত বয়স্ক লোক যদৃচ্ছাক্রমে বসিয়া নানা বিষয়ের কথা কহিতেছেন, লেখক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এক ব্যক্তির হস্তে একখানি পঞ্জিকা ছিল, আর এক প্রাচীন ব্যক্তি অতি আগ্রহের সহিত সেই পঞ্জিকা খানি বারংবার চাহিতে লাগিলেন।" কেন পঞ্জিকার জন্য এত আগ্রহ?" এ কথা জিজ্ঞাসিত হইলে, বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন,—"কবে হাফ্ স্কুল আছে দেখি।" "হাফ্ স্কুল কি?" পুনর্ব্বার স্পৃষ্ট হইলে, বৃদ্ধ বলিলেন,—"কবে সায়ং সন্ধ্যা নাস্তি তাহা দেখি।" বালকেরা প্রত্যহ সাড়ে দশটা হইতে সাড়ে চারিটা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে আবদ্ধ থাকে.

বড় কষ্ট হয়, কোন উপলক্ষে এক এক দিন যদি হাফ্ স্কুল হয়, অর্থাৎ একটার সময় বিদ্যালয় বন্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের বড় শান্তি ও আনন্দ লাভ হয়। গুরুমহাশয়ের শাসনের ভয়ে যে সকল বালক অনিচ্ছা পূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস করে, সেইরূপ অনিচ্ছায় যাহারা সন্ধ্যা বন্দনাদি করে, একদিন ছুটী পাইলে অর্থাৎ অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও দ্বাদশ্যাদি তিথিতে সায়ংসন্ধ্যার বাধা হইলে তাহারা আনন্দিত হয় এবং সেই সকল লোকেরা পঞ্জিকাতে "সায়ং সন্ধ্যা নাস্তি" লিখিত দেখিলেই একবারে সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ করে। কিন্তু যাঁহাদিগের সন্ধ্যাতে অরুচি নাই, তাঁহারা যদি দেখেন যে, দ্বাদশ্যাদি তিথির মান দিনমানের সহিত পর্য্যবসান হয়, তবে রাত্রি দণ্ডে তাঁহারা সন্ধ্যা করেন কেননা সন্ধ্যার কাল সূর্য্যাস্ত হইতে দুই দণ্ড পরিমিত; দিবা দণ্ডে যদি তিথিক্ষয় হইয়া যায়, তবে রাত্রি দণ্ডে সন্ধ্যা করাণীয়। কিম্বা যদি উক্ত তিথি সকলের স্থিতি পাঁচ সাত দণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত হয়, আর সায়ংসন্ধ্যার প্রকৃত প্রস্তাবেই বাধা হইয়া থাকে এবং ব্রাহ্মণ পাঁচ সাত দণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত পথ চলিতে থাকেন এমত হয়, অর্থাৎ কার্য্যানুরোধে কোথায় গিয়াছিলেন এবং বাটীতে প্রত্যাগত হইতে পাঁচ সাত দণ্ড রাত্রি হয়; অথবা এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন বিশেষ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন এবং কার্য্যাবসনে দেখেন যে সায়ংসন্ধ্যা ছিল না, কিন্তু তখন সায়ংসন্ধ্যা বাধাজনক তিথির ক্ষয় হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি সায়ংসন্ধ্যা করেন। সায়ংসন্ধ্যার প্রকৃত পক্ষে বাধা

হইলে তান্ত্রিক সন্ধ্যা করেন। অনেকে বৈদিক সন্ধ্যা ও সম্পূর্ণ বাধ দেন না, গায়ত্রী জপ করেন, করিয়া তান্ত্রিক সন্ধ্যা করেন। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ ভিন্ন একোদ্দিষ্টাদি শ্রাদ্ধ করিলে সায়ংসন্ধ্যার বাধ হয়।

এতদ্ভিন্ন অশৌচে সন্ধ্যাবন্দনাদির একেবারে বাধ হয়। অশৌচ দুই প্রকার, জননাশৌচ ও মরণাশৌচ; আত্ম পরিবারের ভিতর কাহারও সন্তান জন্মিলে, শুভাশৌচ বা জননাশৌচ হয় এবং কাহারও মৃত্যু হইলে মরণাশৌচ হয়। নিকট জ্ঞাতিবর্গের ও জন্ম মৃত্যুতে অশৌচ হয়। অশৌচে অনধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের বাধ হয়। বৈদিক সন্ধ্যা বেদমূলক, সমস্তই বেদমন্ত্র, সেই জন্য সন্ধ্যার ও বাধ হয়। যে উপলক্ষে বেদাধ্যয়নের বাধ হয়, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, যে প্রশান্তচিত্ততা এই অনুষ্ঠানে নিতান্ত আবশ্যক। বংশে সন্তান জন্মিলে, বা বংশের কাহারও মৃত্যু হইলে, উল্লাসে বা বিষাদে চিত্তের প্রশান্তভাবের অন্যথা হয়। এবম্বিধ ঘটনায় মানুষ অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে, তাহার চিত্তের বিক্ষেপ হয়, সুতরাং মন গাঢ় ও গভীর বিষয়ের আলোচনায় অশক্ত হয়। এজন্য এই সকল ঘটনায় বেদাধ্যয়ন নিষেধ এবং সন্ধ্যার ও নিষেধ হয়। অশৌচে দৈব পৈত্র্য, সমস্ত কার্য্যই নিষিদ্ধ কেবল মাত্র শিবপূজা ও ইষ্টদেবতার পূজা ও মন্ত্রজপেরবাধ হয় না। শিবপূজা ও ইষ্টদেবতা পূজা ও অশৌচকালে বিনা উপচারে কর্ত্তব্য। যে সমস্ত

কার্য্যের বিধি আছে, অশৌচে তৎসমুদয় মানসে করাই কর্ত্তব্য।

আহার নিত্য অনুষ্ঠেয় কার্য্য, কিন্তু তিথি ও পর্ব্ব বিশেষে ইহারও বাধ হইয়া থাকে। প্রতি মাসে দুই তিথিতে উপবাসের নিত্য বিধি। শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে উপবাস বিহিত। এই উপবাস সকলেরই কর্ত্তব্য। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যা করেন, তাঁহাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য। উপবাস না করিলে তাঁহাদিগের ব্রত ভঙ্গ হয়। হিন্দু বিধবারমণীগণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বিনী। তাঁহাদিগের একাদশীব্রত পালনে বিজাতীয় নিষ্ঠা, এমন কি মৃত্যুকালে ও এক বিন্দু গঙ্গাজল তাঁহারা একাদশীর দিন জ্ঞান থাকিতে গলাধঃকরণ করেন না। ঔষধ সেবনে, গঙ্গাজল পানে ও প্রসাদ গ্রহণে ব্রতের ব্যাধ হয় না, ইহা শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে উদিত আছে; কিন্তু হিন্দুবিধবা পীড়া হইলেও একাদশীর দিন ঔষধ সেবন করেন না, গঙ্গাজল ও প্রসাদগ্রহণ ত দূরের কথা।

ব্রহ্মচারিগণ একাদশীতে নিরম্বু উপবাস করেন; কিন্তু তাঁহারা স্ত্রীলোকের ন্যায় অবোধ নহেন, তাঁহারা বিধবা-দিগের মত পীড়ায় ঔষধ সেবন করিতে আপত্তি করেন না; অথবা পিপাসায় প্রাণ যায়, এমন অবস্থায় গঙ্গাজল পান করিতে সঙ্কোচ করেন না। বিধবা ও ব্রহ্মচারী ভিন্ন অপরে উপবাস করিতেই হইবে, এমন মনে করেন না এবং যাঁহারা উপবাস করেন, তাঁহারাও সকলে নিরম্বু উপবাস

করেন না। উপবাসের অনুকল্প করেন, অর্থাৎ সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যার পর ফল, মূল, দুগ্ধ আহার করেন এবং কেহবা লুচি ও রুটি আহার করেন। উপরে তিথিগত ধাতু বিকার বর্ণনা স্থলে কথিত হইয়াছে যে একাদশী তিথিতে নাড়ীতে শ্লৈষ্মিক ও বাত শ্লৈষ্মিক জ্বরকারক রসের সঞ্চার হয়, সুতরাং ঐ তিথিতে নাড়ীকে উপবাস দ্বারা শুষ্ক বা শুষ্ক আহার দ্বারা তিথি সম্ভূত স্বাস্থ্য নাশক রসোদ্গমের খর্ব্বতা করা একান্ত বিধেয়; অতএব একাদশীর উপবাস বা উক্ত তিথিতে শুষ্ক আহার করা, স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বড়ই আবশ্যক। মাসের মধ্যে এই দুই দিবস ভিন্ন আরও বিশেষ বিশেষ পর্ব্বে উপবাস ও দেবপূজাদি কর্ত্তব্য যথা;— শ্রীকৃষ্ণের জন্ম উপলক্ষে জন্মাষ্টমীতে, ভগবতীর শারদীয়া পূজা উপলক্ষে মহাষ্টমীতে, শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম উপলক্ষে শ্রীরামনবমীতে, শিবরাত্রি চতুর্দ্দশীতে ব্যাধের উদ্ধার উপলক্ষে উপবাস, ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবতী দুর্গাদেবী, ভগবান রামচন্দ্র ও ভগবান মহাদেবের পূজা করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন অন্য অনেক তিথিতে উপবাস কর্ত্তব্য বলিয়া বিধি আছে; কিন্তু উপরে যে কয়েকটির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সে কয়েকটিতে উপবাস নিতান্ত কর্ত্তব্য।

আবার বিশেষ বিশেষ দিবসে রন্ধন বা পাক নিষেধ, যথা অম্বুবাচী ও অরন্ধন। রন্ধন নিষিদ্ধ হইলেই নিত্য আহারের নিষেধ হইয়া পড়িল এবং তৎপরিবর্ত্তে অন্য আহার করিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিবসে সূর্য্য মিথুন রাশিতে

গমন করেন। যে বারে ও যে কালে এই মিথুন সংক্রমণ হয়, আবার সেই বার উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ পর সপ্তাহের সেই বারে ও সেই কালে পৃথিবী রজঃস্বলা হন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। বোধ হয় তৎকালে জলবর্ষণ হয় এবং জল বর্ষণে পৃথিবী রসযুক্ত হইয়া বীজাদি ধারণ করিবার উপ-যোগী হন, সেই প্রযুক্ত ঐরূপ কথিত হইয়াছে। পৃথিবীর রজঃস্বলা কালকে অম্বুবাচী বলে। যতি, বিধবা, ব্রহ্মচারী ও ব্রাহ্মণদিগের অম্বুবাচীতে পাক নিষেধ। ঋতু কালের মান তিন দিবস, সুতরাং অম্বুবাচীর স্থিতিও তিন দিবস।

এই তিন দিবস যতি, বিধবা, ব্রহ্মচারী ও ব্রাহ্মণগণের পাক করিয়া কি অপরের দ্বারা পাক করাইয়া খাওয়া নিষেধ, খাইলে চণ্ডালিণী, ব্রহ্মঘাতিনী ও রজকীর অন্ন খাওয়া হয়। রজঃস্বলা প্রথম দিনে চণ্ডালিণীর ন্যায়, দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্ম-ঘাতিনীর ন্যায়, তৃতীয় দিনে রজকীর ন্যায় অপবিত্রা হন; যথা, "প্রথমেঽহনি চণ্ডালী, দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী, তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থেঽহনি শুদ্ধ্যতি॥" অম্বুবাচীর প্রথমদিবসে পৃথিবী চণ্ডালিণীর ন্যায় অপবিত্রা সুতরাং পৃথিব্যুপরি সে দিবস যাহা পাক করিয়া খাইবে, তাহা চণ্ডালান্নের ন্যায় অপবিত্র হয়। এইরূপে দ্বিতীয় তৃতীয় দিবসে যে অন্ন প্রস্তুত হয়, তাহা ব্রহ্মঘাতী ও রজকীর অন্নের ন্যায় অপবিত্র হয়।

ভাদ্র মাসের যে কোন দিবসে হউক, অথবা উক্ত মাসের সংক্রান্তিতে অরন্ধনের অনুষ্ঠান করিতে হয়। যে দিবস এই অনুষ্ঠান হয়, তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে গৃহস্থের কর্ত্রী

অভুক্ত থাকিয়া পবিত্র ভাবে নূতন রন্ধনস্থালীতে গঙ্গাজলে মনসাদেবীর ভোগ রন্ধন করেন। অন্নপাক করিয়া অন্নে জল দিয়া রাখেন এবং এরূপ ব্যঞ্জনাদি পাক করেন, যাহা পর্য্যুষিত হইলে দুর্গন্ধ বা শুক্ত না হয়। পর দিবসে মনসা-দেবীর পূজা করিয়া এই পর্য্যুষিত অন্নের ভোগ দেওয়া হয়, পরে গৃহস্থ সকলে সেই প্রসাদ ভক্ষণ করেন। সে দিবস চুল্লীতে আগুন দিতে নাই এবং সদ্যঃ পাক করিয়া কিছু খাইতে নাই। নিতান্ত আবশ্যক হইলে, বাটীর বাহিরে কোনরূপে অগ্নি প্রজ্বালন করিয়া পাক করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বাধ্যায়ে উল্লিখিত নিত্য অনুষ্ঠেয় কার্য্যের আর কোন স্থানে বাধ হয় না।

বৈধকার্য্যের অকরণে প্রত্যব্যায় হয় এবং যে স্থলে বৈধ-কার্য্যের অকরণ বিহিত হইয়াছে, তথায় তাহার অনুষ্ঠান করিলেও প্রত্যবায় হয়। এই প্রত্যবায় পরিহারের জন্য শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা অর্থাৎ প্রাচীন মুনি ঋষিগণ যেমন সহৃদয় ও উদারস্বভাব ছিলেন, তাঁহাদিগের প্রণীত শাস্ত্রেও সেইরূপ উদার ভাব আছে। একবার অজ্ঞান বা মোহ বশতঃ কোন পাপাচরণ করিলে জীব যে চিরদিন পাপে মগ্ন থাকিবে, কস্মিন্‌কালেও তাহার পরিত্রাণ হইবে না, হিন্দুশাস্ত্রের এরূপ নিষ্ঠুর মর্ম্ম নহে। পাপ করিয়া পাপী ব্যক্তি যদি সেই পাপের বিহিত প্রায়-শ্চিত্ত করেন ও অনুতপ্ত হন, তাহা হইলে সে পাপের ক্ষালন হয়। ভিন্ন ভিন্ন পাপের ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্ত আছে।

প্রায়শ্চিত্ত করিবার পূর্ব্বে যদি দেহাবসান হয়, অর্থাৎ পাপ-গ্রস্ত হইয়া যদি জীব মরিয়া যায়, তাহা হইলে জন্মান্তরে সে পাপের ফল ভোগ করিতে হয়। নানা প্রকারে পূর্ব্ব-জন্মকৃত পাপের ভোগ হয়। জীব ইহজীবনে যত প্রকার কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করে, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের ভোগই অনেক। দেহে যত প্রকার পীড়া হয়, তাহা নানা কারণ সম্ভূত। কতকগুলি পাপজ। এই পাপজ পীড়ার শান্তির জন্য যেমন চিকিৎসা করাইতে হয়, তেমনি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; কেবল মাত্র চিকিৎসায় এমন রোগের শান্তি হয় না। এই জন্য অনেক রোগীকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে দেখা যায়। যদি কাহারো জীবিতাবস্থায় প্রায়শ্চিত্ত করা না হয়, আর পাপজ রোগের প্রভাবে তাহার মৃত্যু হয়; তবে, যতক্ষণ মৃত ব্যক্তির কোন আত্মীয় স্বজন, তাহার স্থানীয় হইয়া তাহার কর্ত্তব্য প্রায়শ্চিত্ত না করেন, ততক্ষণ তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয় না। যদি কেহ উক্ত ক্রিয়া করে, তবে মৃত-ব্যক্তিও পাপ হইতে মুক্ত হইল না বলিয়া পরজন্মে তাহাকে পাপের ভোগ ভুগিতে হয়, আর যে অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে তাহাকেও পাপগ্রস্ত হইয়া উক্ত পীড়া ভোগ করিতে হয়। অনেক সাধু সজ্জন পীড়া না হইলেও সহজ অবস্থায় প্রায়শ্চিত্ত ও চান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠান করেন। সে অনুষ্ঠান ইহ জন্মের পাপক্ষালনের জন্য।

৫ম অধ্যায়।

৩য় অধ্যায়ে যে সমস্ত নিত্য অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন আর কতকগুলি নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান আছে; অর্থাৎ যে সকল অনুষ্ঠান বিশেষ কারণ মূলক, সেই কারণ উপস্থিত হইলে সেই অনুষ্ঠান করিতে হয়। যথা বিবাহাদি দশবিধ সংস্কার,—১ গর্ভাধান, ২ পুংসবন, ৩ সীমন্তোন্নয়ন, ৪ জাত কর্ম্ম, ৫ নামকরণ, ৬ নিষ্ক্রমণ, ৭ অন্নপ্রাশন, ৮ চূড়াকরণ, ৯ উপনয়ন, ১০ বিবাহ। এই সকল সংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণের শরীর সংস্কার হয়। গর্ভকালীন গর্ভাধানাদি যে যে হোম করা হয়, তদ্দ্বারা ও জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ ও উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা দ্বিজাতিগণের বীজ ও গর্ভজাত জন্য পাপ সমূহ ক্ষয় হয়।

গার্ভৈ র্হোমৈ র্জাত কর্ম্ম চৌড় মৌঞ্জী নিবন্ধনৈঃ
বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে ॥

বিবাহ। হিন্দু বিবাহ স্বেচ্ছাধীন অনুষ্ঠান নহে; অর্থাৎ করিলেও হয়, না করিলেও হয়, এরূপ নহে, অথবা যখন স্ত্রীকে অট্টালিকায় রাখিতে পারিব, নানালঙ্কারে ভূষিত করিতে পারিব, গাড়ি ঘোড়ায় চড়াইতে পারিব, তখন বিবাহ করিব এরূপ কার্য্যও নহে। ইহা একটি ধর্ম্ম্যসংস্কার ও ইহার প্রধান উদ্দেশ্য পুত্রোৎপাদন, পিণ্ড-প্রদানার্থ পুত্রোৎ

পাদন। মনুর বিধানানুসারে অষ্টমবর্ষে উপনীত হইলে, ষট্‌ত্রিংশৎ বা তদৰ্দ্ধ অষ্টাদশ বা তদৰ্দ্ধ নয় বৎসর কাল ব্রহ্ম-চর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক দ্বিজাতিগণ গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদা-ধ্যয়ন করিবেন। তদনন্তর পূর্ণবেদ গ্রহণ হইলে, সমাবর্ত্তন ও স্নান করিয়া পিতৃগৃহে আসিয়া দার পরিগ্রহ করিবেন। এই বিধানানুসারে ব্রাহ্মণের চতুশ্চত্তারিংশৎ বা ষড়্‌বিংশতি বা সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে বিবাহ ঘটিত; কিন্তু ঐ বয়ঃক্রমেই যে বিবাহ কর্ত্তব্য, তাহার পূর্ব্বে বিবাহ করিতে নাই, তাহা মনু কুত্রাপি নির্দ্দেশ করেন নাই। ফলতঃ সমাবর্ত্তনের পর বিবাহ করিবে ইহাই ব্যবস্থা। এখন বেদাধ্যয়ন নাই, উপনয়নের দিবসেই উপনয়ন হইয়া গেলে সমাবর্ত্তন হইয়া থাকে, আর উপনয়নও এখন কিছু পরিণত বয়সে হইয়া থাকে। অতএব ব্রাহ্মণ উপনয়নের পরেই দার পরিগ্রহের অধিকারী হন। ব্রাহ্মণ কুমারীর বিবাহ উপযোগী বয়ঃক্রম ৮, ৯, এবং ১০ বৎসর পর্য্যন্ত অবধারিত আছে। দশ বৎ-সরের ঊর্দ্ধ বয়ঃক্রম হইলেই কুমারী রজস্বলা বলিয়া পরি-গণিত হয়। যথা,—

অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী,
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊৰ্দ্ধ রজঃস্বলা।
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তথৈবচ,
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্টা কন্যাং রজঃস্বলাম্॥

বিবাহের এই বয়ঃক্রম আধুনিক সভ্য জাতিরা এবং এত-দ্দেশের শিক্ষিত যুবকেরা অতিশয় অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা

করেন এবং হিন্দুদিগের বাল্যবিবাহ প্রথার বড়ই নিন্দা করেন ও তাহা লইয়া হুলস্থুল করেন। অনেকে বলেন, "এত অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দেওয়া কখন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান হইতে পারে না। ইহা আধুনিকদিগের মত। বোধ হয়, মুসলমানদিগের উপদ্রবের সময়ে যখন তাহারা অনূঢ়া কন্যা পাইলে ধরিয়া লইয়া যাইত এবং অন্যান্য অত্যাচার করিত, হিন্দুরা কন্যাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অতি অল্প বয়সে তাহাদিগের বিবাহ দিবার নিমিত্ত এই অভিনব বিধান করিয়াছেন।" কিন্তু এ বিধান অভিনব নহে, মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র অভিনব নহে, এই শাস্ত্রে অষ্টমবর্ষীয়া কুমারী ও চতুর্ব্বিংশতি বর্ষীয় যুবক বা দ্বাদশবর্ষীয়া কুমারী ও ত্রিংশৎ-বর্ষীয় যুবকের পরিণয়ের বিধান আছে;—যথা, "ত্রিংশৎ বর্ষোদ্বহেৎ ভার্য্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীম্।" ফলতঃ হিন্দু-সতীত্বের ভাব অতি উচ্চ, আধুনিকেরা এ ভাব ধারণা করিতেই পারেন না। কুমারী যদি একবার মনে করে যে, আমার এই বরের সহিত বিবাহ হইলে ভাল হইত, তাহা হইলেই হিন্দু তাহাকে দ্বিচারিণী বলিয়া গণনা করেন ও তাহার একনিষ্ঠতার অন্যথা হইল বলিয়া মনে করেন ও এ অবস্থায় তাহার নির্ব্যূঢ় সতীত্ব কখন হইতে পারে না বলিয়া স্থির করেন। অতএব পতি পত্নী সম্বন্ধ কি, এই জ্ঞান স্ফূর্ত্তি হইবার পূর্ব্বেই, যখন নরনারী ভেদ জ্ঞান হয় নাই, যখন লজ্জার উদয় হয় নাই এবং কুমারী অবলীলাক্রমে উলঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তখনই বালিকা প্রকৃত কুমারী,

তখন সে গৌরীরূপা অতি পবিত্রা এবং এই নগ্নিকাকেই হিন্দু পাত্রস্থা করেন, করিয়া নিশ্চিন্ত হন। আট হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত কুমারীর বিবাহের কাল বলিয়া বিহিত হইয়াছে। দশ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়ঃক্রম হইলেই কন্যা রজঃস্বলা বলিয়া পরিগণিতা হন, কেননা আজি কালি এগার বার বৎসর বয়সে অধিকাংশ কন্যা ঋতুমতী হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষা অধিক বয়সে কন্যার ঋতু হইত এবং যে সময়ে মানবধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন হয়, তখন বোধ হয় কন্যা আরো অধিক বয়সে ঋতুমতী হইত, সেই জন্য উক্ত শাস্ত্রে দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম ও কুমারীর বিবাহের বয়স বলিয়া উদিত হইয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যৌবনস্ফূর্ত্তির যে বয়স নির্দ্দেশ করিতে হয় করুন, কিন্তু যৌবনোদয়ের স্বাভাবিক অভ্রান্ত চিহ্ন এই ঋতু। আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা প্রকৃতি অপেক্ষা বিজ্ঞতর এ স্পর্দ্ধা করিতেন না। সুতরাং যৌবনোদয়ের প্রাকৃতিক চিহ্ন ঋতু দর্শনে, তাঁহারা যৌবন উপস্থিত বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং যৌবনের পূর্ব্বে পুত্র কন্যাকে যৌন সম্বন্ধের গ্রন্থি দ্বারা বন্ধন করিতেন। ঋতু বা যৌবন হইলে স্ত্রী জাতির পুরুষসংসর্গের প্রবৃত্তি প্রায় হইয়া থাকে এবং পতি অভাবে এই প্রবৃত্তি যদি অসদুপায়ে চরিতার্থ করিয়া আপনার সতীত্বহানি রূপ সর্ব্বনাশ এবং পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে নিরয়গামী করে, এই জন্য শাস্ত্রকারেরা আর্ত্তবকালের পূর্ব্বে বিবাহের বিধি করিয়াছেন।

এই নিন্দিত ব্যবহারের অর্থাৎ বাল্যবিবাহের অপরাধ এই যে, ইহা অযোনিশুক্রপাত ও বারাঙ্গনাসংসর্গের পথ অবরোধ করে এবং কুমারীগুলিকে অতি পতিপরায়ণা ও শ্বশুর, শ্বশ্রূ, গুরুজনদিগের বশবর্ত্তী, আজ্ঞাবহ, কষ্টসহিষ্ণু ও সন্তুষ্টচিত্ত করে। বাল্যবিবাহের প্রতিবাদিরা বলেন, যে আজীবন যাহার সহিত একত্র সহবাস করিতে হইবে, সে মনোরমা মনোবৃত্ত্যনুসারিণী না হইলে, তাহার সহিত প্রণয় না হইলে, তাহার সহিত উদ্বাহশৃঙ্খলে একেবারে জন্মের মত আবদ্ধ হওয়া নিতান্ত অবিমৃষ্যকারিতার কার্য্য। ভাবিদম্পতীর পরস্পর আলাপ, সাক্ষাৎ মাত্রও হয় নাই, এমন অবস্থায় তাহারা যে পিতা মাতা অভিভাবক কর্ত্তৃক যৌনশৃঙ্খলরূপ অভেদ্যনিগড় দ্বারা আবদ্ধ হয়, ইহা বড় নিন্দার বিষয় এবং দম্পতীর যাবজ্জীবনের কষ্টের কারণ হয়। যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাহারা মনে করেন যে, তাঁহারা ভাবী পত্নীকে এক আধ বার দেখিয়া, তাহার সহিত এক আধ দিন সংসর্গ করিয়া, তাহার স্বভাব প্রকৃতি বিলক্ষণ বিচার করিয়া তাহাকে বিবাহ করেন, করিয়া আমরণ সুখী হন। কি ভ্রম, কি বাতুলের ন্যায় কথা! একে ত অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে তাঁহারা বিবাহ করেন, যখন যৌবন পূর্ণতা প্রাপ্ত বা অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং যখন তাঁহারা স্ত্রীসংসর্গের জন্য মহা ব্যাকুল হন, তখন স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিলেই মুগ্ধ হন এবং প্রথম যাহাকে দেখেন তাহাকেই প্রতিমার ন্যায় পূজা করেন, সে সময় তাঁহাদের স্বভাব

প্রকৃতি বিচার করিবার ক্ষমতা কোথায় এবং অবসরই বা কৈ? এ পক্ষে প্রবীন ও প্রাচীন লোকে কন্যার লক্ষণ সমস্ত দেখিয়া, তাহার যে বংশে জন্ম, সে বংশের ইতিবৃত্ত জানিয়া, স্বভাব প্রকৃতি নির্ণায়ক যে জন্মপত্রিকা, তাহা দৃষ্টি করিয়া আমূলতঃ সমস্ত তথ্যানুসন্ধান করিয়া কুমারের বিবাহ দেন; তাহাতে কুমার কুমারী আজীবন পরম সুখে কাল হরণ করে। সুকুমারমতি বধূটি ব্যক্তি বিশেষকে পরমগুরু পতি বলিয়া জানিতে অভ্যাস করে। ক্রমশঃ এই অভ্যাস বশতঃ সেই ব্যক্তির প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ জন্মে, পরে যৌবনকাল অর্থাৎ গর্ভাধানের পর তাহাদিগের পরস্পর আলাপ ও প্রণয় হয়; সে প্রণয় অতি দৃঢ়তর ও বদ্ধমূল হয় এবং এক দিনের আলাপ ও সংসর্গের প্রণয়ের ন্যায় এক দিনে তাহার পর্য্যবসান হয় না। যাহা ইদানীন্তন বিজ্ঞেরা বাল্যবিবাহ বলিয়া অভিহিত করেন, সেটি প্রণয়-শিক্ষার সোপান স্বরূপ এবং হিন্দু যেমন তাঁহার বালককে বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠান, তেমনি প্রণয় ও শীলতাদি শিক্ষার জন্য বালিকাকে শ্বশুরালয়ে পাঠান। বালকের শিক্ষাস্থানে যেমন নিয়ম ও শাসন আছে ও তাহাতে সে কিছু ক্লিষ্ট হয়, বালিকার ও শিক্ষাস্থানে নিয়ম ও শাসন আছে, সেই শাসন প্রভাবে যদিও তাহাকে প্রথমে অসুখী হইতে হয়, কিন্তু পরিণামে তাহার প্রভাবে সে সাধ্বী পতিব্রতা ও যাবতীয় গৃহকর্ম্মে নিপুণা একটি গৃহিনী হইয়া উঠে।

যে কন্যা মাতার অসপিণ্ডা অর্থাৎ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত মাতামহাদি বংশজাত নয় ও মাতামহের চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সগোত্রা নয়, এবং পিতার সগোত্রা বা সপিণ্ডা না হয়; অর্থাৎ পিতৃষস্রাদি সন্ততি সম্ভূতা না হয়, সেই কন্যাই বিবাহে প্রশস্তা। হীনক্রিয় অর্থাৎ জাতকর্ম্মাদি সংস্কার-বিরহিত, নিষ্পুরুষ অর্থাৎ যে কুলে পুরুষ জন্মায় না কেবল কন্যামাত্র জন্মিয়া থাকে; নিশ্ছন্দ অর্থাৎ বেদাধ্যায়ন রহিত, রোমশ অর্থাৎ সকলেই বহুলোম যুক্ত, এবং অর্শ, রাজযক্ষ্মা অপস্মার, শ্বিত্র এবং কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত এই দশকুলে বিবাহ সম্বন্ধ রাখিবে না। যাহার মস্তকের কেশ পিঙ্গল বা রক্তবর্ণ, যাহার ছয় অঙ্গুলি প্রভৃতি অধিক অঙ্গ, যে চিররোগিণী, যাহার গাত্রে লোম নাই অথবা অধিক লোম আছে; যে অপরিমিত বাচাল অথবা যাহার চক্ষু পিঙ্গল বর্ণ, এইরূপ কন্যাকে বিবাহ করিতে নাই। নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, ম্লেচ্ছ, পর্ব্বত, পক্ষী, সর্প ও সেবাসূচক দাসদাসীর নামে যে কন্যার নাম, তাহাকে এবং অতি ভয়ানক নাম যুক্তা কন্যাকেও বিবাহ করিবেনা। যাহার কোন অঙ্গবিকৃতি নাই, যাহার নাম সুখে উচ্চারণ করা যায়, হংস বা গজের ন্যায় যাহার গতি মনোহর, যাহার কেশ, লোম ও দন্ত অনতিস্থূল, এমন কোমলাঙ্গী কন্যাকে বিবাহ করিবে। যে কন্যার ভ্রাতা নাই, অথবা যাহার পিতৃ বৃত্তান্ত বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না, প্রাজ্ঞজন সেই কন্যাকে পুত্রিকা অথবা জারজ বা মদ্যপজাত আশঙ্কায় বিবাহ করিবেন না।

বিবাহ জন্য কন্যা নির্ব্বাচনের শাস্ত্রে উল্লিখিত নিয়ম সকল উদিত হইল। বিবাহ শাস্ত্রমতে আট প্রকার, যথা—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। কন্যাকে সবিশেষ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়া বিদ্যা ও সদাচার সম্পন্ন বরকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করিয়া যে কন্যাদান তাহাকে ব্রাহ্মবিবাহ বলে। অতি বিস্তৃত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞারম্ভ হইলে পর সেই যজ্ঞে কর্ম্মকর্ত্তার পুরোহিতকে সালঙ্কৃত কন্যার যে দান তাহাকে দৈববিবাহ বলে। দৈবকার্য্য সিদ্ধির কামনায় এই বিবাহ সম্প্রদান হয় বলিয়া ইহাকে দৈববিবাহ বলে। যাগাদি অবশ্যকর্ত্তব্য ধর্ম্মের নিমিত্ত বরের নিকট হইতে গোবলীবর্দ্দ একযুগ বা দুই যুগই হউক, গ্রহণ করিয়া তাহাকে যে বিধিবৎ কন্যাদান, তাহাকে আর্ষ-বিবাহ বলে। তোমরা উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আচরণ করিবে এই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করাইয়া যথাবিধি অলঙ্কারাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বরকে যে কন্যাদান, তাহাকে প্রাজাপত্য-বিবাহ বলে। গার্হস্থ্যধর্ম্ম নিয়মে আবদ্ধ করাতে এই বিবাহ দৈবাদি হইতে হীন। আপনার উপর নির্ভর করিয়া কন্যার পিত্রাদিকে এবং কন্যাকে ধন দিয়া স্বেচ্ছা-চার মতে যে অশাস্ত্রীয় কন্যাগ্রহণ, তাহাকে আসুর-বিবাহ বলে। ইহা কামমূলক, পরন্তু হোমাদি দ্বারা পশ্চাৎ উহার বিবাহত্ব সিদ্ধ হয়।

কন্যাপক্ষীয় লোকদিগকে হনন করিয়া, কাটিয়া, তাহা-

দিগের গৃহভেদ করিয়া, হা হতোস্মি কৃতবতী রোরুদ্যমানা কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া যে বিবাহ করা, তাহাকে রাক্ষসবিবাহ বলে। নিদ্রায় অভিভূতা, মদ্যপানে বিহ্বলা, অথবা উন্মত্তা স্ত্রীলোকে যে গোপন ভাবে গমন করা তাহাকে পৈশাচবিবাহ বলে। আট প্রকার বিবাহের মধ্যে এই বিবাহ অতিশয় পাপজনক ও অধম। ব্রাহ্ম-বিবাহে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সে সুকৃতকারী হইলে তাহা দ্বারা ঊর্দ্ধতন দশপুরুষ ও অধস্তন দশপুরুষ, দৈব-বিবাহোৎপন্ন সন্তান দ্বারা ঊর্দ্ধ ও অধস্তন সাতপুরুষ, আর্ষ-বিবাহোৎপন্ন পুত্রদ্বারা ঊর্দ্ধতন তিন ও অধস্তন তিন পুরুষ এবং প্রাজাপত্য বিবাহোৎপন্ন পুত্রদ্বারা ঊর্দ্ধতন: ছয় ও অধস্তন ছয় পুরুষ পাপ হইতে উদ্ধার হয়। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিবাহে যে যে সন্তান জন্মে, তাহারা ব্রহ্ম-তেজযুক্ত, সাধুসম্মত, সুরূপ, স্বত্বগুণ প্রধান, বলবান, যশস্বী, পর্য্যাপ্তভোগবান ও ধার্ম্মিক হয় এবং তাহারা শতবৎসর জীবিত থাকে। অবশিষ্ঠ আর চারিটি ইতর বিবাহে অর্থাৎ আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচবিবাহে সন্তান ক্রূরকর্ম্মা, মিথ্যাবাদী, ধর্ম্ম ও বেদ বিদ্বেষী হয়।

উদকদান পূর্ব্বক কন্যাদানই ব্রাহ্মণগণের পক্ষে প্রশস্ত; ক্ষত্রিয়াদি অপরাপর বর্ণের পক্ষে যাহার যেরূপ অভিরুচি, সে তাহা দিয়া কন্যাদান করিবে। ধনগ্রহণদোষজ্ঞ পিতা কন্যাদান নিমিত্ত অল্পমাত্রও শুল্কগ্রহণ করিবেন না; কারণ লোভ বশতঃ কন্যা বিনিময় রূপ ধন গ্রহণ করিলে অপত্য-

বিক্রয়ী হইতে হয়। গোবধ ও অপত্যবিক্রয় উভয়ই সমান উপপাতক। পিতা প্রভৃতি যে বন্ধুস্থানীয়গণ মোহ বশতঃ কন্যা বা ভগিনীর নিমিত্ত স্ত্রীধন অথবা তৎসম্বন্ধীয় দাসী বাহন বা বস্ত্রাদি উপভোগ করেন, সেই পাপমতি পুরুষেরা অধোগতি প্রাপ্ত হন। আর্ষবিবাহে গোমিথুন রূপ শুল্ক বরের নিকট হইতে গ্রহণ করা যাইতে পারে, ইহা কেহ কেহ কহেন, সে কথা অসৎ। কেননা অল্পই হউক আর অধিকই হউক, কন্যার কারণ যাহা কিছু গ্রহণ করা যায়, তাহাতেই বিক্রয় সিদ্ধ হয়। তবে বরপক্ষীয়েরা কন্যাকে প্রীতিপূর্ব্বক যে ধন দান করে, পিত্রাদি তাহা না লইয়া যদি কন্যাকে দেন, তাহা হইলে তাহাকে বিক্রয় বলে না; কেননা এইরূপ ধন কুমারীগণের পূজোপহার, উহা গ্রহণে কিছু মাত্র পাপ নাই।

ধর্ম্মশাস্ত্রে মনু কর্ত্তৃক বিবাহ সম্বন্ধে যে সমস্ত নিয়ম উদিত হইয়াছে, তাহার কতকগুলি উপরে উদ্ধৃত হইল; কিন্তু এ সমস্ত নিয়ম আর এখন প্রতিপালিত হয় না। বরের নিকট হইতে গোমিথুন গ্রহণ যাহা কোন কোন শাস্ত্রকারেরা বিহিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও দোষাবহ বলিয়া মনু নির্দ্দেশ করিলেন; কিন্তু আজি কালি বরপক্ষীয়েরা বরাভরণাদির ফর্দ্দ দিলেই, কন্যাপক্ষীয়েরা কন্যাকে কি অলঙ্কারাদি দেওয়া হইবে তাহার তালিকা চাহিয়া থাকেন এবং সে তালিকা তাঁহাদিগের মতে যদি অযোগ্য বোধ হয়, তাহা হইলে অধিক চাহিতে সঙ্কোচ করেন না। বর-

পক্ষীয়েরা ত কন্যাকর্ত্তার যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ না করিয়া পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হন না; কোন কোন স্থানে কন্যাকর্ত্তার ভদ্রাসনবাটী বিক্রয় না করাইয়া ছাড়েন না। ফলতঃ এই কুপ্রথাতে সমাজের সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কন্যার বিবাহ দিয়া লোকে নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। যাহার দুর্ভাগ্যক্রমে কন্যাসন্তান হয, সে অচিরাৎ অবসন্ন হইয়া পড়ে। পুত্রসন্তান জন্মিলে লোকে কত আনন্দ করে! কিন্তু কন্যাসন্তান হইলে যে পিতা মাতা বন্ধুজনের উৎসাহ ভঙ্গ হয়, তাঁহারা ম্লান ও বিষণ্ণ হন, তাহার প্রধান কারণ বোধ হয় এই বিবাহঘটিত অতিরিক্ত ও অপরিমিত ব্যয়। আবার বঙ্গেশ্বর রাজা বল্লালসেন যে কুলপ্রথার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এই অপরিমিত ব্যয় এক প্রকার অপরিহার্য্য হইয়াছে। বল্লালসেন তাঁহার রাজ্যে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সদাচার ও সদ্‌গুণের উন্নতি এবং বিস্তারের জন্য সদাচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপস্যা ও দান এই নবঃগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে কুলীনত্বে নিয়োগ করিলেন, অর্থাৎ ইহাঁরা কুলীন বলিয়া আখ্যাত হইলেন এবং তদিতর ব্রাহ্মণেরা অকুলীন হইলেন। ইহাঁরা সর্ব্বত্র মান্য ও পূজ্য হইলেন, সকল সভাতেই কুলীনের মান মর্য্যাদা অগ্রে রক্ষা করিয়া পশ্চাৎ অপর ব্রাহ্মণের অভ্যর্থনা হইত; কিন্তু বঙ্গেশ্বর এই শুভোদ্দেশে যে প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন, তাহা কালসহকারে আচার ও ধর্ম্মবিপ্লব প্রভাবে, বঙ্গসমাজের প্রধান বিড়ম্বনা হইয়াছে। কুলীনের

যৌনসম্বন্ধে কুলীনের সহিতই হইত, অকুলীনে আদান প্রদান করিলে কুলীনের কুলক্ষয় হয়; কিন্তু অকুলীন অকুলীনই থাকে, তবে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হয়। কালক্রমে অনেক কুলীন অর্থলোভে অর্থাৎ অকুলীনের নিকট প্রচুর অর্থ পাইয়া তাঁহার সহিত আদান প্রদান করিয়া কুলভঙ্গ করিয়াছেন। এই সমস্ত কুলীনেরা ভঙ্গকুলীন বলিয়া আর এক শ্রেণীভুক্ত হইলেন এবং কুলীন, ভঙ্গকুলীন ও অকুলীন এই তিনশ্রেণী হইল। ভঙ্গকুলীন পাঁচ সাত পুরুষ পরম্পরা অকুলীনে আদান প্রদান করিতে করিতে কুলীন সংজ্ঞাচ্যুত হইলেন এবং বংশ্যজ বলিয়া আর এক শ্রেণীভুক্ত হইলেন। এখন রাঢ়ী ও বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে কুলীন, ভঙ্গকুলীন, বংশ্যজ ও অকুলীন, এই চারিটি শ্রেণী আছে। এতদ্ব্যতীত বৈদিক-শ্রেণী ব্রাহ্মণ বলিয়া আর এক শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ হিন্দু সমাজে আছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কৌলিন্য প্রথা নাই। সৎক্রিয়া ও ধর্ম্মানুষ্ঠান নিবন্ধন তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন বংশ অপর বংশ অপেক্ষা সমাজে অধিক মান্য ও আদৃত হন।

শূদ্রজাতির মধ্যে এই কৌলিন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং তাহাদিগের মধ্যেও অনেক উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট কুলীনের বিভাগ হইয়াছে। এখন কুলীনের কৌলিন্য যাহাতে হয়, অর্থাৎ সদাচার প্রভৃতি নবগুণ তাহা নাই, কুলীনের সন্তান হইলেই কুলীন হয়; কিন্তু কুলমর্য্যাদা আছে, এই মর্য্যাদার অনুরোধে কুলরক্ষা করিতে সকলেই

ব্যাকুল এবং আদান প্রদান বিষয়ে বিলক্ষণ দৃঢ়তর নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকে। এমনও কখন কখন ঘটে, যে একটি কন্যার বিবাহ একটি পাত্র বিশেষের সহিত হইলেই তাহার পিতার কুলরক্ষা হয়। এ স্থলে পাত্রের অভিভাবক কন্যার অভিভাবকের নিকট বরের প্রাপ্য বলিয়া যাহা চাহিবেন, তাহাই তাঁহাকে দিতে হইবে,—নচেৎ তাঁহার কুলরক্ষা হইবে না। কুলীনের সংখ্যা, অর্থাৎ যাঁহারা ভঙ্গ হন নাই, ক্রমে বড় সংক্ষেপ হইয়াছে। প্রায় সকলেই ভঙ্গ হইয়াছেন, স্বভাব কুলীন আর নাই বলিলেই হয়। যে অল্প সংখ্যক স্বভাব কুলীন অদ্যাপি আছেন, তাঁহাদিগের অনেকেরই কন্যার পাত্র পাওয়া বড় সুকঠিন হইয়াছে। অনেক স্থলে কুড়ি, পঁচিশ, ত্রিশ, চল্লিশ বা ততোধিক বৎসর বয়স্কা কন্যা পাত্রাভাবে অনূঢ়া থাকে। তাহাদিগের রজঃস্বলা হইতে বাকি থাকে না; অতএব—

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিনী,
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অতঊর্দ্ধ রজঃস্বলা।
মাতাচৈব পিতাচৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈবচ,
ত্রয়স্তে নরকংযান্তি দৃষ্টাকন্যাং রজঃস্বলাম্।" ইত্যাদি।

সম্বর্ত্তস্মৃতিতে যে বচন আছে, সেই বচনানুসারে এই সকল কন্যাদিগের পিতা মাতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা ত নরকস্থ হন, কিরূপে ইহাদিগের ও এই কন্যাদিগের যে ধর্ম্মরক্ষা হয়, কিরূপে তাঁহারা সাধুসমাজভুক্ত হইয়া সামাজিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করেন এবং সমাজদূষিত না হইয়া পবিত্র

থাকে, তাহা বলা যায় না। ফলতঃ এই কুলপ্রথা ও বিবাহ-কালীন দানাদির বাহুল্য প্রযুক্ত সমাজ উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। সকলেই ইহা বুঝিতে পারেন এবং সকলেই এই কুপ্রথা যাহাতে রহিত হয়, তাহা অন্তরের সহিত ইচ্ছা করেন; কিন্তু কার্য্যকালে সকলেরই পুরুষত্ব অবসন্ন হইয়া পড়ে, প্রচলিত প্রথার নিগড় হইতে কেহই মুক্ত হইতে পারেন না এবং নিতান্ত হীনবীর্য্যের ন্যায় প্রথার দাস হইয়া কার্য্য করেন। অনেকে বলেন, পুত্রের বিবাহ দিয়া যে ধন লাভ হয় তাঁহারা সে ধনের লোভ করেন না, তাঁহারা তাহা গ্রাহ্যও করেন না। কিন্তু কন্যার বিবাহ দিতে হইলে তাঁহাদিগকে যখন পাত্রকে যথারীতি দান দিতে হইবে, তখন পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে অনায়াসলভ্য ধন ত্যাগ করিয়া তাঁহারা কেন বৃথা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন?

যাঁহার কন্যা তাঁহার দান দেওয়া বা না দেওয়ার পক্ষে কোন স্বাধীনতাই থাকে না। একে ত প্রথা তাহার বিরুদ্ধ, তাহার উপর কৌলিন্যপ্রথাতে তাঁহার হস্ত পদ বাঁধা; যে পাত্রের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ হইতেছে, তাঁহাকে কন্যা দান না করিলে আর তাঁহার বিবাহ হইবেনা এবং তিনি জাতিভ্রষ্ট হইবেন। কৌলিন্য প্রথা শাস্ত্রানুমোদিত নহে, তাহার অন্য-থাচরণে প্রত্যবায় নাই, ইহা তাঁহারা জানেন; কিন্তু কৌলিন্য রক্ষা হইলে তিনি সমাজে মান্য হইবেন, এই মানের লোভে ধর্ম্মশাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে যাহা বিহিত হইয়াছে, তাহার অন্যথা-চরণ করিয়া পাপগ্রস্ত হইতেছেন। কি ভ্রম! কি প্রমাদ!

সদাচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতির উন্নতি ও বিস্তার যাহা এই কৌলিন্যপ্রথার উদ্দেশ্য ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে বহু-বিবাহ ও বিবাহব্যবসায় রূপ সর্ব্বনাশ এবং রজঃস্বলা কন্যাকে অনুরূপ পাত্রাভাবে পূর্ণ যৌবনকালে, কোন কোন স্থলে, বার্দ্ধক্য অবধিও অনূঢ়াবস্থায় গৃহে রাখাতে যে পাতিত্য হয়, তাহারই উদয় হইয়াছে।

রাজার শাসনে সমাজের কুপ্রথা সকল রহিত হইয়া থাকে, হিন্দুসমাজ বিজাতীয় রাজার অধীনস্থ, হিন্দুদিগের রাজ-পুরুষেরা তাঁহাদিগের সমাজের কোন্ প্রথা ভাল, কোন্ প্রথা মন্দ তাহা জানেন না। হয়ত সমাজের পক্ষে যাহা মন্দ, রাজ-পুরুষেরা তাহা ভাল মনে করেন। আবার ইংরাজি-শিক্ষার প্রভাবে সমাজের অধিকাংশ লোকের রুচি ও মত বিপর্য্যয় হইয়াছে, এ স্থলে একজন সমাজপতি অর্থাৎ এক ব্যক্তি যাঁহাকে সমাজের যাবতীয় লোকে সম্মান করে ও যাঁহার শাসনে সকলে শাসিত হয়, এমন লোকের বড়ই অভাব হয়। স্বর্গীয় রাজা সার্ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই প্রকার একটি লোক ছিলেন। তিনি বিদ্বান, স্বধর্ম্মনিরত, ধনবান ও পদস্থ ছিলেন; তাঁহাকে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকেই মান্য করিত এবং তৎকর্ত্তৃক কোন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে, সকলেই তাহার অনুসরণ করিত। কিন্তু সেরূপ লোক এখন আর নাই। এই জন্য স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, মহাশয় রাজাজ্ঞা দ্বারা বহুবিবাহ রহিত করিবার উদ্যম করিয়াছিলেন। তিনি

যেরূপ উদ্যমবান পুরুষ ছিলেন ও রাজপুরুষগণের নিকট যেরূপ মান্য ছিলেন, তাঁহার উদ্যোগে বহুবিবাহ রহি হইয়া যাইত; বহুবিবাহ রহিত হইলেই কৌলিন্য প্র সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইত। তাঁহার প্ররোচন রাজকীয় ব্যবস্থাপক সভায় বহুবিবাহাবরোধক ব্যবস্থ প্রস্তাবিত হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত মহাত্মার কোন কে সমকক্ষ লোক অর্থাৎ যাঁহারা আপনাদিগকে তাঁহার সদৃ বা তাহা হইতে উন্নত মনে করিতেন, তাঁহারা বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক এই চিরন্তনী প্রথা উন্মুলিত হইলে তাঁহাদিগের যশোঘোষণা সহ্য করিতে অশক্ত হইবেন বলিয়া ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া উক্ত প্রস্তাবিত ব্যবস্থার প্রতিকূলাচরণ করিয়া তাহা রহিত করিয়া দেন।

অনতিদীর্ঘকাল হইল যখন পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি কলিকাতা ধর্ম্মমণ্ডলী নামক সভা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেন এবং রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়, রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় খেলচন্দ্র ঘোষের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঘোষ প্রভৃতি এই সভা সংস্থাপন বিষয়ে অনুরাগী ও উদ্যোগী হইলেন, তখন মনে হইল এইবার হিন্দুসমাজের এক প্রধান অভাব মোচন হইল; অর্থাৎ এই সভার শাসনে সমাজ সংস্কৃত হইবে, সকল প্রকার কুপ্রথা কুরীতি রহিত হইবে এবং রাজপুরুষদিগকে আর সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে কোন বিষয় লইয়া উত্তেজনা করিতে হইবে না। হিন্দুধর্ম্ম সংরক্ষণ ও সমাজ সংস্কার এই সভার উদ্দেশ্য। যথা-

নিয়মে সভা স্থাপিত হইল এবং সভার কার্য্য হইতে আরম্ভ হইল। ধর্ম্মমণ্ডলী স্থির করিলেন যে ব্রাহ্মণের জন্মই ধর্ম্মরক্ষার জন্য, "ধর্ম্ম কোষস্য গুপ্তয়ে।" অতএব হিন্দু-ধর্ম্ম রক্ষা ও হিন্দুসমাজের সংস্কার ব্রাহ্মণেরই কার্য্য, ব্রাহ্মণ ভ্রষ্ট ও উন্মার্গগামী হওয়াতেই ধর্ম্মলোপ ও সমাজভ্রষ্ট হইতেছে। ব্রাহ্মণের যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এই কয়েকটি কর্ত্তব্য শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, এতদ্ভিন্ন অপর কার্য্য ব্রাহ্মণ করিতে পারেন না। আঢ্য লোকেরা ক্রিয়া কলাপ উপলক্ষে ব্রাহ্মণকে বহুল পরিমাণে ধন দান করেন। এই অযাচিত দান প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণ সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। কালক্রমে এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের লোপ হইয়া আসিতেছে এবং ব্রাহ্মণগণের প্রাপ্তির হ্রাস হইতেছে; সুতরাং তাঁহাদের ন্যায্য ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না। তাঁহারা তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান হইতে পরাঙ্মুখ হইতে বাধ্য হন এবং গর্হিত কার্য্য করিয়া অর্থা-গমের চেষ্টা করেন। অতএব ব্রাহ্মণদিগকে বৃত্তিস্থ করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধনের অবকাশ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক, এবং বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহাদিগের নিজ নিজ সমাজের আচার ব্যবহারের উপর দৃষ্টি রাখিবার আদেশ করিলে, ক্রমে সেই সেই সমাজের অভ্যন্তরে আচার ব্যবহার ঘটিত যে সকল দোষ আছে, তাহা প্রকাশ হইয়া সংশোধিত হইবে। এইরূপে যে ব্যক্তি অনুরূপ পাত্রা-ভাবে যথাকালে কন্যার বিবাহ না দেন এবং কন্যা রজঃ-

স্খলা হইয়া পড়ে, তাঁহার সমাজ-নায়ক অধ্যাপক তাঁহাকে নরকস্থ হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন এবং সমাজ তাহাকে বর্জ্জন করিবে। যদি অধ্যাপকের শাসন সে ব্যক্তি গ্রাহ্য না করে, অথবা সমাজ যদি অধ্যাপকের কথাতে তাহাকে বর্জ্জন না করে, তাহা হইলে অধ্যাপক তদ্বিষয় ধর্ম্মমণ্ডলীকে বিজ্ঞাপন করিবেন, মণ্ডলী বিজ্ঞাপিত হইলে যথার্থ তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া যদি দেখেন যে অপরাধীর অপরাধ সপ্রমাণ হইল, তাহা হইলে অপরাধীকে সমাজ হইতে বর্জ্জন করিয়া মুদ্রাঙ্কিত বিজ্ঞাপন, দ্বারা অর্থাৎ ধর্ম্ম-মণ্ডলীর গেজেটে তাহা প্রকাশ করিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিবেন। এইরূপ যদি কোন ব্যক্তি পুত্রের বিবাহে কন্যাকর্ত্তার সামর্থ্যাতিরিক্ত অর্থ অলঙ্কারাদি প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে সমাজনায়ক অধ্যাপক মধ্যস্থ হইয়া দেনা পাওনার বিষয় মীমাংসা করিয়া দিবেন। যদি বরকর্ত্তা অধ্যাপকের ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করেন, অধ্যাপক সে বিষয় মণ্ডলীকে জ্ঞাপন করিবেন এবং মণ্ডলী বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তির যথাবিধি শাসন করিবেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক এক সমাজে তত্রত্য আচার ব্যবহার ঘটিত ব্যভিচার সংশোধিত হইয়া আসিবে, কিন্তু এ আশা হায়, ফলবতী হইল না।

প্রায় তিন চারি বৎসর হইল ধর্ম্মমণ্ডলী স্থাপিত হইয়া কার্য্য হইতেছে, কার্য্য নির্ব্বাহার্থে যে অর্থ আবশ্যক তাহা শনৈঃশনৈঃ আসিয়া পড়িতেছে এবং স্থানে স্থানে

অধ্যাপকদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। বোধ হয় আজিকার দিনে ধর্ম্মমণ্ডলীর বৃত্তিভোগী অধ্যাপকের সংখ্যা পঞ্চাশজনের ন্যূন নহে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত ধর্ম্মমণ্ডলীর বিজ্ঞাপনী বাহির হইল না এবং কোন সমাজে যে কোন সংস্কার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়াছে কি না, তাহাও জানিতে পারা গেল না। হিন্দুসমাজের সমাজঅধিনায়কের অভাব ঘুচিল না আর ঘুচিবে বলিয়া বোধও হয় না। শশধর তর্কচূড়ামণি রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, বাবু রমানাথ ঘোষ প্রভৃতি লোক এ কার্য্যে ব্রতী হইয়া যখন ইহার এই পরিণাম হইল, তখন আর কাহার সাধ্য এ কার্য্য করে! কর্ম্মী বঙ্গভূমিতে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সেই পুরুষ যদি ধর্ম্মমণ্ডলীর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, এত দিনে কত কুপ্রথা উন্মুলিত হইয়া যাইত।

যাহা হউক, বিবাহে ব্যয় বাহুল্য সত্ত্বেও, কৌলিন্যপ্রথার অনুরোধে সকল সময়ে যথাযোগ্য পাত্রের অভাব হইলেও, বিবাহের নিবৃত্তি নাই। বর্ষে বর্ষে কত বিবাহ হইতেছে, কত ধনক্ষয় হইয়া যাইতেছে। বিবাহ হিন্দুসমাজে এক প্রধান উৎসব। আঢ্য লোকেরা এই উৎসবে বিস্তর ধন ব্যয় করেন। আলোকমালা, অগ্নিক্রীড়া, বাদ্য, নৃত্য, গীত, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে দান, সামাজিক দান, ভোজ প্রভৃতি এই উৎসবের নানা অঙ্গ। যাঁহারা বড় ধনী, এক এক বিবাহে লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। বিবাহের প্রায় এক-

মাস পূর্ব্ব হইতে সুরঞ্জিত কাগজে নিমন্ত্রণ পত্র মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতে থাকে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের নিমন্ত্রণপত্র সংস্কৃত ভাষায় ও সমাজের পত্র বাঙ্গালাভাষায় লিখিত হয়। প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে নহবৎ (বাদ্য সমবায় বিশেষ) আরম্ভ হয়,তাহার বাদ্যোদ্যমে সমস্ত পল্লী আমোদিত হয়। বিবাহের সপ্তাহ পূর্ব্বে নৃত্য, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয় এবং সামাজিক (সামাজিক দান) বাহির হয়। এই দান লইয়া বিবাহ বাটীর দাস দাসী ও কর্ম্মচারিগণ সুরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া বাড়ী বাড়ী ফিরিতে থাকে। আবার বিবাহ বাটীতে অনূঢ়ান্নের তত্ত্ব লইয়া কত কত লোক আসিতে থাকে। অনূঢ়াবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া প্রৌঢ়াবস্থায় পুত্র কন্যা প্রবেশ করিলে পিতা মাতার অতিশয় আনন্দহয় এবং বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে অনূঢ়ান্ন বলিয়া এক আনন্দসূচক উৎসব করেন ; অর্থাৎ পুত্র কন্যাকে নূতন বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া যাবতীয় বন্ধুবান্ধব সমবেত হইয়া মহাসমারোহে পুত্রকন্যাকে বিবিধ অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইয়া আহার করান ও সেই সঙ্গে আপনারাও আহার করেন ও পুত্র কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করেন। পিতা মাতার এই উৎসব হইয়া গেলে যাঁহারা বিশেষ আত্মীয়, তাঁহারাও পুত্র কন্যাকে নব বস্ত্র পরিধান করাইয়া উপাদেয় অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইয়া আহার করান। এখন যত লোক বিবাহে বা অনূঢ়ান্নের উৎসবে আহূত হয়, সকলেই পুত্র কন্যার সহিত ঐরূপ পিতৃ মাতৃ বা বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতে

চান ; কিন্তু সকল লোকের ও সকল জাতির বাটীতে গিয়া আহার করিয়া আসা সম্ভব নয় বলিয়া, অনূঢ়ান্নের তত্ত্বের অভিনব সৃষ্টি হইয়াছে। এক এক বিবাহলগ্নে এক এক গৃহস্থের পাঁচ সাত বা ততোধিক বিবাহের নিমন্ত্রণ হয় এবং এই অনূঢ়ান্নের তত্ত্ব করিতে তাঁহার ন্যূনকল্পে বিশ ত্রিশ টাকা ব্যয় হয়, ইহাতে বড় কষ্ট হয়। সামাজিক পাওনা আঢ্য-লোকের বাটীর বিবাহেই হইয়া থাকে ; কিন্তু অনূঢ়ান্নতত্ত্ব আপামর সাধারণ সকলকেই করিতে হয়। কাদাচিৎক সামাজিক পাইয়া বার মাস যাবতীয় সমাজকে অনূঢ়ান্নতত্ত্ব যোগান গৃহস্থের পক্ষে বড় কষ্টকর হয়। গৃহস্থ বিরক্ত হন এবং এই কুপ্রথার যৎপরোনাস্তি নিন্দাবাদ করেন ; কিন্তু বিবাহের নিমন্ত্রণ হইলেই সুড়্ সুড়্ করিয়া তত্ত্ব পাঠাইয়া দেন। অনূঢ়ান্ন ভোজ পাত্র পাত্রী উভয়ের বাটীতেই হইয়া থাকে, বিবাহ রাত্রি ভোজ কেবল পাত্রীর বাটীতেই হয়। এইটি প্রধান ভোজ। সামান্য গৃহস্থেরবাটীতে এই উপ-লক্ষে চারি পাঁচ শত লোক ভোজন করে, ধনবানের বাটীতে চারি পাঁচ সহস্র লোক ভোজন করে, তাহার আশ্চর্য্য কি ? বিবাহের পরে আর এক অনুষ্ঠান আছে ;—তদুপলক্ষে পাত্রের বাটীতে ভোজ হইয়া থাকে ; এই অনুষ্ঠানের নাম পাকস্পর্শ, হাতেহাঁড়ি বা বৌ-ভাত ; অর্থাৎ এই ভোজে নববধূস্পৃষ্ট অন্ন সকল ভোক্তাকে দেওয়া হয় ; তাঁহারা আহার করিলে নববধূর অন্ন সমাজের সকলে গ্রহণ করিবেন ইহা স্থির হইয়া যায় এবং বিবাহ যথাযোগ্য স্থানে

হইয়াছে এবং বিবাহে কোন দোষ হয় নাই, ইহাই প্রমাণ হয়।

গর্ভাধান।—এইটি স্ত্রীলোকের সংস্কার—স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় সংস্কার। বিবাহ প্রথম ও প্রধান সংস্কার, বিবাহের পর যখন কন্যা ঋতুমতী হয়, তখন এই দ্বিতীয় সংস্কার হয়। রজোদর্শন হইতে ষোড়শ দিবসের মধ্যে এই সংস্কারের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই সংস্কারে যথাবিধি হোম করিতে হয়, সূর্য্যার্ঘ্য দিতে হয় এবং মন্ত্রোচ্চারণাদি দ্বারা গর্ভসংস্কার করিতে হয়। স্ত্রীর দ্বিতীয় সংস্কারের কাল উপস্থিত হইলে, পতি যদি বিদেশে থাকেন এবং ষোলদিনের মধ্যে দেশে আসিবার সম্ভাবনা না থাকে, অথবা অশৌচাদি নিবন্ধন তাঁহার হোমাদি কার্য্যে অধিকার না থাকে; তাহা হইলে পতি দেশে প্রত্যাগত হইলে অথবা অশৌচের অবসানে আবার কন্যার রজোদর্শন হইলে, ষোলদিনের মধ্যে শুভদিন দেখিয়া সংস্কারের দিনাবধারণ করিয়া তদ্দিনে সংস্কার কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন করিতে হয়।

প্রথম রাজোদর্শন হইতে যতদিন এই সংস্কার না হয়, ততদিন পতি পত্নীর একত্র সহবাসের অধিকার থাকে না। দ্বিতীয় সংস্কার হইলে, স্বামীর স্ত্রীসংসর্গের ও স্ত্রীর পতি সংসর্গের অধিকার হয়। এই সংস্কার যদ্দ্বারা দ্বিজগণের গার্ভিক ও বৈজিক পাপক্ষয় হয়, আমাদিগের রাজপুরুষেরা তাহা করিতে দিবেন না। কি রাজানুচিত চেষ্টা! কোথায় দৈবাৎ কোন্ পাষণ্ডের সংসর্গে কোন অভাগিনী যুবতীর সাংঘাতিক

আঘাত লাগিয়া প্রাণাত্যয় হইয়াছে বলিয়া একেবারে স্কোবেল সাহেব রাজকীয় ব্যবস্থাপক সভায় অন্যূন দ্বাদশবর্ষ বয়স্কা কন্যাতে কেহ উপগত হইতে পারিবে না, এই মর্ম্মের ব্যবস্থা প্রস্তাব করিয়া সভার অনুমোদিত করিয়া প্রচার করিয়া দিলেন! হরি মাইতি সম্বন্ধে যে ঘটনা হইয়াছিল, সেইরূপ ঘটনা যদি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ঘটিত, তাহা হইলে এক দিন এরূপ ব্যবহারের সমর্থন করা যাইত। হরি মাইতির ঘটনা একটা উপলক্ষ মাত্র। বোধ হয় হিন্দু-ধর্ম্মের উপর আঘাত করাই উদ্দেশ্য, এই উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া স্কোবেল সাহেব সে উদ্দেশ্য সাধন করিলেন। রাজা যে কার্য্য করিবেন বলিয়া কৃতসংকল্প হইয়াছেন, কে তাহার রোধ করিতে পারে? যাবতীয় হিন্দুসমাজ এক বাক্যে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী কতিপয় ভারতবাসী ব্যবস্থার পক্ষপাতী হওয়াতে, আপত্তি সার্ব্বভৌমিক নহে বলিয়া ব্যবস্থা অনুমোদিত ও প্রচারিত হইল। স্কোবেল সাহেবের ব্যবস্থা গর্ভাধান সংস্কারের আনুসঙ্গিক ক্রিয়ার অর্থাৎ মান্ত্রিক অনুষ্ঠানের অবরোধক নহে; কিন্তু তদ্দ্বারা প্রকৃত কার্য্য অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ সংসর্গের বাধা হইবে, তাহা হইলেই ধর্ম্মের হানি হইল। ফলতঃ গর্ভাধান সংস্কার অতিপ্রধান সংস্কার। ইহার অননুষ্ঠানে দেহ অপবিত্র হয়। অনুষ্ঠান করিলে সুসন্তান ও পবিত্রসন্তান জন্মে। এ উপলক্ষে ও হিন্দুপরিবারের মধ্যে ভোজ ও সঙ্গীতাদি হইয়া থাকে, কিন্তু সে কেবল স্ত্রীলোকদিগের প্রমোদার্থ।

পতি নিকটে থাকিয়া যদি ঋতুর পর চতুর্থ দিবসে পত্নীর ঋতুস্নানানন্তর পত্নীতে উপগত না হন, তাহা হইলে তিনি নরকস্থ ও ব্রহ্মহা হন। ইহার অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে, প্রকৃতি যে ক্ষেত্রকে সন্তানোৎপাদনের যোগ্য করিয়া দিলেন, সে ক্ষেত্রে বীজবপন না করিলে সম্ভাবিত প্রজার হানি করা হইল; অপিচ এইকালে স্ত্রীলোকের পুরুষ সংসর্গ প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয়, পতি সে প্রবৃত্তি চরিতার্থ না করিলে অবলাকে যন্ত্রণা দেওয়া হয় এবং হয়ত তাহাকে সতীত্ব নষ্ট করিবার অবসরও দেওয়া হয়। এই জন্য ঋতুমতী স্ত্রীতে ঋতুস্নানের পর উপগত না হইলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয় বলিয়া শাস্ত্রে উদিত হইয়ছে। এ স্থলে ঋতুস্নাতা পত্নীতে উপগত না হইলে যে পাপ হইবে, সে পাপ পতির না হইয়া রাজারই হইবে যাঁহার ব্যবস্থানুসারে পতিসংসর্গ করিতে পারিবে না। আমরা এ কথা বলিয়া রাজাকে পাপের ভয় দেখাই না; কারণ, রাজাকে এরূপ ভয় দেখান আর গোহত্যাকারী ব্রাহ্মণ দস্যুকে যে পাপের ভয় দেখাইয়াছিল, এতদুভয়ই সমান।

এক ব্রাহ্মণ দৈবাৎ একটি গোবধ করিয়া ফেলিয়াছিল, ফেলিয়া বড়ই কাতর হইল এবং কিসে এই পাপ হইতে অব্যাহতি পাইব, তাহা ভাবিয়া আকুল হইল। ব্রাহ্মণ নিরন্তর এই চিন্তা করে; সুতরাং নিদ্রাবস্থায় তাহার মনে হইত, অর্থাৎ সে স্বপ্ন দেখিত যেন তৎকর্ত্তৃক নিহত সেই গরু তাহার কর্ণমূলে গাঁ গাঁ শব্দ করিত। উপর্য্যুপরি

তিন চারি দিন এইরূপ ঘটনা হইলে, ব্রাহ্মণ যারপরনাই ভীত হইয়া এক অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে এই উৎপাতের নিবৃত্তি হয়!" অধ্যাপক কহিলেন, "তুমি গোবধ প্রায়শ্চিত্ত কর, করিলেই নিবৃত্তি হইবে।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "প্রায়শ্চিত্তে কত ব্যয় হইবে?" অধ্যাপক, চারি পাঁচ টাকা যাহা হয় বলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার ত এই অর্থের সঙ্গতি নাই?" অধ্যাপক কহিলেন, "ভিক্ষা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ কর।" ব্রাহ্মণ অনেক দূর গমন ও বহু পর্য্যটনের পর আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন, পথিমধ্যে দস্যু হস্তে পতিত হইলেন। দস্যুরা ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই চীৎকার করিয়া বলিল, "কিরে বেটা বামন! তোর কাছে কি আছে দে।" ব্রাহ্মণ ভয়ে কাতর হইয়া বলিলেন, "ভাই! আমার ত কিছু নাই, ভিক্ষা করিয়া এই কয়েকটি টাকা প্রায়শ্চিত্ত করিব বলিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি।" দস্যুগণ বলিল, "দে বেটা দে, যা আনিয়াছিস্ তাই দে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আচ্ছা আমি দিতেছি; কিন্তু আমার পাপ টুকু তোমা-দিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।" দস্যুগণ বিরক্ত হইয়া বলিল, "দে বেটা দে! তোর টাকা দে, পাপ ও দে! শীঘ্র দে, আর বকাইস্ না।" ব্রাহ্মণ আস্তে আস্তে টাকা কয়েকটি দস্যুগণের হস্তে দিয়া রিক্ত হস্তে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। রাত্রিকালে সেই দিন হইতে তাঁহার কর্ণকুহরে আর গরুর গাঁ গাঁ শব্দ হইল না। ব্রাহ্মণের ইহাতে বড়ই

শান্তি হইল ও একটি কৌতূহল ও হইল। কৌতূহল এই, তিনি মনে করিলেন, "গরুটা তবে দস্যুগণের কাণের কাছে ডাকে।" এই মনে করিয়া তিনি দস্যুগণকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন। দস্যুরা পুনরায় ব্রাহ্মণকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে বেটা, আজ আবার কি আনিয়াছিস্ ?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আজ ভাই কিছু আনি নাই, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি 'তোমরা ত আমার পাপ লইয়াছ, গরুটাও কালি হইতে আমার কাণের কাছে রাত্রিতে যেরূপ ডাকিত সেরূপ আর ডাকে না, তবে কি তোমাদের কাণের কাছে ডাকে' ? "দূর বেটা বামন ! আবার ডাকিবে কি ? সে পালে মিশিয়া গিয়াছে।" অর্থাৎ তাহারা কত শত গোহত্যা করিয়াছে, সেই নিহত গরুসমূহের পালে ব্রাহ্মণের গরুও মিশিয়া গিয়াছে ; সুতরাং সে আর ডাকে না। আমাদিগের রাজারও উপস্থিত অধর্ম্মাচরণে এইরূপ পাপের ভয়।

জাতকর্ম্ম।—এই সংস্কারে কোন বিশেষ আড়ম্বর নাই। পুত্র জন্মিলে শিশুর নাড়ীকাটা ও তাহাকে স্তন দিবার পূর্ব্বে পিতা স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া ব্রহ্মচারী বা কুমারী কন্যা বা গর্ভবতী স্ত্রী বা শ্রুতস্বধ্যায়শীল ব্রাহ্মণের দ্বারা মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ব্রীহি ও যবে শিশুর জিহ্বা মাজিয়া দেওয়াইবেন ; আবার মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক স্বর্ণ ঘৃত ও মধুদ্বারা শিশুর জিহ্বা মার্জ্জিত করাইবেন। তাহার পর পিতা নাড়ী ছেদ করিতে ও শিশুকে স্তন দিতে বলিবেন। পুত্র জন্মিলেই

কেবল এই সংস্কার করিতে হয়। কন্যার বিবাহ ও গর্ভাধান সংস্কার ভিন্ন আর কোন সংস্কার নাই, অর্থাৎ আর আর সংস্কার অমন্ত্রক করিতে হয়।

পুংসবণ।—পুত্রসন্তান জন্মিবে বলিয়া এই সংস্কার করা হয়। গর্ভ দুইমাস পূর্ণ হইলে, তৃতীয় মাসের আরম্ভে শুভদিনে পতি নিত্যকর্ম্ম সমস্ত সমাপনান্তে, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও অন্যান্য প্রাথমিক কতিপয় অনুষ্ঠান করিয়া কৃতস্নান-পত্নীকে আপনার দক্ষিণভাগে ও হোমের জন্য স্থাপিত অগ্নির পশ্চিমদিকে কুশোপরি পূর্ব্বাভিমুখী করিয়া উপবেশন করাইয়া মহাব্যাহৃতি হোম করেন। তাহার পর পতি উঠিয়া পত্নীর পৃষ্ঠদেশে দাঁড়াইয়া পত্নীর নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া "এ গর্ভে যেন পুত্র সন্তান জন্মে" এই প্রার্থনাত্মক মন্ত্র বিশেষ জপ করেন। ইহার নাম পুংসবনসংস্কার। এ সংস্কার এখন আর কাহারও দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না।

সীমন্তোন্নয়ন।—এই সংস্কার গর্ভের চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে কর্ত্তব্য। পুংসবনসংস্কার যদি না করা হইয়া থাকে, তবে প্রায়শ্চিত্তাত্মক মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া সীমন্তোন্নয়ন করিতে হয়। সংস্কার সকল অবশ্য কর্ত্তব্য। যে কন্যার পিতা যথাক্রমে সমস্ত সংস্কার না করিয়াছেন, তাহার ভ্রাতারা পিতার ধনে সে সমস্ত সংস্কার করিবেন। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও হোমাদি করিয়া কেশ রচনা বিশেষের নাম সীমন্তোন্নয়ন। এই সংস্কারও আজি কালি কেহ করেন না।

নামকরণ।—সন্তান জন্মিলে একাদশ দিবসে জন্ম-গৃহাভ্যন্তরে এই সংস্কারের অনুষ্ঠান করা হয়। কুমারের জন্মতিথি ও জন্মনক্ষত্র ও তিথিনক্ষত্রের দেবতা ও অপরাপর দেবতার হোম করিয়া কুমারের নাম রাখা হয়। আজি কালি এই সংস্কার পৃথক্ হয় না। অন্নাশনের এক অঙ্গ ক্রিয়ার ন্যায় অন্নাশন সংস্কারের সঙ্গে এই সংস্কারের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

অন্নপ্রাশন।—পুত্রসন্তানের ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে আর কন্যার পঞ্চম বা সপ্তম মাস বয়সে, প্রথমান্নভক্ষণ রূপ সংস্কার হইয়া থাকে। শুভদিনে পিতা স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি করিয়া বিরূপাক্ষ জপ ও মহাব্যাহৃতি হোম করেন; পরে পঞ্চপ্রাণের হোম ও শ্যাট্যায়ণ হোমাদি করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক কুমারের মুখে অন্নদান করিয়া থাকেন। কুমারীর অন্নাশনে শুভদিনে তাহার মুখে অন্নদান মাত্র; দৈব, পৈত্র্য কোন অনুষ্ঠান ইহাতে নাই। অন্নপ্রাশনে হিন্দু বড় উৎসাহ ও আনন্দ করেন। এই উপলক্ষে আঢ্যলোকদিগের বাটীতে নহবৎ বৈসে ও বাদ্যোদ্যম হয়, সামাজিক বিতরণ ও ভোজ হইয়া থাকে। সকল অবস্থার লোকেই এই উপলক্ষে ভোজ দিয়া থাকে। বালক বালিকার অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও বিবাহাদি সংস্কারে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ অর্থ দিয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। এখন যত লোক ভোজে আমন্ত্রিত হন, সকলেই প্রায় এইরূপ করিয়া থাকেন,—এই আশীর্ব্বাদক যৌতুক দান বলে। অন্নপ্রাশন বা উপনয়ন

অথবা পাকস্পর্শ উপলক্ষে আমন্ত্রিত হইলে, সে আমন্ত্রণ রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। আমন্ত্রিত ব্যক্তি কোন কারণ বশতঃ নিজে আমন্ত্রণ রক্ষায় অশক্ত হইলে, অপর কাহাকেও প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠাইতে বাধ্য হন; কেন না, পাছে আমন্ত্রণকর্ত্তা মনে করেন, যৌতুক দিবার ভয়ে আসিল না। এই যৌতুক দান প্রথা অতি কুপ্রথা। ইহাতে অনেকের ক্লেশ বৃদ্ধি হয়। যাহারা যৌতুক দিতে অশক্ত, অথচ বন্ধুতা বশতঃ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বাধ্য, তাহারা অতিশয় লজ্জাগ্রস্ত হইয়া আহার করিয়া মুখ ঢাকিয়া কোনরূপে চলিয়া আইসেন। যাহার প্রত্যুৎপন্নমতি আছে, সে কৌশল করিয়া আপন লজ্জা নিবারণ করে। যৌতুক দান ও গ্রহণ উভয়ই কুপ্রথা। কৃতি যেন টাকা কুড়াইবার জন্যই ভোজ দেন; কেন না, আমন্ত্রিতব্যক্তিদিগের আহার হইয়া গেলেই যাহার অন্নপ্রাশন হইল, সেই শিশুকে তাঁহাদের সমক্ষে আনিয়া উপস্থিত করেন। একব্যক্তি এইরূপ স্থলে যৌতুক দিবার সঙ্গতি নাই, আপন অসঙ্গতি গোপন করিবার নিমিত্ত শিশুটি তাঁহার সমক্ষে নীত হইবা মাত্র, "আবার এসেছ বাবা, আবার এসেছে বাবা!" বলিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলেন, ইহাতে উপস্থিত লোক-দিগকে বুঝান হইল, যে শিশুকে তিনি পূর্ব্বে দেখিয়া যৌতুক দিয়াছেন। এই প্রকার প্রতারণার অনুষ্ঠান ও লজ্জা হইতে আমন্ত্রিতগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কৃতির নিতান্ত উচিত যে শিশুকে আমন্ত্রিতগণের সম্মুখে

উপস্থিত না করেন। এক চতুর নিঃস্ব মুসলমান বড় বড় লোকের সাহচর্য্য করিত, করিয়া ভদ্রলোক বলিয়া পরিগণিত হইয়া বেড়াইত। বড় বড় নবাবদিগের সহিতই সর্ব্বদা থাকিত ও তাঁহাদিগের সহিত উত্তম খানা খাইত। এক দিবস একজন নবাব তাহাকে রহস্য করিয়া বলিলেন, "মিয়াসাহেব, তুমি একদিন আমাদিগকে খাওয়াও।" মুসলমান প্রত্যহ তাঁহাদিগের সহিত আহার করেন, সুতরাং এক দিবস খাওয়াইতে অস্বীকার করিতে পারিলেন না। খাওয়াইবেন স্বীকার করিয়া দিন ধার্য্য করিলেন। অনন্তর অবধারিত দিবসে নবাবেরা তাঁহাদের সহচর মুসলমানের বাটীতে যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবাবেরা কৌচ কেদারায় বসেন না, গৃহপীঠে বিস্তীর্ণ শয্যা হয় তদুপরি উপবেশন করেন।

আতিথেয়ের বাটীতে আসিয়া পাদুকা ত্যাগ করিয়া সকলে শয্যায় বসিলেন। আতিথেয় ইত্যবসরে সেই অতি মুল্যবান পাদুকাগুলি সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিলেন ও বিক্রয়লব্ধ অর্থে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়া নবাবদিগকে আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। নবাবেরা খাইতে আরম্ভ করিলেন এবং খাইতে খাইতে তাহাদিগের সহচরের ভূরি সাধুবাদ ও তাহার আয়োজনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সহচর মুসলমান বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন, "আপ্‌লোককে জুতিকা বদৌলৎ সে খেলাতা হোঁ" অর্থাৎ আপনাদিগের জুতার দৌলতে

আমি খাওয়াইতেছি। পরে আহারাবসানে পান তামাক খাইতে খাইতে অনেক হাস্য কৌতুকের পর যখন নবাবেরা উঠিয়া যান, কেহই তাঁহারা পাদুকা পান না। আতিথেয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "কেন, আমি ত বলিয়াছি, আপনাদিগের জুতার দৌলতে খাওয়াইলাম!" তখন নবাবেরা বুঝিতে পারিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। যৌতুক গ্রহণ করিয়া পুত্রের অন্নপ্রাশন, উপনয়ন বা বিবাহান্তে পাকস্পর্শ উপলক্ষে লোককে ভোজন করান এই রূপ ব্যবহার। এইরূপ জুতার দৌলতে না খাওয়ানই ভাল, অথবা যৌতুক দান গ্রহণের প্রথা একেবারে রহিত করা উচিত।

চূড়াকরণ।—বালকের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ষে এই সংস্কার হইয়া থাকে। পিতা কৃতস্নান ও কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হইয়া কার্য্যারম্ভ করেন। বিরূপাক্ষ জপ ও হোমাদি করিয়া যথাবিধি বালকের মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিয়া মধ্যস্থলে শিখা রাখিয়া দেওয়া হয়,—ইহার নাম চূড়াকরণ। আজি কালি ব্রাহ্মণের উপনয়নের সময়েই এই সংস্কার হইয়া থাকে।

উপনয়ন।—উপনয়ন অতি প্রধান সংস্কার। ইহা ব্রাহ্মণের গর্ভাষ্টম বা অষ্টম বর্ষে, ক্ষত্রিয়ের একাদশ বর্ষে, এবং বৈশ্যের দ্বাদশ বর্ষে কর্ত্তব্য। পিতা কৃতস্নান ও কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হইয়া অনেক প্রকার জপ হোমাদি করণান্তর বালককে যজ্ঞোপবীত ধারণ করাইয়া দেন। উপনয়ন উপ-

লক্ষে হিন্দু যথেষ্ট উৎসাহ ও আনন্দ করিয়া থাকেন। এ উপলক্ষে ও সামাজিক বিতরণ হয় এবং ভোজ ত আছেই। ভোজ যে আছেই, তাহার কারণ এই যে, হিন্দু দৈব পৈত্র্যে যে কার্য্য করেন, ব্রাহ্মণভোজন তাহার একটি অঙ্গ; যেহেতু দেবতারা হব্য ও পিতৃলোকেরা কব্য ব্রাহ্মণের মুখেই আহার করেন,—

"যস্যাস্যেন সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসা,
কব্যানিচৈব পিতরঃ কিম্ভূতমধিকন্ততঃ।"

অতএব দৈব পৈত্র্য কার্য্য করিয়া একটি কি দুইটি ব্রাহ্মণ-ভোজন না করাইলে, ক্রিয়া সাঙ্গ হয় না। এই একটি কি দুইটি ব্রাহ্মণভোজন উপলক্ষে এখন আচাণ্ডাল যাবতীয় লোক কৃতির পল্লিতে বাস করে, তদ্ভিন্ন অন্যত্র তাঁহার আত্মীয় পরিচিত লোক যত আছে, সকলকে ভোজে আহ্বান করা হয়।

নিষ্ক্রমণ।—চতুর্থ মাসে চন্দ্র সূর্য্য দর্শন করাইবার জন্য জন্মগৃহ হইতে জাতবালককে যে নিষ্ক্রমণ করিতে হয়, উহা নিষ্ক্রমণ নামক সংস্কার। এই সংস্কারেও বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধাদি করিতে হয় এবং স্বগৃহোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক শিশুকে চন্দ্র সূর্য্য দর্শন করাইতে হয়।

এই দশবিধ সংস্কার বর্ণিত হইল; এই সকল সংস্কার দ্বারা দ্বিজাতিগণের বীজ ও গর্ভজাত জন্য পাপসমূহ ক্ষয় হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের দেহ শুদ্ধি জন্য উপনয়ন ব্যতীত অপর সমুদয় সংস্কারই যথাকালে এবং যথাক্রমে

বিধেয়, কিন্তু তৎসমুদায় অমন্ত্রক করা কর্ত্তব্য। বিবাহসংস্কারই স্ত্রীলোকের বৈদিক উপনয়নসংস্কার। ইহাতে স্বামীর সেবাই গুরুকুলে বাস এবং গৃহকর্ম্মই সায়ংপ্রাতর্হোমরূপ অগ্নি পরিচর্য্যা। উপনয়ন ও বিবাহ এই দুইটি প্রধান সংস্কার। এই দুইটি ও অন্নাশন এবং গর্ভাধান এই চারিটি সংস্কার সকলে করিয়া থাকে। অপর কয়েকটির মধ্যে নামকরণ এবং চূড়াকরণ এবং সমাবর্ত্তন, অন্নপ্রাশন ও উপনয়নের অঙ্গক্রিয়ার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে; কেন না, ইহাদের পৃথক্ অনুষ্ঠান হয় না। অন্নপ্রাশনের সঙ্গে নামকরণ ও উপনয়নের সঙ্গে চূড়াকরণ ও সমাবর্ত্তন হইয়া থাকে। সমারোহ হইতেও এই চারি অর্থাৎ অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ও গর্ভাধান সংস্কারের সময়েই হইয়া থাকে।

গর্ভাধান যদি চ অতি প্রধান ও অবশ্য কর্ত্তব্য সংস্কার; কিন্তু ইহার অনুষ্ঠানে অধিক বাহ্যাড়ম্বর করা যাহাতে ইহা পুরুষমণ্ডলীর বা উদাসীনব্যক্তিগণের গোচর হয়, নিতান্ত অনুচিত ব্যবহার। এই ব্যাপার লইয়া হিন্দুমহিলারা বড় উৎসাহ ও আনন্দ করেন ও তদুপলক্ষে নৃত্য গীতাদি এবং ভোজের অনুষ্ঠান করেন, ইহা অতি নিন্দনীয়! এই জুগুপ্সিত ব্যবহারে হিন্দুপরিবারের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কেমন করিয়া অনুমোদন করেন, বলিতে পারি না। এই সংস্কার সম্বন্ধে স্ত্রীলোকদিগের অনুষ্ঠেয় কতকগুলি কার্য্য আছে, যাহা স্ত্রীলোকদিগের ভাষায় "নীত কীত" বলিয়া অভিহিত হয় এবং যাহা গর্ভাধান সংস্কারের অঙ্গ বলিয়া

পরিগণিত হয়। "নীত-কীতের" অর্থ হয়ত "নিত্য-কৃত্য" অর্থাৎ আবহমান কাল যাহা গর্ভাধান উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। আমাদিগের এই সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠানে কোন আপত্তি নাই; কিন্তু এই উপ-লক্ষে উৎসাহ ও আনন্দ করা ও ভোজনৃত্যগীতাদির আড়ম্বর করা বড় অপবিত্র ও অশ্লীল রুচির পরিচয় দেওয়া হয়! অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও বিবাহাদি সংস্কারের অনুষ্ঠানে কতক কতক কুপ্রথা কালক্রমে উদয় হইয়াছে, তাহারও উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে। অস্মদ্দেশের শিক্ষিত যুবক-দিগের সময়ে সময়ে সমাজসংস্করণের প্রবৃত্তি বড়ই প্রবল হইয়া উঠে; কিন্তু তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সমাজসংস্করণ নহে, সমাজবিপ্লব।

উপরি উক্ত শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য সকল যাহার অনু-ষ্ঠানে সমাজ দূষিত হইতেছে, যাহার অনুষ্ঠানে সমাজ অসম্ভব ও অতিরিক্ত ব্যয় করিতে বাধ্য হইয়া ক্রমশঃ নিঃস্ব ও দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, যাহার অনুষ্ঠানে অশ্লীল ও অপবিত্র রুচি জন্মিতেছে, এ দিকে তাঁহাদিগের দৃষ্টি নাই, এ সকল হয়ত সংস্করণীয় বলিয়া মনেই করেন না। তাঁহা-দিগের এক কথা বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দাও, বিবাহের যোগ্য বয়ঃক্রম যাহা শাস্ত্রে উদিত হইয়াছে, তাহার অন্যথা করিয়া যাহাতে পরিণত বয়সে বালক বালিকার বিবাহ হয়, তাহা কর। কেন যে এই পরিবর্ত্তনের জন্য এত আগ্রহ বুঝিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান রীতি প্রভাবে

যদি কোন বিশেষ অনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে পরিবর্ত্তন আবশ্যক স্বীকার করিতে পারা যায়। বিবাহের উদ্দেশ্য এই যে, স্ত্রী পুরুষে প্রণয়াবদ্ধ হইয়া অবিচ্ছেদে আমরণ দাম্পত্যসুখে কাল হরণ করিবে। হিন্দুরমণী যেমন পতি-পরায়ণা, পতির বশবর্ত্তিনী ও পতির মঙ্গলাকাঙ্খিনী হন, কোন জাতির রমণী এমন হন না। আমাদিগের সমাজ-সংস্কারকদিগের কি এইরূপ নিস্তেজপ্রভাশূন্যা পত্নী ভাল লাগে না? কোন ক্ষুদ্র জলাশয়ে এক বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড ভাসিত এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া কতকগুলি ভেক সেই জলাশয়ে থাকিত। ভেকেরা কাষ্ঠখণ্ডকে তাহা-দিগের রাজা বলিয়া জানিত, রাজার উপর চড়িয়া বসিত ও যাহা ইচ্ছা রাজাকে লইয়া তাহাই করিত। অনেক দিন এই ভাবে চলিলে পর, ভেকেরা রাজার কোন তেজ বা বীর্য্য নাই দেখিয়া বিরক্ত হইয়া ভগবানের নিকট রাজান্তর প্রার্থনা করিল। ভগবান, সারসপক্ষীকে ভেকরাজ নিয়োগ করিয়া পাঠাইলেন। সারসরাজ রাজাসনে বসিয়াই ভেক সকল ধরিয়া ধরিয়া খাইতে লাগিলেন এবং অনতিদীর্ঘ-কাল মধ্যে যাবতীয় প্রজা উদরস্থ করিয়া অচিরাৎ তাঁহার কার্য্যের অবসান করিলেন। আমাদিগের সমাজ সংস্কারক-দিগের এই দশা ঘটিবে বলিয়া বোধহয়। বাল্যবিবাহে পত্নী যে যারপর নাই পতিপ্রাণা ও পতির অনুগতা হয়, তাহার জাজ্জ্বল্যপ্রমাণ হিন্দুরমণী। হিন্দুকুলকামিনীর সকল বিষয়ের অবধি অর্থাৎ সীমা আছে; কেবল তাহার

প্রেমের অবধি কি সীমা নাই।

"সঞ্চারো রতিমন্দিরাবধি সখী কর্ণাবধিব্যাহৃতং,
হাস্তঞ্চাধর পল্লবাবধি মহানোনহ্পি মৌনাবধি।
চেতঃকান্ত সমীহিতাবধি পদন্যাসাবধি প্রেক্ষণং,
সর্ব্বংসাবধি কেবলং কলভুবাং প্রেম্নোঃ পরংনাবধি।"

তাঁহার যাতায়াত, গমনাগমনের সীমা রতিমন্দির পর্য্যন্ত, অর্থাৎ যে মন্দিরে বা গৃহে পতির সহিত সহবাস করেন। বাক্যালাপের সীমা সখীর কর্ণ অবধি, অর্থাৎ সখীর কাণে কাণে ভিন্ন কথা আর কাহার সহিত কহেন না। হাস্যের সীমা অধর পল্লব পর্য্যন্ত, অর্থাৎ দশনাবলী বিস্তার করিয়া উচ্চরবে হাস্য কখন করেন না। ক্রোধের সীমা মৌনাবস্থা, অর্থাৎ অতিশয় ক্রোধ হইলে হাত পা ছুড়িয়া মাথা ঘূরাইয়া চীৎকার বা মহা আস্ফালন না করিয়া একান্তে মৌনী হইয়া বসিয়া থাকেন। চিত্তবৃত্তির অনুশীলন আপনার পতির কথা লইয়া আন্দোলন করা, মনোমধ্যে আর কোনও বিষয়ের আন্দোলন নাই। ঈক্ষণ অর্থাৎ দৃষ্টির সীমা পাদ-বিক্ষেপ ভূমি পর্য্যন্ত, অর্থাৎ চলিয়া যাইবার সময় পথের প্রতি যাহা দৃষ্টি করেন, তদ্ভিন্ন আর কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত নাই। এইরূপে হিন্দুমহিলার সকল কার্য্যেরই সীমা আছে, কেবল তাঁহার প্রেমের কোন সীমা নাই। প্রেমের অনুরোধে আহারত্যাগ, নিদ্রাত্যাগ, প্রাণত্যাগ, জ্বলন্ত চিতানলে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন। ফলতঃ আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া পতি ও সন্তান সন্ততির

সুখের জন্য ব্যাকুল হইতে হিন্দুরমণী ভিন্ন আর কাহাকেও দেখা যায় না।

অনেকে আপত্তি করেন, যে বাল্যবিবাহ বালকের বিদ্যাভ্যাসের এক প্রধান অন্তরায়। কিয়ৎপরিমাণে যে বাল্যবিবাহ বালকের বিদ্যাভ্যাসের বিঘ্ন করে, তাহার অপলাপ করা যাইতে পারে না। এই জন্যই মানবধর্ম্ম-শাস্ত্রে সমাবর্ত্তনের পর অর্থাৎ সম্পূর্ণ বেদগ্রহণের পর দার-পরিগ্রহের ব্যবস্থা আছে। এখন বেদাধ্যায়ন নাই, বেদা-ধ্যায়নের পরিবর্ত্তে ইংরাজীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইংরাজীশিক্ষার অবসানে বিবাহের অনুষ্ঠান হইলেই ভাল হয় বটে ; কিন্তু বাল্যবিবাহে যে একেবারে বিদ্যাভ্যাস রোধ হয়, এ কথা নিতান্ত অগ্রাহ্য। লেখক ত কুসংস্কারাপন্ন বুড়া পাগল, নিজেরও বাল্যবিবাহ হইয়াছে এবং তাঁহার সাত আটটি পুত্র সকলেরই বাল্যবিবাহ হইয়াছে। সকলেই বিবাহের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং উত্তরোত্তর উচ্চতর পরীক্ষা সকলে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মধ্যমটি প্রবেশিকা ও তাহার পর এল, এ, পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় পরীক্ষোত্তীর্ণবালকের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হন ও বি, এ পরীক্ষায় পঞ্চম হন এবং পরিশেষে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মুনসেফী কার্য্য করিতেছেন। চতুর্থ পুত্রও এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং সকলেই বি, এ, পরীক্ষো-পযোগী বিদ্যা লাভ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পৌত্রটির বাল্য বিবাহ হইয়াছে ; কিন্তু তিনিও বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হইয়াছেন। অতএব বাল্যবিবাহ যে বিদ্যাভ্যাসের অন্তরায়, এ কথা নিতান্ত অমূলক; প্রত্যুত যেমন বলা গিয়াছে, বাল্য-বিবাহ অযোনিশুক্রপাত ও বারাঙ্গনাসংসর্গের পথ অবরোধ করে। যেমন অর্ণবযান যখন যাত্রী ও বাণিজ্যদ্রব্যজাতে পূর্ণ না হয়, তখন সমুদ্রের জলে ভাসিয়া টল্ মল্ করিয়া ভাল চলিবে না বলিয়া সেই যানের খোলে প্রস্তর খণ্ড দিয়া তাহাকে স্থির করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ যুবকদিগের যৌবনসুলভ চাঞ্চল্যকে স্থির করিবার একটি উপায় এই বাল্যবিবাহ।

বিবাহ করিয়া যুবক সংসারে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। এ বন্ধন না থাকিলে, যুবক ইতস্ততঃ করিয়া বেড়ান, সংসারে কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন শীঘ্র স্থির করিতে পারেন না। বৈরাগ্য আশ্রয় করিবেন, কি পরিব্রাজক হইয়া দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিবেন, কি নাবিক হইবেন, কি সৈনিক হইবেন, কিছুই স্থির করিতে পারেন না; অথবা কখন এক পথ অবলম্বন করেন, আবার অবিলম্বে তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য-পথে ধাবমান হন। বিবাহিতযুবক কৃতবিদ্য হইয়া সংসারে প্রবেশ করিবার সময় আর ইতস্ততঃ করেন না, কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, ইহা তাঁহার স্বেচ্ছার আয়ত্ত নহে, পূর্ব্বে হইতেই তাঁহার পথ স্থির হইয়াছে। তিনি সংসারী গৃহস্থ হইয়াছেন আর এদিক ওদিক করিবার যো নাই। কৃতবিদ্য হইবার অর্থাৎ অধ্যয়ন শেষ হইবার পূর্ব্বে যৌবনসুলভ চাঞ্চল্যবশতঃ কত যুবক কত প্রকার অবিমৃষ্যকারিতা

করিয়া কত কষ্ট ভোগ করেন। বিবাহিত যুবকের সে ভয় থাকে না। অধ্যয়ন করিতে করিতে অর্থাৎ পঠদ্দশাতে বিবাহ হইলে যদি কখন পাঠের কোন সামান্য বিঘ্ন হয়, আর যদি সেই বিবাহে পতিব্রতা রমণী লাভ হয় এবং বাল্য-প্রলোভনের হাত হইতে যদি পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তবে সে পাঠের বিঘ্ন পরম মঙ্গলের নিদান এবং বাল্য-বিবাহই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। শিক্ষিতযুবকদিগের বাল্য-বিবাহে আর একটি বিশেষ আপত্তি আছে। তাঁহারা বলেন, "দম্পতির অপরিণত বয়সে যে সন্তান জন্মে, সে স্বভাবতঃই হীনবীর্য্য রুগ্ন ও অল্পায়ুঃ হয়।" এখানেও আবার সেই বিপত্তি! কে বলিবে যে এই সময়ে অর্থাৎ এত বয়সে দম্পতি অপত্যোৎপাদনের পক্ষে পরিণত বয়স্ক। বিজ্ঞানের কি অধিকার যে তিনি এ কথা নির্দ্দেশ করিবেন? কোন্ যন্ত্র দ্বারা তিনি এই বয়সের পরিমাণ করিতে পারেন? তিনি হয় ত বারংবার লক্ষ্য করিয়াছেন যে এত বয়সের দম্পতির সন্তান দ্রঢ়িষ্ট, বলিষ্ঠ, সুস্থ ও দীর্ঘায়ুঃ হইয়াছে ও এত বয়সের সন্তান তদ্বিপরীত অবস্থাপন্ন হইয়াছে। এতদিরিক্ত বিজ্ঞানের আর কি বল আছে? কিন্তু সন্তানের অবস্থাগত ভেদ নানা কারণে হইতে পারে। পিতামাতার বয়সের ন্যূনাধিক্য যে এক মাত্র কারণ, তাহা নহে। নারী ঋতুমতী হইলেই প্রকৃতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেন, ঐ দেখ, ক্ষেত্র প্রস্তুত, বীজ বপন কর, নারী এখন গর্ভধারণক্ষম। এই অভ্রান্তনিদর্শনই আমাদিগের

এ পথের এক মাত্র নেতা। ফলতঃ পাঠক যদি কিছু অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখেন, বুঝিতে পারিবেন যে, জীবের শরীর পোষণ ও বংশবৃদ্ধি যাহা দ্বারা সৃষ্টি রক্ষা হয়, প্রকৃতি জীবের তর্ক ও বিচারাধীন করেন নাই, অর্থাৎ আহার ও স্ত্রীসংসর্গ করা উচিত কি না, তাহা তর্ক ও বিচার করিয়া জীবকে স্থির করিতে হয় না। নিজের সৃষ্টি রক্ষা হইবে বলিয়া প্রকৃতি জীবকে এমন এক এক বৃত্তি দিয়াছেন, যে তাহার উত্তেজনায় তাঁহাকে যথাযথ আহার করিয়া দেহ রক্ষা ও স্ত্রীসংসর্গের দ্বারা প্রজা বৃদ্ধি করিতে হইবেই হইবে। এমন কি, এই সংসর্গের যোগ্যকাল পর্য্যন্ত প্রকৃতি চিহ্ন বিশেষ দ্বারা দেখাইয়া দেন, তর্ক ও বিচার দ্বারা তাহা নির্ণয় করিবার আবশ্যকতা থাকে না। কার্য্যতঃ দেখা যায়, যে দম্পতির প্রথম সংসর্গের ফলরূপ যে সন্তান, সে প্রায় পুষ্টকায়, দৃঢ়িষ্ঠ ও সুস্থ হইয়া থাকে। তাহার পর উত্তরোত্তর যত অধিক সন্তান হয়, তত দুর্ব্বল, রুগ্ন ও অল্পায়ুঃ হয়। ইহার কারণ শাস্ত্রোপদেশের অন্যথাচরণ। এতৎসম্বন্ধে মনুর কি উপদেশ, পাঠক শ্রবণ করুন। অপত্যোৎপত্তি না হইলে ঋতুকালে অবশ্যই স্ত্রীগমন করিবে। কদাচ ঋতুকাল উল্লঙ্ঘন করিবে না। ঋতুকাল ভিন্ন অন্যকালেও ভার্য্যার তৃপ্ত্যর্থে রতি কামনায় স্ত্রীতে উপগত হইতে পারে; কিন্তু কি ঋতুকাল কি অন্য সময়, অমাবস্যাদি পর্ব্বদিন বর্জ্জন করিবে। শিষ্টনিন্দিত প্রথম চারি অহোরাত্র লইয়া স্ত্রীলোকের ঋতুকাল:

স্বাভাবিক অবস্থায় ষোড়শ অহোরাত্র; তন্মধ্যে প্রথম চারি অহোরাত্র, একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি, এই ছয় রাত্রি স্ত্রী-গমন নিষিদ্ধ। অবশিষ্ট দশরাত্রি স্ত্রীগমনে প্রশস্ত। এই দশ রাত্রির মধ্যে আবার ছয়, আট, দশ প্রভৃতি যুগ্ম-রাত্রিতে স্ত্রীগমন করিলে পুত্র এবং পাঁচ, সাত প্রভৃতি অযুগ্মরাত্রিতে স্ত্রীগমন করিলে কন্যা জন্মে। এ কারণ, পুত্রার্থী ব্যক্তির পক্ষে ঋতুকালে যুগ্মরাত্রিতেই স্ত্রীগমন বিধেয়। অযুগ্মরাত্রি হইলে ও পুরুষের বীর্য্যাধিক্যে পুত্রসন্তান জন্মে, যুগ্মরাত্রি হইলেও স্ত্রীর বীর্য্যাধিক্যে কন্যা সন্তান জন্মে এবং উভয়ের বীর্য্য সাম্য হইলে ক্লীব অথবা যমজপুত্র কন্যা হয়; আবার যদি উভয়েরই বীর্য্য অসার বা অল্প হয়, তাহা হইলে গর্ভ হয় না। যিনি পূর্ব্বোক্ত নিন্দিত ছয় রাত্রি, ও অনিন্দিত দশ রাত্রির মধ্যে যে কোন অষ্ট রাত্রি, এই চতুর্দ্দশ রাত্রিতে স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট পর্ব্ব বর্জ্জিত দুইরাত্রি স্ত্রীগমন করেন, তিনি যে কোন আশ্রমবাসী হউন না কেন, তিনি ব্রহ্মচারীই থাকেন, তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের কোন হানি হয় না। এই নিয়মে স্ত্রী-গমন করিলে, স্ত্রীর ঘন ঘন গর্ভধারণও হয় না ও তন্নিবন্ধন সন্তান দুর্ব্বল, অপুষ্ট ও রুগ্ন এবং অল্পায়ুঃ হয় না।

অতএব আমাদিগের শিক্ষিত যুবকেরা যাহাকে বাল্য-বিবাহ বলেন, তাহা হইতে বাস্তবিক কোন অনিষ্ট হয় না; প্রত্যুত তদ্বারা অনেক ইষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদিগের নিতান্ত আগ্রহ যে বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দেন।

হিন্দুসমাজের ভাগ্যক্রমে অনাবশ্যক সংস্কারই ঘটিয়া থাকে। যুবকই ব্রতী হউন আর পরিণত বয়স্ক প্রবীন ব্যক্তিই ব্রতী হউন, অনাবশ্যক সংস্কার ভিন্ন আবশ্যক সংস্কার হিন্দুসমাজের অদৃষ্টে কখন ঘটে না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া সহমরণ প্রথা রহিত করিলেন। এই প্রথাতে সমাজের যে কি বিশেষ অনিষ্ট হইতেছিল এবং ইহা রহিত হইয়া কি পরম কল্যাণ হইল, তাহা অনুভব করিতে পারা যায় না। রাজা মহাশয় ও যাঁহারা তাঁহার মতাবলম্বী, বোধ হয় এতৎসম্বন্ধে যে ইষ্টানিষ্ট, তাহা জাজ্বল্যমান দেখিতেন ও হিন্দুদিগের তৎ-সম্বন্ধে ঔদাস্য ও বিমূঢ়তা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতেন। তাঁহারা দেখিতেন, যে একটা অল্পবুদ্ধিস্ত্রীলোক শাস্ত্রের কল্পিত সুখের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া সংসারের অশেষ প্রকার ভোগ, পৃথিবীর বিবিধ রসাস্বাদ, বিচিত্র শোভা সন্দর্শন, অমৃতায়মান মধুর সঙ্গীতের ধ্বনিপ্রবাহে কর্ণবিবরের পরিতৃপ্তি, সিতরশ্মির শুভ্র সমুজ্জ্বল সুশীতল সুকোমল রশ্মিতে অঙ্কিত সন্ধ্যানিলের হিল্লোল সেবন এবং সেই সঙ্গে হৃদয়বন্ধুর সংসর্গ ভোগ প্রভৃতি সংসারের অশেষ প্রকার ভোগ * বিসর্জ্জন করিয়া জীবন্ত পুড়িয়া মরিতেছে! ইহা অতি

---

* মানুষের ভোগ্য বিষয় সম্বন্ধে লেখকের একটি গান আছে, সেইটি এখানে উদ্ধৃত হইল।

বারোঁয়া।

ক'রেছ কতই আয়োজন,

অধমে তুষিতে এত কেন গো যতন?

নৃশংস ব্যাপার! জীব এমন দারুণ কষ্টে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, ইহা সহৃদয়ব্যক্তি মাত্রেরই অসহ্য। অতএব যে প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া জীব এইরূপ আচরণ করে, তাহা রহিত করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন অধ্যবসায়শীল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। নানা ভাষায় বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন এবং ইংরাজীতে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। যদিও রাজা স্বাধীন চিন্তাক্ষম ছিলেন এবং কোন বিষয় সম্বন্ধে কাহারও কোন মত শুনিলে তাহা যে অতর্কিত ভাবে গ্রহণ করিতেন এমত নহে, নিজে বিচার করিয়া বুঝিয়া সে মত গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিতেন; কিন্তু ইংরাজীর অধিক আলোচনা করাতে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি যেন কিঞ্চিৎ আবিল হইয়াছিল; আবিল নহে, বুদ্ধিবৃত্তিতে ইংরাজী ধাতুর অধিক মিশ্রণ হওয়াতে তাহার স্বাধীন ভাবের কিছু বিকার হইয়াছিল। সতীর সহমরণ তিনি যেমন নৃসংশ ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেন, হিন্দু সেরূপ মনে করেন না। হিন্দু সহমরণ

কুসুম সুষমা হেরি, সৌরভ আঘ্রাণ করি,
স্নিগ্ধ অনিল করি সুখেতে সেবন।
ধ্যানস্থ হ'লে যে রবে হৃদি শান্তি অনুভবে,
তুল্য শান্তিপ্রদ রব ঝিল্লি করে অনুক্ষণ।
আবার রসনা প্রীতি লভিতে গায় এ গীতি,
কৃতজ্ঞতা-পুণ্য-রস করি আলম্বন।
একি সুখ, কি সম্পৎ, পঞ্চেন্দ্রিয় যুগপৎ!
বিবিধ বিধানে সদা হ'তেছে রঞ্জন।

কালে সতীকে অসাধারণ বীর বলিয়া দেখেন। তিনি দেখেন, এই রমণী কেমন অবলীলাক্রমে সমস্ত মায়ার বন্ধন ছেদ করিয়া পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, দুহিতা কাহাকেও গণনা না করিয়া, যাবতীয় সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া যাঁহাকে দেবতা বলিয়া জানেন, তাঁহার পরমগতি পতিকে উপাসনা করিতে, বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিতা হইয়া, ললাটে সিন্দুর ধারণ করিয়া এবং অলক্তকে চরণ রঞ্জিত করিয়া অকুতোভয়ে জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিতেছেন ! কি ভয়ঙ্কর ব্যপার ! পাঠক, তোমার শরীর কি রোমাঞ্চিত হইতেছে না? একি মানুষী না দেবী ! এই দর্শনে দেবতারা মুগ্ধ হইয়া পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভিধ্বনি করেন। হয়ত সেই জগৎমাতা সতী তাঁহার ধর্ম্ম আচরণ করিতেছে বলিয়া, একবার প্রীতি-বিস্ফারিত লোচনে সেই চিতানলের উপর দৃষ্টিপাত করেন, সেই জন্য দশদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ধন্য সতী ! ধন্য হিন্দু ! ধন্য ধরা ! তুমি ধরা নও মা, এমন রমণী যে ধরে, সে ধরা নয়—সে প্রবরালোক,সে স্বর্গ। হিন্দুকে ধন্য বলিলাম এই জন্য, যে হিন্দুর ধর্ম্ম আচরণ করিয়া এমন বীরের ন্যায় রমণী ভারতে সমদ্ভূত হইতেছে। শাস্ত্রে কথিত আছে, যে নারী স্বামীর মৃত্যু হইলে তাঁহার সহানুগমন করেন, তিনি মানবদেহে যত লোম আছে, তত বর্ষ ব্যাপিয়া অর্থাৎ সার্দ্ধত্রিকোটীবর্ষ পতি সহ স্বর্গবাস করেন। ব্যালগ্রাহী অর্থাৎ সাপুড়েরা যেমন গর্ত্ত হইতে সাপ টানিয়া বাহির করে, তেমনি সতীনারী পতিকে উদ্ধার করিয়া পতি সহ স্বর্গে

সুখভোগ করেন। এই নারী পিতৃ, মাতৃ ও শ্বশুরকুল পবিত্র করেন এবং ব্রহ্মঘ্ন, কৃতঘ্ন, বিপ্রঘ্ন প্রভৃতি মহাপাপী সকলকে পবিত্র করেন। সাংসারিকসুখের মধ্যে দাম্পত্য-সুখের ন্যায় আর সুখ নাই। পতিবিয়োগে যখন এই সুখের পরিণাম কি উপলব্ধি হইল, তখন সেই বিষময় অমৃতের জন্য আবার কে লালাইত হয়? আর মৃতপতির সহানুগমন করিলে যখন পূর্ব্বোক্ত প্রকার উচ্চাধিকার হয়, তখন নিতান্ত ভোগাশক্ত ও পশুভাবাপন্নলোক ভিন্ন আর কে সেই ভোগের অভাবে কাতর হয়? ফলতঃ সতীর পতিসহানু-গমন কোন ক্রমেই জুগুপ্সিত ব্যাপার নহে, কুপ্রথা নহে। ইহা রহিত করিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না, রহিত করিয়া সমাজের কোন বিশেষ মঙ্গল সাধিত হয় নাই। প্রত্যুত মধ্যে মধ্যে এক একটা সতীর সহমরণ হইলে, অপর নারীগণের সতীত্বের যে উদ্দীপন হইত এবং পুরুষগণ ত্যাগশীলতা সম্বন্ধে যে শিক্ষা পাইত, সেইটি রহিত হইয়াছে।

হিন্দুমহিলা এই সহমরণের অনুষ্ঠানে ও আমরণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ত্যাগশীলতাদি ধর্ম্মের এবং সতীত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। সংস্কারের অনুরোধে একবার বিবাহ সকলকেই করিতে হয়; কিন্তু বিবাহ করিয়া বিবাহের উদ্দেশ্য সাধন হইলে, অর্থাৎ পুত্র জন্মিলে তাহার পর যদি পতি কি স্ত্রীর বিয়োগ হয়, তাহা হইলে আবার বিবাহ করিয়া পশুবৃত্তি সকল জাগরূক রাখা ও তাহাদিগকে

পরিপুষ্ট করা কেবল পশুভাবাপন্ন লোকের কার্য্য। পশু-বৃত্তি সকল দমন করিয়া আধ্যাত্মিকবৃত্তি সমূহের স্ফূর্ত্তি করা হিন্দুর একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উচ্চ আদর্শর সহিত সহানুভূতি হিন্দু অর্থাৎ প্রকৃত হিন্দু ভিন্ন আর কাহারও হইতে পারে না। প্রকৃত হিন্দু অর্থাৎ যে হিন্দু বিজাতীয় বিদ্যার আলোচনায় ও বিজাতীয় লোকের সংসর্গে বিকৃত হয় নাই। ত্যাগ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহাদি কঠোর ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে কখন কখন পাদস্খলন হওয়া অসম্ভাবিত নহে; কিন্তু সেই জন্য এই সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান যে দোষাবহ, তাহা কোন মতে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। হিন্দু-মহিলার পতিবিয়োগ হইলে, এক এই সহমরণ ব্যবস্থা, আর দ্বিতীয় কল্প, আমরণ ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ চিরবৈধব্য। সতী মৃত-পতির সহানুগামিনী হইলে ত্রিকুলপাবনী হইবেন। ব্রহ্মঘ্ন, কৃতঘ্ন, মিত্রঘ্ন প্রভৃতি মহাপাতকিদিগের পবিত্রকারিণী ও সার্দ্ধত্রিকোটী বর্ষ পতিসহ স্বর্গবাসের অধিকারিণী হইবেন। ইহা দেখিয়া অপর রমণীগণের হৃদয়ে পাতিব্রত্যের প্রতি বিজাতীয় অনুরাগ জন্মে এবং যদিও বীরত্ব দেখাইতে অসমর্থা হয়, তথাপি তাহাদিগের পতিপরায়ণতার চূড়ান্ত শিক্ষা হয় এবং সেই জন্য হিন্দুমহিলাদিগকে এত পতিপ্রাণা হইতে দেখা যায়। বিধবারা ত দেবী বিশেষ। পুরুষসংসর্গ তাহারা একেবারে ভুলিয়া যায়, একবার হবিষ্যান্ন মাত্র তাহাদিগের আহার, আর বেশভূষা কেশবিন্যাস সকল প্রকার বিলাস ও ভোগ বিসর্জ্জন দিয়া নিরন্তর আত্মপরি-

বারের সেবা শুশ্রূষা ও দেব দেবীর পূজার্চ্চনা ও তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া কাল যাপন করেন। তাঁহাদিগের ত্যাগ ও জিতেন্দ্রিয়তা আশ্চর্য্য ব্যাপার! হিন্দুব্রহ্মচারিণী অর্থাৎ বিধবা, ব্যভিচারিণী ও ভ্রূণঘাতিনী হইয়াছেন শুনা গিয়াছে; কিন্তু সে ঘটনা অতি বিরল; এবং যাহারা ব্যভিচারিণী বা ভ্রূণঘাতিনী হইয়াছে, তাহাদিগের অভিভাবকদিগের অনবধানতাতেই সেরূপ ঘটনা হইয়াছে। এই হত-ভাগিনীগণ ব্যভিচারদোষ নিবন্ধন জাতিভ্রষ্ট হয় এবং সাধুসমাজ তাহাদিগকে এক কালে বর্জ্জন করেন,—সুতরাং তাহাদিগের দুঃখের এক শেষ হয়। স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর দয়ার অবতার ছিলেন। তিনি হতভাগিনী-দিগের এই দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া হিন্দুবিধবার পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্রসম্মত ইহা ঘোরতর বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিলেন। বিপুল অর্থব্যয়-সাপেক্ষ কার্য্য, তাঁহার পরিমিত অর্থে কতদিন কার্য্য চলিতে পারে? কতকগুলা বিধবার বিবাহ দেওয়াইলেন বটে, কিন্তু অর্থের আনুকূল্য কেহই করিল না, তাঁহার নিজের অর্থ সমস্ত এই কার্য্যে পর্য্যবসিত হইল, বিধবার পুনর্ব্বিবাহ সার্ব্বভৌমিক প্রথা করিয়া তুলিতে পারিলেন না। বিদ্যা-সাগর সমাজের উপকার বুদ্ধিতে এত ব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া বিফল প্রযত্ন হইলেন, ইহাই আমাদিগের ক্ষোভের বিষয়; নতুবা বিধবাবিবাহ যে প্রচলিত হইল না, সে জন্য আমাদিগের কোন কষ্ট নাই; কেননা আমাদিগের সমাজ

এ উপকার চায় না; হিন্দুমহিলার জগদ্ব্যাপিনী সতীত্বের খ্যাতি অপ্রতিহত রহিল, ইহাই আমাদিগের আনন্দ। রাজা রামমোহন রায় ও মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে অনাবশ্যক সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহাতে যদিও তাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন; কিন্তু সমাজের বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। ফলতঃ এই মহাত্মাদ্বয় তাঁহাদিগের নিজ নিজ উদ্ভাবিত সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য যে এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে, তাঁহারা অধিক ইংরাজী চর্চ্চা করিয়া ও ইংরাজের সহিত সংসর্গ করিয়া কেবল যে ইংরাজের ন্যায় চিন্তা ও ভাবনা করিতেন ও ইংরাজের ন্যায় বিচার করিতেন, তাহা নহে; যাহাদিগের সম্বন্ধে তাঁহারা চিন্তা, ভাবনা ও বিচার করিতেন, তাহাদিগকেও ইংরাজী করিয়া তুলিতেন অর্থাৎ হিন্দুরমণীগণকে তাঁহারা বিবী ভাবিতেন। বিবীগণ নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া কিছু লঘুপাক দ্রব্য আহার না করিয়া শয্যা হইতে সমুত্থিত হইতে পারেন না ও তাঁহাদিগের সমস্ত দিন শরীর মার্জ্জন, শরীর পোষণ, ইন্দ্রিয়সেবা ও বেশবিন্যাস কিম্বা সমাচারপত্র বা উপন্যাসাদি পাঠ ভিন্ন আর অপর কার্য্য নাই ও তাঁহাদিগের পতিসহবাস সম্বন্ধে কোন নিয়ম বা বিশেষ বিধি নাই। তাঁহাদিগের পক্ষে মৃতপতির সহানুগমন ও চিরবৈধব্য দারুণ নিগ্রহ! তাহা কি কাহাকেও বলিয়া দিতে হয়? কিন্তু যে রমণী প্রাতঃস্নান করিয়া পূজা, জপ ও অপর ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া

অতিথি অভ্যাগত ও অবশ্য ভরণীয়বর্গকে আহার করাইয়া বেলা তৃতীয়প্রহরে কিঞ্চিৎ আহার করে, ও যাঁহার পতিসংসর্গের নিয়ম এত কঠিন, যে তাহা পালন করিলে ব্রহ্ম চর্য্যেরও বাধ হয় না, তাঁহার পক্ষে বৈধব্য কি এমন কঠোর অনুষ্ঠান? আর মৃতপতির সহানুগমনেই বা তাঁহার কি এমন দারুণ কষ্ট? এইজন্য চিরবৈধব্য ও মৃতপতির সহানুগমন বিষয়ক সংস্কারকে আমরা অনাবশ্যক সংস্কার বলিতে বাধ্য হইয়াছি। বিজাতীয় ভাষার বহুল চর্চ্চা ও বিজাতীয় লোকের বহুল সংসর্গ করিলে, স্বজাতীয় আচারানুষ্ঠান সম্বন্ধে সমিচীন রূপে বিচার করিবার শক্তি খর্ব্ব ও বিকৃত হইয়া পড়ে। কেবল যে এই কারণে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও মহামহোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজের অনাবশ্যক সংস্করণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তাঁহারা সতীর সহানুগমন ও চিরবৈধব্য সম্বন্ধে অনেক এমন অমূলক ও কৃত্রিম অত্যাচারের কথা শুনিয়াছিলেন, যাহা শুনিলে সহৃদয়ব্যক্তির হৃদয় ব্যাকুল হইয়া পড়ে। রাজা রামমোহন রায় হয় ত শুনিয়া থাকিবেন, যে সতী স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া সহগমন করেন না। অতিপ্রধান ও উন্নতলোকের যে ধারণা হয়, সেই ধারণার অনুকূল কথা সকলেই তাঁহাকে শুনাইয়া তাঁহার প্রীতিভাজন হইতে যায়। রাজা রামমোহন রায়ের সতীর সহানুগমন সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত জানিয়া তাঁহার সহচর অনুচরগণ বোধ হয়, তাঁহাকে সহানুগমন সম্বন্ধে নানা অলীক ও

স্বকপোলকল্পিত অত্যাচারের কথা সর্ব্বদা শুনাইত। ধনলোভী উত্তরাধিকারিগণ অবিলম্বে বিপুল ধনের অধিপতি হইবে, এই আশায় সরলমতি সতীকে সহানুগমনে প্রোৎসাহিত ও উত্তেজিত করে। অনন্তর বারংবার উত্তেজনার বেগ রোধ করিতে না পারিয়া, অবলা নারী পরিশেষে এই ভীষণ অনুষ্ঠানে কৃতসংকল্প হয়। কিন্তু কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে যখন মৃত্যু অতি ভয়ঙ্কর বেশে তাহার সম্মুখীন হয়, তখন অবলা নারী অবসন্ন হইয়া পড়ে, চিতারোহণে অগ্রসর হইতে পারে না। সমাজে নিন্দা হইবে, নরক হইবে, ইত্যাকারে ভয় প্রদর্শন দ্বারা নিরাশ্রয় দুর্ব্বলা রমণীকে বলপূর্ব্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ করে এবং পাছে তাহার রোদনধ্বনিতে, আর্ত্তনাদে কেহ তাহাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিতে যায়, অথবা তাহার অনিচ্ছায় তাহাকে অগ্নিতে প্রক্ষেপ করা হইয়াছে ইহা কেহ জানিতে পারে, এই জন্য অবলাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াই ঢাক ও ঢোলের শব্দে আর্ত্তনাদের শব্দ ঢাকিয়া ফেলে। এইরূপ ও এবম্বিধ বিবিধ উৎকটতর কল্পিত অত্যাচারের কথা রাজার প্রিয় পাত্র হইবে বলিয়া, তাঁহার অনুচরেরা তাঁহার কর্ণগোচর করাইত। এইরূপ অত্যাচারের কথা শুনিলে কে সতীর পতিসহানুগমন প্রথাকে সমর্থন করিবে? প্রথার নিতান্ত পক্ষপাতী যে, সে পর্য্যন্ত এ প্রথা রহিত করিতে উদ্যত হইবে। কিন্তু যে সমস্ত অত্যাচারের কথা রাজা শুনিয়াছিলেন, সে সমস্ত যে অলীক অমূলক নহে, তাহা কে

বলিতে পারে? রাজা হয় ত অত্যাচারের সংবাদ পাইয়া শান্তিরক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারিদিগকে অর্থাৎ পুলিসের আমলাদিগকে, এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করিতে অনুরোধ করিয়া থাকিবেন এবং শান্তিরক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারিগণের নিকট উক্ত অত্যাচার সম্বন্ধে প্রমাণ পাইয়া পতিসহানুগমন প্রথা রহিত হওয়া উচিত কি না, তাহা স্থির করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে এই শান্তি রক্ষা বিভাগটি অতি অপূর্ব্ব সৃষ্টি! এই বিভাগের কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যাহা আজ্ঞা করেন, তাহাই করিতে পারে। কোন ঘটনা সম্বন্ধে আবশ্যক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না, কি কোন বিষয়ে অপরাধী কে, তাহা স্থির হইতেছে না ও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। পুলিসকে আজ্ঞা করিলেই তৎক্ষণাৎ ভূরি ভূরি প্রমাণ উপস্থিত হইবে ও অপরাধী নির্ণীত, ধৃত ও আনীত হইবে। পুলিসের আর একটি গুণ এই যে, তাহারা অভ্রান্ত। যখন যাহাকে অপরাধী বলিয়া উপস্থিত করে, এমন অখণ্ডনীয় প্রমাণ ও সাক্ষ্য দ্বারা তাহার অপরাধ সাব্যস্ত করে, যে প্রাড়্বিবাককে তাহার দণ্ড করিতে হইবেই হইবে। যদি কখন প্রাড়্বিবাক পুলিসের প্রমাণ অগ্রাহ্য করেন, তবে পুলিস ও প্রড়্বিবাক উভয়ের মধ্যে বিজাতীয় দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এবং যতক্ষণ উচ্চধর্ম্মাধিকরণে প্রাড়্বিবাকের মীমাংসা অন্যথা না হয়, ততক্ষণ পুলিস ক্ষান্ত হয় না। ফলতঃ পুলিসের অনুসন্ধান ও

নির্দ্দেশ অব্যর্থ; আমরা কখন তাহার অন্যথা শুনি নাই, দেখি নাই। যদি কখন দৈবাৎ প্রকৃত অপরাধী নির্ব্বেদাতিশয় প্রভাবে আপন অপরাধ স্বয়ং স্বীকার করে, তখনই পুলিসের নিষ্পত্তির অন্যথা হইয়াছে। এইরূপ ঘটনা অতি বিরল। আমরা একবার শুনিয়াছি, যে কলিকাতার নিকটে গঙ্গাপারে পুলিস এক ব্যক্তিকে হত্যাকারী বলিয়া প্রাড্বিবাকের সম্মুখে উপস্থিত করে এবং সাক্ষ্য ও প্রমাণাদি দ্বারা তাহার অপরাধ সপ্রমাণ করে। তাহার প্রাণদণ্ড হয়, এমন সময়ে ঈশ্বরেচ্ছায় প্রকৃত অপরাধী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনি বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া স্বকীয় অপরাধ স্বীকার করে। তাহাতে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত ব্যক্তি অব্যাহতি পাইল ও প্রকৃত অপরাধীর দণ্ড হইল। ষাটী বৎসরের মধ্যে এরূপ ঘটনা এই একটি শুনা গিয়াছে; আর কখন পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত ব্যক্তি অব্যাহতি পাইয়াছে, শুনি নাই। তাহা হইলে পুলিসকে অভ্রান্ত বলিতে হইবে। পুলিসের কল্যাণে দিন দিন কত নিরপরাধীর দণ্ড হইতেছে ও অপরাধী অব্যাহতি পাইতেছে, তাহা বলা যায় না। রাজা রামমোহন রায় যদি সতী-ঘটিত কোন অত্যাচারের কথা শুনিয়া থাকেন ও পুলিসের নিকট তাহার প্রমাণ পাইয়া থাকেন, তবে সে অত্যাচার কতদূর সত্য, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন। ফলতঃ সহমরণের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কখন কোন বিশেষ অত্যাচার ঘটে নাই এবং এই প্রথা তাড়াতাড়ি রহিত করিবার যে বিশেষ আবশ্যকতা ছিল,

তাহা আমরা দেখিতে পাই না। হিন্দুদিগের অতি উচ্চ আদর্শের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি সমাজসংস্কারকেরা ধারণা করিতে অক্ষম ও তাঁহাদিগের সেই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতির সহিত সম্যক্ সহানুভূতি হয় নাই, প্রাচীন প্রথা রহিত করিবার চেষ্টায় ইহারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এবং রাজ-পুরুষেরা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া এমন মহাকল্যাণকর প্রাচীন ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া আপনাদিগের অনভিজ্ঞতা ও অর্ব্বাচীনতা প্রকাশ করিয়াছেন। এখন বাল্যবিবাহ প্রথার সংস্কার উপলক্ষে সমাজকে লইয়া কেহ টানাটানি না করে, তাহা হইলেই বাঁচি।

দশবিধ সংস্কার ভিন্ন হিন্দুদিগের আরো অনেক প্রকার অনুষ্ঠান আছে, ব্রত শ্রাদ্ধাদি ও দেব দেবীর পূজোৎসব। শ্রাদ্ধ নিত্য অনুষ্ঠান; কিন্তু এখন প্রত্যহ শ্রাদ্ধ করার রীতি নাই বলিয়া নিত্য অনুষ্ঠেয় কার্য্যের বর্ণনা স্থলে, ইহার উল্লেখ করা যায় নাই।

ব্রত ও পূজাদি কাম্য কর্ম্ম। ব্রত স্ত্রী পুরুষ সক-লেরই অনুষ্ঠেয়; কিন্তু স্ত্রীলোকেই অধিকাংশের অনু-ষ্ঠান করিয়া থাকে। পুরুষেরা সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যপূজা করিয়া আর ব্রতাদির অনুষ্ঠান আবশ্যক মনে করেন না। ফলতঃ এই সমস্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে পুণ্য লাভ হয়, তাহার অননুষ্ঠানে কোন প্রত্যবায় নাই।

পৌষ মাস ভিন্ন বৎসরের মধ্যে আর সকল মাসেই দুইটি চারিটি, কোন মাসে আটটি নয়টি ব্রত আছে।

পুণ্যজনক ব্রতানি।—

বৈশাখ মাস	শুক্লপক্ষ	তৃতীয়া, অক্ষয় তৃতীয়া
	,,	দ্বাদশী, পিপীতকী দ্বাদশী
	,,	চতুর্দ্দশী, নৃসিংহ চতুর্দ্দশী
	কৃষ্ণপক্ষ	অষ্টমী, ত্রিলোচনাষ্টমী,
	,,	সাবিত্রী চতুর্দ্দশী।
জ্যৈষ্ঠ মাস	শুক্লপক্ষ	রম্ভা তৃতীয়া
	,,	উমা চতুর্থী
	,,	অরণ্য ষষ্ঠী
	,,	চম্পক চতুর্দ্দশী
আষাঢ়	,,	শয়নৈকাদশী
শ্রাবণ	কৃষ্ণপক্ষ	শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী
ভাদ্র	শুক্লপক্ষ	শিবাচতুর্থী
	,,	চপেটা ষষ্ঠী
	,,	ললিতা সপ্তমী, কুক্কুটীব্রত
	,,	দূর্ব্বাষ্টমী, রাধা অষ্টমী
	,,	তাল নবমী
	,,	পার্শ্ব একাদশী, পার্শ্বপরিবর্ত্তনব্রত
	,,	শ্রবণা দ্বাদশী
	,,	অনন্ত চতুর্দ্দশী
	কৃষ্ণপক্ষ	গণেশচতুর্থী
আশ্বিন	শুক্লপক্ষ	মহাষ্টমী

কার্ত্তিক	শুক্লপক্ষ	দুর্গানবমী
,,	,,	উত্থান একাদশী
	,,	পাষাণ চতুর্দ্দশী
	,,	একাদশ্যাদিপঞ্চ তিথ্যাত্মক বকপঞ্চকং
	,,	বৃশ্চিক সংক্রান্ত্যাং সর্ব্ব জয়াব্রতং
	,,	কার্ত্তিকেয় ব্রত
অগ্রহায়ণ	,,	গুহ ষষ্ঠী
	,,	মিত্র সপ্তমী
	,,	অখণ্ডা দ্বাদশী
মাঘ মাস	,,	বরদা চতুর্থী
	,,	শ্রীপঞ্চমী ব্রতং
	,,	শীতলা ষষ্ঠী
	,,	আরোগ্য সপ্তমী
	,,	ভীম একাদশী
	,,	বরাহ দ্বাদশী
	কৃষ্ণপক্ষ	শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী
ফাল্গুন—	শুক্লপক্ষ	গোবিন্দ দ্বাদশী
চৈত্র—	কৃষ্ণপক্ষ	স্কন্দ ষষ্ঠী
	শুক্লপক্ষ	অশোকাষ্টমী
	,,	শ্রীরাম নবমী
	,,	মদন ত্রয়োদশী

এতদ্ভিন্ন সংক্রান্তি ও অপরাপর পুণ্য তিথিতে অন্যান্য অনেক ব্রত আছে। ব্রতাদির অনুষ্ঠানে বিশেষ সমারোহ

হয় না। দুই চারিটি বা দ্বাদশটি মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইয়া থাকে।

শ্রাদ্ধ।—শ্রাদ্ধ নিত্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণকে পঞ্চ-সূনাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য নিত্য পঞ্চমহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়; অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞ বা বেদাধ্যয়ন, পিতৃযজ্ঞ বা শ্রাদ্ধ, দেবযজ্ঞ অর্থাৎ হোম, ভূতযজ্ঞ বা ভূত-বলি, এবং নৃযজ্ঞ বা অতিথিসেবা। নিত্য শ্রাদ্ধ করণে অশক্ত হইলে পিতৃ বলি ও তর্পণ এই উভয় দ্বারা পিতৃযজ্ঞ সিদ্ধ হয়। বলিকরণে অশক্ত হইলে তর্পণ মাত্র দ্বারা পিতৃযজ্ঞ সিদ্ধ হয়। এখন নিত্যতর্পণও সকলে করেন না, নিত্যশ্রাদ্ধ দূরে থাকুক। মৃতাহে পিতৃ পিতামহ, মাতৃ মাতামহাদির শ্রাদ্ধ করিতে হয়,—যাহাকে সাম্বৎসরিক বা একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ কহে। পিতৃপক্ষে আপামর সাধারণ সকলেই প্রায় তিলতর্পণ করিয়া থাকে। এই সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, সকলে অতি উৎসাহের সহিত এক এক কোশা হাতে লইয়া গঙ্গাভিমুখে দৌড়িয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কয়েকটি পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ আছে যথা—সৌরাশ্বিনীয় অমাবস্যা অথবা মহালয়া এবং চান্দ্রকার্ত্তিকস্য অমাবস্যা অথবা দীপান্বিতা। মহালয়া অমাবস্যার পূর্ব্বে ত্রয়োদশী যদি মঘানক্ষত্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত তিথিতেও পার্ব্বণ কর্ত্তব্য। তাহার পর পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা-ষ্টমীতে পূপাষ্টকা, মাংসাষ্টকা, ও শাকাষ্টকা এই তিন অষ্টকা উপলক্ষে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। শস্যচ্ছেদ হইয়া

নূতন অন্ন প্রস্তুত হইলে সে অন্ন আহার করিবার পূর্ব্বে অগ্রে তদ্দারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিতে হয়, ইহাকে নবান্ন কহে। এই নবান্ন উপলক্ষে ও পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। বিবাহাদি সংস্কার উপলক্ষে যে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়, সে যদিও নান্দীমুখ বা বৃদ্ধি বলিয়া অভিহিত হয়, তথাপি পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ ভিন্ন আর কিছু নয়। তীর্থযাত্রা করিলে যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে, তীর্থপ্রাপ্তি হইলে অর্থাৎ তীর্থস্থানে পঁহুছিলে এবং তীর্থ হইতে বাটীতে প্রত্যাগত হইলে, এই তিন সময়ে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণকাল হিন্দুদিগের পক্ষে মহা পুণ্যকাল। এই কালে অনেকে মন্ত্র পুরশ্চরণ করেন, অর্থাৎ গ্রাসাদ্বি-মুক্তি পর্য্যন্ত জপ করিবেন এই সংকল্প করিয়া জপ করিয়া থাকেন। লক্ষ বা লক্ষাধিক জপ না হইলে পুরশ্চরণ হয় না, কিন্তু গ্রহণকাল এত পুণ্যকাল, এই কালের এত মাহাত্ম্য যে, পাঁচ সাত দণ্ডের অধিক গ্রহণের স্থিতি হয় না; কিন্তু এই স্বল্পকাল জপ করিলেই পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই গ্রহণকালেও অনেকে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন।

মৃত্যুর পর অশৌচান্তে যে শ্রাদ্ধ হয়, তাহাকে আদ্য-শ্রাদ্ধ বলে। আদ্যশ্রাদ্ধ অতি সমারোহ ব্যাপার! শ্রাদ্ধ-কর্ত্তা, যে অবস্থার লোক হউক না কেন, ঋণ করিয়াও তাহাকে পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ সমরোহ পূর্ব্বক করিতে হইবে। সম্পন্ন লোকেরা একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধেও সমারোহ করিয়া থাকেন,

অর্থাৎ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে দান করেন ও ব্রাহ্মণ ও তদিতর জাতিদিগকে ভোজন করান।

দেব দেবীর পূজোৎসব।

বৈশাখমাস নববর্ষের প্রথম দিবসে যাবতীয় ব্যবসায়ীলোক নূতন খাতা বা পাত্রভোজ নামক উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বিগত বর্ষের আয়, ব্যয় স্থিতি বিবরণীপুস্তিকা অর্থাৎ খাতা শেষ করিয়া নববর্ষের পুস্তিকা লিখন এই দিবসে আরম্ভ হয়। মহাজন এই উৎসবে তাঁহার যাবতীয় খাতককে আহ্বান করেন। আহুত ব্যক্তিগণ সন্ধ্যার পর একে একে আসিতে আরম্ভ করেন এবং প্রত্যেকে আপন আপন সুবিধা মতে তাঁহার নিজ নামে জমা দিবার জন্য কিছু কিছু টাকা মহাজনকে দেন। তাঁহার দেনা না থাকিলেও এই দিবস কিছু জমা দিতে হয়? পরে কতকগুলি আহুতব্যক্তি সমবেত হইলে মহাজন তাঁহাদিগকে উত্তম রূপ আহার করান। আহারান্তে আহুতব্যক্তিগণ চলিয়া যান। মহাজন আহুতব্যক্তিগণের প্রমোদার্থ সঙ্গীতের ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন। সে ব্যবস্থা থাকিলে আহারান্তে আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সঙ্গীত শ্রবণ করেন। এই দিবসে রাজপথের দুই ধারে পণ্যবীথীকা পরিষ্কার শুভ্র বস্ত্রাবৃত, পুষ্পমাল্যে সুশোভিত ও মৃণ্ময় প্রদীপের পরিবর্ত্তে কাচের বর্ত্তিকাধারে বর্ত্তিকার আলোকে সুশোভিত হয়। আস্তরণের উপর

বড় বড় উপধান ও বৈঠকের উপর রজতনির্ম্মিত হুঁকা সারি সারি বিন্যাস করা থাকে। ক্রয় বিক্রয় সমস্ত বন্ধ থাকে। পণ্যবীথীপতি আহূত ব্যক্তিগণকে আহ্বান ও আসন দান করিতে ও তাঁহাদিগের সহিত সদালাপ করিতে এবং তাঁহাদিগের প্রদত্ত অর্থ খাতায় জমা করিয়া লইয়া রাখিতে ব্যস্ত থাকেন। কোন কোন ব্যবসায়ী এই অনুষ্ঠান শ্রীরামনবমীর দিবস এবং কেহ কেহ অক্ষয়তৃতীয়ার দিবস করিয়া থাকেন। অধিকাংশ ব্যবসায়ীর নূতন খাতা ১লা বৈশাখেই হইয়া থাকে।

জ্যৈষ্ঠমাস।—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে হস্তানক্ষত্রযুক্ত মঙ্গলবারে গঙ্গা স্বর্গ হইতে ধরাতলে অবতীর্ণা হন,এই জন্য এইদিনে অতি সমারোহে গঙ্গা পূজা হইয়া থাকে। এই দিনে গঙ্গাস্নান করিলে দশবিধ পাপক্ষয় হয় যথা,—

অদত্তানামুপাদানং হিংসাচৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবাচ কায়িকং ত্রিবিধিং স্মৃতং॥
পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বন্ধ প্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধং॥
পরদ্রব্যেম্বভিধ্যানং মনসানিষ্ট চিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসং॥
এতানি দশপাপানি প্রশমং যান্তু জাহ্নবি।
স্নাতস্য মমতে দেবি জলে বিষ্ণুপদোদ্ভবে॥

গৃহস্থ মাত্রেই এই দিনে নৈবেদ্যাদি ষোড়শ উপচার লইয়া গঙ্গাতীরে যান, গিয়া তথায় গঙ্গা দেবীর পূজা করেন;

শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসরের ধ্বনি হইতে থাকে। কেহ কেহ ঢাক ঢোলের বাদ্য করেন এবং ধূপ ধুনার গন্ধে বায়ু পরিপূর্ণ হয়। অসংখ্য লোক জলে অবগাহন করিতে থাকে। সে দিবস গঙ্গাতীরের অতি অপূর্ব্ব শোভা হয়। এই উৎসবের নাম "দশহরা।"

স্নানযাত্রা।—জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমাতে শ্রীবিষ্ণোর্ম্মহাস্নান রূপ উৎসব হইয়া থাকে। এই পূর্ণিমাতে স্নান করিলে দ্বিজাতীয় দিগের সকল পাপক্ষয় হয়। যে মানুষ এই দিবসে পুরুষোত্তম এবং বলভদ্র ও সুভদ্রাকে দর্শন করে,সে অব্যয়পদ প্রাপ্ত হয়। স্নান ও জগন্নাথ দেবের দর্শন, এ উৎসবে এই দুইটিমাত্র অনুষ্ঠান। জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিবার জন্য বহুসংখ্যক লোক পুরীজেলাতে জগন্নাথক্ষেত্রে গমন করে। উক্ত ক্ষেত্রে এই উপলক্ষে মহাসমারোহ হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে কেবল এক স্থানে জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি আছে ও তাঁহার সেবা হইয়া থাকে, অর্থাৎ শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত বল্লভপুর গ্রামে। এই গ্রামে এই উৎসব উপলক্ষে মহাসমারোহ হয়। নানা স্থান হইতে লোকের সমাগম হয় এবং আনন্দ উৎসবের ইয়ত্তা থাকে না।

আষাঢ়।—আষাঢ় মাসের শুক্ল দ্বিতীয়াতে শ্রীজগন্নাথ দেবের রথারোহণরূপোৎসব হইয়া থাকে। পুরীজেলায় জগন্নাথ ক্ষেত্রে এবং বঙ্গদেশের মধ্যে শ্রীরামপুরের অন্তর্গত বল্লভপুরগ্রামে এই উৎসব উপলক্ষে মহাসমারোহ হইয়া থাকে। রথে বামন দর্শনার্থী হইয়া এত লোক উৎসবস্থানে

উপস্থিত হয় এবং এমন বিষম জনতা হয়, যে শান্তি রক্ষা ও প্রাণী রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয় এবং জেলার প্রধান রাজপুরুষ ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ও তাঁহার অধীনস্থ প্রধান কর্ম্মচারী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি সকলে উপস্থিত থাকিয়াও প্রাণীহত্যা একেবারে নিবারণ করিতে পারেন না। এক আধটি প্রায় প্রতিবর্ষে মারা পড়ে। অনেক সম্পন্ন লোকে রথ প্রতিষ্ঠা করেন এবং পিত্তলের রথ বা রজতাবৃত দারু-ময় রথে শালগ্রালশিলাকে আরোপণ করাইয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মহাসমারোহে রাজপথ দিয়া রথাকর্ষণ করিয়া লইয়া যান, এবং এই উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজনাদি করান।

শ্রাবণ মাস।—শ্রাবণের শুক্লৈকাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া দিনপঞ্চক বা দিনত্রয় শ্রীকৃষ্ণের হিন্দোলোৎসব হইয়া থাকে। ইহাকে ঝুলনযাত্রা কহে। এই ঝুলনে ব্রাহ্মণ সজ্জন ভোজন, সঙ্গীতাদি অনেক প্রকার আনন্দ হয়। যে গৃহস্থের বাটীতে নারায়ণের বিগ্রহ সেবা হয়, তাঁহারা সকলেই এই হিন্দোলোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। ইহাতে ভগবানকে দোলায় আরোহণ করাইয়া দোলান হয়, এবং তদানুসঙ্গিক পূজা ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি হইয়া থাকে।

ভাদ্রমাস।—এই মাসে পিতৃলোকদিগের উৎসব হইয়া থাকে। পিতৃপক্ষে প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা অবধি পনের দিবস একাদিক্রমে তিলতর্পন, মঘা ত্রয়োদশীর পার্ব্বণ ও মহালয়ার পার্ব্বণ। এই সকল অনুষ্ঠান দ্বারা পিতৃলোকের

উৎসব করা হয়। এই মাসের সংক্রান্তিতে অরন্ধন পর্ব্বের অনুষ্ঠান হয়। অধিকাংশ লোক সংক্রান্তিতে এই পর্ব্বের অনুষ্ঠান করে, কিন্তু কেহ কেহ ভাদ্রমাসের যে কোন দিবসে হউক ইহার অনুষ্ঠান করে। এই পর্ব্বে চুল্লীতে অগ্নি প্রজ্বালন নিষেধ। পূর্ব্বদিবস রাত্রিতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাক করিয়া অন্নে জল দিয়া রাখিতে হয় ও ব্যঞ্জনাদি এরূপ ভাবে পাক করিতে হয়, যে তাহা শুক্ত না হইয়া যায়। পরদিন প্রাতে চুল্লীতে মনসাদেবীর পূজা করিয়া পর্য্যুসিত অন্ন ব্যঞ্জনাদির ভোগ দিয়া গৃহস্থ সেই প্রসাদ গ্রহণ করে। এই দিনে কর্ম্মকার স্বর্ণকার প্রভৃতি বিশ্বকর্ম্মার পূজা করে। কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের জাতিও এই দিনে বিশ্বকর্ম্মার পূজা করিয়া থাকেন।

আশ্বিনমাস।—আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে হিন্দুদিগের অতি প্রধান উৎসব—দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এমন সার্ব্বভৌমিক আনন্দ ও উৎসাহ আর কোন উৎসবে হয় না। যে কয়েক দিবস এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, হিন্দু-সমাজ যেন আনন্দের তরঙ্গে দোদুল্যমান হইতে থাকে, আর আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আনন্দ ও উৎসাহপূর্ণ। যদিও দুর্গোৎসব ব্যয় সাপেক্ষ,তথাপি ব্রহ্মণেরা ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতএব যে গ্রামে একশত বাসস্থান, অর্থাৎ একশত লোকের বসতি, তথা অন্ততঃ দশঘরে দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। যিনি পূজা করেন, অর্থাৎ যাঁহার বাটীতে পূজা হয়, তিনি সেই

পূজা দর্শনের জন্য গ্রামস্থ যাবতীয় লোককে ও অপর স্থানের আত্মীয় ও পরিচিত লোককে আহ্বান করেন। সুতরাং এক এক ব্যক্তির অন্ততঃ দশ জনের বাটীতে নিমন্ত্রণ থাকে। দিবসে নিমন্ত্রণ রক্ষা ও দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করা ও রাত্রিতে নৃত্য,গীত, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি দর্শন ও শ্রবণ করা এই কার্য্য লইয়া দিবা রাত্রি সকলে ব্যস্ত থাকেন। যাঁহার বাটীতে পূজা হয়, তাঁহার ব্যস্ততার ইয়ত্তা থাকে না। তিনি সমস্ত দিন রাত্রি সপরিবারে ব্যস্ততার আবর্ত্তে নিয়ত ঘূর্ণিত হইতে থাকেন। পূজার সময় বাদ্য করিবার জন্য যে ঢক্কা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদ্যকর সহকারে বাটীতে তিন দিন নিযুক্ত থাকে, পাছে যথা সময়ে সকলে গাত্রোত্থান না করে, এই ভয়ে কৃতী বাদ্যকরদিগের উপর এই অনুজ্ঞা দিয়া রাখেন, যে চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে তাহারা বাদ্য করে। এই বাদ্যোদ্দমে সকলে প্রবুদ্ধ হইয়া রাত্রি থাকিতে মৈত্র-কার্য্যাদি সমাপন করিয়া এক এক জন উৎসবের এক এক কার্য্যে নিরতিশয় উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হন। বালক বালিকারা পুষ্পচয়ন করিতে যায়। দুর্গোৎসবে অনেক পুষ্পাদি উপচারের আবশ্যক, যেহেতু ইহাতে কেবল আদ্যা-প্রকৃতির পূজা হয় এমত নহে, আনুষঙ্গিক যাবতীয় দেব দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

বালক বালিকারা রাশীকৃত পুষ্পাহরণ করিয়া বাটীতে লইয়া আইসে। দাস দাসীরা পূজামণ্ডপ ও তৈজসাদি পরিষ্কার ও সম্মার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হয়। অল্পবয়স্কা বধূ

ও বিবাহিতা কন্যাগণ, পুষ্পপাত্র বিন্যাস, চন্দনঘর্ষণ ও নৈবেদ্যের উপকরণাদি প্রস্তুত করণ ও নৈবেদ্যরচনাদি কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হয় এবং বয়স্থা স্ত্রীলোকেরা ভোগ রন্ধনের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হন। গৃহিণী কোন্ দ্রব্যের কত আবশ্যক হইবে বুঝিয়া ভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া দিতে থাকেন এবং প্রতিবেশী ও দরিদ্রলোক যাহারা ঠাকুর দেখিতে আইসে, তাহাদিগকে প্রতিমা দর্শন করাইয়া সকলকে মিষ্টান্ন দিয়া বিদায় করেন। এ দিকে কৃতী পূজামণ্ডপে উপস্থিত থাকিয়া পূজার আয়োজন ও উদ্যোগ সম্পূর্ণ হইল কি না মুহুর্মুহুঃ সে তত্ত্ব লইতে থাকেন, যে বস্তুর অসদ্ভাব থাকে, সে অভাব মোচনের ব্যবস্থা করেন। যথাসময়ে পূজা ও বলিদানাদির অনুষ্ঠান হইবে বলিয়া সর্ব্বদা ঘড়ি দেখিয়া পূজককে সময় জ্ঞাপন করিতে থাকেন। আমন্ত্রিত ব্যক্তি কেহ আগমন করিলে তাহার অভ্যর্থনা করা, তাহাকে আসন দান, তাহার সহিত সদালাপ করা ও পরিশেষে আহার পানাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া তাহাকে বিদায় করা, এই সমস্ত ও এবম্প্রকার অন্য কার্য্যে কৃতী নিযুক্ত থাকেন। রাত্রিতে সঙ্গীত হইবে তাহার ব্যবস্থা করা, আলোক বিন্যাস ও সভারচনাদির ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা কর্ম্মে কৃতী সপরিবারে যারপরনাই ব্যস্ত থাকেন। যাহাদিগের বাটীতে পূজা নাই, তাহারা নিমন্ত্রণ রক্ষা ও সঙ্গীত শ্রবণ ও দর্শন এই সকল কার্য্য নিবন্ধন তাহাদিগের অবকাশের নিতান্ত অপ্রতুল হয়। রাত্রি এই তিন দিন

বঙ্গসমাজ হইতে বিদূরিত হয় বলিলে হয়। রাত্রিতে সকলে সুষুপ্ত ও চারিদিক নিস্তব্ধ ও নিঃশব্দ ; এই তিন দিন যেমন দিনে তেমনি রাত্রিতেও রৈঃ রৈঃ শব্দ। কখন বা পূজার বাদ্য সকল বাটীতে একেবারে বাজিয়া উঠিল, কোথাও বা যাত্রা কবি নাট্যাভিনয় আরম্ভ হইল, তাহার বাদ্যোদ্দম। রাজপথে রাত্রিতে গাড়ি ঘোড়া ও লোকের যাতায়াত অতি বিরল হয়। এই তিন দিন নিরন্তর পথে লোক ও যানাদি যাতায়াত করিতে থাকে। অন্য সময়ে রাত্রিকালে সকল বাটীর দ্বার রুদ্ধ ও কুত্রাপি আলোকের একটি রশ্মিও দৃষ্ট হয় না। এই কয়েক দিবস রাত্রিতে সকল বাটীর দ্বার মুক্ত ও সকল বাটীতেই দীপ প্রজ্জ্বলিত থাকে এবং পূজার বাটীতে আলোক বৃষ্টি ও তাহার জ্যোতিঃতে চারিদিক উদ্ভাসিত হয়। এইরূপে বঙ্গসমাজে দুর্গোৎসবের তিন দিন আনন্দ ও উৎসাহের ইয়ত্তা থাকে না।

দুর্গোৎসবের আমোদ যে কেবল দেবদর্শনে ও আহারে ও নৃত্যগীত দর্শন ও শ্রবণে তাহা নহে। এ সময়ে আর একটি বিশুদ্ধ ও উন্নত হৃদয়ের বিশেষ তৃপ্তি ও শান্তি-কর আনন্দের উপভোগ হয়। লোকে জীবিকা অর্জ্জনের অনুরোধে দেশ দেশান্তর গমন করে, অর্থাৎ রাজকীয় অথবা অপর কর্ম্মের ভার প্রাপ্ত হইয়া তিনচারিদিবসের পথ অতিক্রম করিয়া কার্য্যস্থলে গিয়া থাকে। প্রতিদিন কার্য্য-স্থলে উপস্থিত থাকা আবশ্যক। সুতরাং যে পিতা, মাতা,

ভাই, ভগিনী, পত্নী ও সন্তান সন্ততির জন্য অর্থ উপার্জ্জন করিয়া মাসে মাসে গৃহে অর্থ প্রেরণ করেন, সেই ভক্তি, প্রণয়, প্রেম ও স্নেহের আস্পদদিগের মুখ নিরীক্ষণ করিতে পান না। সপ্তাহে যে রবিবারে একদিবস অবকাশ পান, অথবা একদিনসাধ্য পূজার অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে যে দুই-তিনদিনের অবকাশ পান, তাহাতে বাটী যাওয়া, তথায় অব-স্থান ও তথা হইতে কার্য্যস্থানে প্রতিগমন করা ঘটেনা। দুর্গোৎসব সহজে পাঁচদিন ব্যাপক উৎসব এবং যাঁহাদিগের নবম্যাদি বা প্রতিপদাদি কল্প, তাঁহাদিগের পক্ষাধিক বা দশদিন ব্যাপক পর্ব্ব। সুতরাং এই পর্ব্বোপলক্ষে রাজ-কীয় কার্য্যালয় সকল দীর্ঘকালের জন্য বন্ধ হয়। এতদ্দে-শের যাবতীয় কার্য্যালয়ে হিন্দুকর্ম্মচারীর ভাগই অধিক, সুতরাং তাহাদিগের পর্ব্বোপলক্ষে কার্য্যালয় সকল অগত্যা বন্ধ রাখিতে হয়। অতএব দুর্গোৎসব উপলক্ষে দীর্ঘ অবকাশ হয় এবং সেই অবকাশে যাঁহারা দূরদেশে বিষয়কর্ম্ম করেন, তাঁহারা বৎসরান্তে একবার গৃহে আইসেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, প্রণয়িণীভার্য্যা ও স্নেহের সন্তান সন্ততি ব্যাকুলহৃদয়ে এই আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকে। এদিকে অর্থোপার্জ্জন বা বিদ্যালাভ বা অন্য লাভের অনুরোধে যাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নির্ব্বাসনকে আশ্রয় করিয়াছে, করিয়া বন্ধুবিরহিত হইয়া বিদেশে পড়িয়া আছে দুর্গোৎসবের দীর্ঘ অবকাশ যত নিকট হইতে থাকে তাহাদিগের মন তত গৃহাভিমুখীন হয়; রাত্রিকালে সুপ্তাব-

স্থায় গৃহ ও গৃহাঙ্গীভূত যত কিছু পদার্থ স্বপ্ন দেখেন ও দিবসে পিতা, মাতা, পুত্র কলত্রের চিরপরিচিত হৃদ্য ও মনোজ্ঞ মুখচন্দ্রিমাগুলি অণুক্ষণ যেন ইতস্ততঃ দেখিতে থাকেন; ফলতঃ তাঁহাদিগের গৃহগমন ঔৎসুক্য উল্বণ হইয়া উঠে। অনন্তর উৎসবের সময় যখন মিলনের কেন্দ্রস্থল গৃহে তাঁহাদিগের সন্মিলন হয়, তখন উভয়পক্ষের শান্তি হয় এবং মিলনের ফল যে আনন্দ, তাহার তরঙ্গ উঠে। এইকালে বিরহিনীরমণী পতিসহবাস সুখলাভ করে এবং বিদেশস্থ পতি প্রণয়িণীভার্য্যার সুমধুর সংসর্গ উপভোগ করেন। এই কালে বৃদ্ধ পিতা মাতা তাঁহাদিগের বার্দ্ধক্যের এক মাত্র অবলম্বন বিদেশস্থ উপযুক্ত সন্তানের মুখ নিরীক্ষণ করিতে পান এবং বিদেশস্থ উপযুক্ত সন্তান সেই প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা মাতার চরণ বন্দনা ও সেবা করিতে পান। এই কালে বালক বালিকাগণ স্নেহের মূর্ত্তি বিদেশস্থ পিতাকে সন্দর্শন করিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকে, ও বিদেশস্থ পিতা সেই হৃদয়ের পুত্তলিগণকে দেখিয়া মুগ্ধ হন ও সংসারের ক্লেশ দুঃখ ভুলিয়া যান এবং যে ক্লেশ দুঃখের পর এমন সুখ লাভ হয় সে ক্লেশ দুঃখকে স্বার্থক জ্ঞান করেন। কেবল যে বিদেশস্থ বন্ধুগণ দেশে আইসে এরূপ নহে, এক পরিবারের যাবতীয় শাখা প্রশাখা এই সময়ে একত্রিত হয়। এই মহাপর্ব্বোপলক্ষে পুত্রবধূগণ পিত্রালয় হইতে ও কন্যাগণ শ্বশুরালয় হইতে বাটীতে আনীত হন ও যেখানে যত জ্ঞাতি কুটুম্ব থাকে সমস্ত আহূত হইয়া এক বিরাটসন্মিলনী হয় ও

এই বিরাটসন্মিলনীর বিরাট আনন্দ উৎসব হয়। এই সময়ে আবালবৃদ্ধবনিতা দাস দাসী সকলের নূতন মূল্যবান শোভনতম বেশভূষাদি হয় এবং সেই বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া সকলে ইতস্ততঃ বিচরণ করে। বাটীর সংস্কার ও সজ্জা হয়, পারিবারিক শাসনের গ্রন্থি শিথিল করিয়া দেওয়া হয়, যে সকলে অসঙ্কোচে হাস্য কৌতুক আনন্দ করিতে পারিবে;—ফল আনন্দময়ীর আগমনে সকলেই আনন্দময় হয়।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে

আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি।

এমন যে নির্ম্মল, স্বভাবসঙ্গত, সার্ব্বভৌমিক আনন্দ, রাজপুরুষগণ ইহাকেও কখন কখন রোধ করিতে উদ্যত হন, অর্থাৎ দুর্গোৎসবের অবকাশ খর্ব্ব করিতে অর্থাৎ অবকাশের দিন সংখ্যা সংক্ষেপ করিতে চেষ্টা করেন। প্রজা-বৎসলতা রাজার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, আমাদিগের রাজপুরুষ-গণ যে এই ধর্ম্ম বর্জ্জিত, তাহা নহে; তবে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের অনুরোধে ও উত্তেজনায় কখন কখন এই ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন। দুর্গোৎসবের অব-কাস কাল সংক্ষেপ করিয়া প্রজাবর্গের আনন্দ রোধ করিতে রাজপুরুষগণ কখন উদ্যোগী হন না। ইউরোপীয় বণিক বা পাদ্‌রি বা ধার্ম্মিকতাভিমানী কোন কোন সাহেবের আগ্রহে তাঁহারা এই নিতান্ত নিষ্ঠুরাচরণকে কর্ত্তব্য বোধ করেন, করিয়া তাহার বিবেচনায় প্রবৃত্ত হন। বণিকদিগের

রাজকোষ বন্ধ হইলে কার্য্যের কিছু অসুবিধা হয় বলিয়া তাঁহারা দীর্ঘ অবকাশের বিরোধী হন এবং পাদ্‌রি ও ধার্ম্মিক-তাভিমানী সাহেবগণ মনে করেন যে হিন্দুপর্ব্ব উপলক্ষে দীর্ঘ অবকাশ দেওয়াতে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ইহাঁ-দিগের ধার্ম্মিকতা অপূর্ব্ব! আমাদিগের বিশ্বাস যে ঈশ্বরের ধ্যান, ধারণা, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান, আত্মাবমাননা, আত্মবঞ্চনা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদি দ্বারা পশুবৃত্তির খর্ব্বতা ও আধ্যাত্মিক বৃত্তি সমূহের স্ফূর্ত্তি করাতেই ধার্ম্মিকতা হয়। ইহাঁদিগের ধার্ম্মিকতা বিজাতীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত করা। যাহা হউক, যে বুদ্ধিতে হউক, এই মহাত্মারা মধ্যে মধ্যে হিন্দু পর্ব্বোপলক্ষে অবকাশ বা ছুটির কথা লইয়া হিন্দুসমাজকে নাড়া চাড়া দিয়া থাকেন। রাজা স্বভাবতই স্বজাতির প্রতি পক্ষপাতী। স্বজাতীয়ের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন না। কিন্তু সাধারণ লোকের ন্যায় যথেচ্ছা-চারও করিতে পারেন না। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যাঁহাদিগের মত গ্রাহ্য ও আদৃত হওয়া উচিত; অর্থাৎ যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত, তাঁহাদিগের মত না গ্রহণ করিয়া কেবল স্বজাতী-য়ের উত্তেজনায় এমন কোন বিধি করিতে পারেন না, যে বিধির উপর একটা জাতির যাবতীয় লোকের ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করিবে। সুতরাং রাজা দুই এক জন প্রধান প্রধান হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের এতৎসম্বন্ধে (এই ছুটী সম্বন্ধে) কি মত, অর্থাৎ কতদিনে এই দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান হইতে পারে এবং তজ্জন্য কত ছুটীর আবশ্যক, তাহা রাজাকে জ্ঞাপন করিবার

আদেশ করেন। রাজার সকল কার্য্যেই কৌশল আছে। পণ্ডিতাগ্রগন্য দুই এক জনকে উচ্চপদস্থ করিয়া ও তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে বাধ্য করিয়া রাখা হইয়াছে, যে যখন কোন গুরুতর ব্যাপারের আন্দোলন হইবে তাঁহাদিগের মত স্পৃষ্ঠ হইলে তাঁহারা রাজার অপ্রীতিকর মত দিতে পারিবেন না। যে দুর্গোৎসব সচরাচর পাঁচদিন ব্যাপক এবং স্থল বিশেষে দশ দিন ও পক্ষাধিক কাল ব্যাপক বলিয়া উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায়গণ তাহাকে তিন দিন সাধ্য অনুষ্ঠান বলিয়া দিলেন এবং তদুপলক্ষে তিন দিনের ছুটী যথেষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। যাহা হউক, এইবার রাজার প্রজাবৎসলতা ধর্ম্ম প্রবল হইল, স্বজাতির প্রতি পক্ষপাত, নিকৃষ্ট বৃত্তি, অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং এই পর্ব্বোপলক্ষে হিন্দুর দীর্ঘ অবকাশ রূপ যে অধিকার, তাহার উপর কোন আঘাত হইল না; কিন্তু কবে আবার উক্ত মহাত্মাগণ এই বিষয় লইয়া হিন্দুকে নাড়া চাড়া দেন, কবে আবার সর্ব্বনাশ করেন বলা যায় না।

ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক যে দুর্গোৎসব করেন, তাহার কারণ এই যে,—দুর্গোৎসব একটা মহাস্বস্ত্যয়ন বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহার প্রভাবে সম্বৎসরের মধ্যে গৃহস্থের কোন অকল্যাণ, অমঙ্গল হয় না, আর এই পূজা করিলে মহাপুণ্য হয়। দুর্গোৎসব কলির অশ্বমেধযজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই উৎসবে যে মূর্ত্তির পূজা হয়

ইহা আদ্যাপ্রকৃতির মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি, অর্থাৎ যিনি মহিষাসুরকে মর্দ্দন বা নাশ করিয়াছিলেন। মহিষাসুর অত্যন্ত প্রবল হইয়া যখন দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করে ও তাঁহাদিগকে স্বর্গ হইতে নিরাকৃত করিয়া দেয় এবং তাঁহাদিগের অধিকার চর্চ্চা করিতে লাগিল ও দেবতারা মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া মানুষের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন, তখন দেবতারা সকলে মিলিত হইয়া ব্রহ্মাকে সম্মুখে লইয়া যেখানে বিষ্ণু ও মহেশ ছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। মহিষাসুরের অত্যাচার বার্ত্তা সমস্ত নারায়ণ ও মহাদেবের গোচর করিলেন এবং বলিলেন,—"আমরা শরণাগত হইলাম, অসুর নাশের উপায় করুন।" এই সমস্ত শুনিয়া ভগবান বিষ্ণু ও শম্ভু মহিষাসুরের উপর বিজাতীয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সেই ক্রোধে তাঁহাদিগের ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত হইল এবং তাঁহাদিগের কুটিলানন হইতে অতি ভয়ঙ্কর তেজঃ বিনির্গত হইল! ব্রহ্মার মুখমণ্ডল হইতেও তদনুরূপ তেজঃ বিনির্গত হইল এবং ক্রমে ক্রমে সকল দেবতার তেজঃ বিনির্গত হইয়া সকল তেজঃ একত্রিত হইল এবং এই তেজোসমষ্টি এক অত্যুচ্চ জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় হইয়া তাহার দীপ্তি চারিদিকে দিগ্বলয় পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, এবং সেই তেজোরাশি ক্রমে ক্রমে এক প্রকাণ্ড নারীরূপে পরিণত হইল! যে নারীর কিরণে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবন আলোকিত হইল, যাঁহার চরণভরে ধরাতল নিম্ন

হইয়া পড়িল ও যাহার শিরোরত্ন আকাশ স্পর্শ করিতে লাগিল। পরে সকল দেবতারা এই দেবীকে বিবিধ ভূষণ ও আয়ূধ দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া দিলেন। দেবী এইরূপে সম্মানিতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বারংবার হাস্য করিতে লাগিলেন। সেই অট্টহাস জনিত অপরিমিত অতি মহৎ ভয়ঙ্কর শব্দে পৃথিবী ও আকাশ পরিপূর্ণ হইল এবং সেই শব্দের প্রতিধ্বনিতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিভুবন দোলায়মান হইতে লাগিল, সমুদ্র সকল উত্তোলিত হইয়া উঠিল, পৃথিবী টল্‌মল্ করিতে লাগিল এবং পর্ব্বত সকল স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল। দেবীর ধনুষ্টঙ্কারে সপ্তপাতাল ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল ও তিনি সহস্রভুজে সর্ব্ব প্রকারে সকল দিক আচ্ছন্ন করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহিষাসুর অতি ভীষণ বহুসংখ্যক সৈন্য সামন্ত সহকারে দেবীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দেবী ক্ষণকালের মধ্যে সেই মহা সৈন্য ক্ষয় করিয়া ফেলিলেন। অগ্নিতে যেমন রাশীকৃত তৃণ দারু ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মাবশেষ হইয়া যায়, সেইরূপে দেবী ও দেবীর বাহন মহাসিংহ মহিষাসুরের সৈন্য ক্ষয় করিলেন;—তদন্তর দেবী মহিষাসুরের সেনাপতিগণকে একে একে নিপাত করিলেন। পরিশেষে দেবী ও মহিষাসুরে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, ভগবতী প্রথমে পাশ নিক্ষেপ করিয়া মহিষাসুরকে আবদ্ধ করিলেন;—আবদ্ধ হইয়া অসুর মহিষরূপ ত্যাগ করিয়া সিংহরূপ ধারণ করিল। দেবী সেই সিংহের শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত

হইলেন, অসুর অমনি খড়্গধারী পুরুষ হইয়া ভগবতীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। ভগবতী বাণ দ্বারা তৎক্ষণাৎ খড়্গ চর্ম্ম সহিত তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন। অসুর তৎক্ষণাৎ প্রকাণ্ড মাতঙ্গরূপ ধারণ করিয়া ভগবতীর সম্মুখীন হইল এবং শুণ্ড দ্বারা তাঁহার বাহন মহাসিংহকে আকর্ষণ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল,—খড়্গ দ্বারা ভগবতী সেই শুণ্ড কাটিয়া ফেলিলেন। অসুর আবার মহিষরূপ ধারণ করিয়া পূর্ব্ববৎ উৎপাত আরম্ভ করিল। ভগবতী লম্ফ প্রদান করিয়া অসুরের উপরে আরোহণ করিয়া পাদদ্বারা তাহার কণ্ঠদেশ আবদ্ধ করিলেন এবং শূল দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে লাগিলেন। ভগবতীর পদাক্রান্ত অসুর আত্মমুখ হইতে মহিষাকার অর্দ্ধাঙ্গ বহির্গত করিল, অর্দ্ধ নিস্ক্রান্ত হইয়া অসুর পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল, ভগবতী মহাখড়্গ দ্বারা শিরশ্ছেদ করিয়া তাহাকে নিপাতিত করিলেন। মহিষাসুর বধ করিয়াছিলেন বলিয়া জগদম্বার মহিষমর্দ্দিনী এক নাম হয়। দুর্গোৎসবে এই মহিষমর্দ্দিনী রূপের পূজা হয়। প্রতিমার মধ্যস্থানে দেবীর মূর্ত্তি, দেবীর দক্ষিণে ও বামে লক্ষ্মী এবং স্বরস্বতী।—ইঁহারাও দেবীর মূর্ত্ত্যন্তর মাত্র এবং স্বরস্বতীর বামে কার্ত্তিকেয় ও লক্ষ্মীর দক্ষিণে গণেশ এই দুই দেবমূর্ত্তিও প্রতিমাতে সন্নিবেশিত হয়। পুরাণে এই দুই দেবতা দেবীর পুত্র বলিয়া বর্ণিত হন! বোধ হয়, প্রতিমার সৌষ্ঠবের জন্য মহিষমর্দ্দিনী ভিন্ন

আরও চারিটি দেব দেবীর মূর্ত্তি তথায় সন্নিবেশিত হইয়া থাকে। সকল দেব দেবী যখন আদ্যাপ্রকৃতির বিভূতি মাত্র, রূপান্তর মাত্র, তখন তাঁহার প্রতিমা সৌষ্ঠব বর্দ্ধনের জন্য এরূপ সন্নিবেশন অপ্রাসঙ্গিক বা অযথা নিয়োগ হইবে না বলিয়া বোধ হয় প্রতিমার এরূপ আকার হইয়াছে। গণেশের দক্ষিণে বস্ত্রাবগুণ্ঠিত বধুর আকারে আর একটি উদ্ভিজ্জময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। দেবী ওষধি ও বনস্পতিতে আছেন, এই জন্য উদ্ভিজ্জময়ী মূর্ত্তির রচনা হইয়াছে। ইহাকে নবপত্রিকা বলে এবং ইহাতে দেবীরই পূজা হয়। যখন শুম্ভাসুর দেবী ও মাতৃকাগণ অর্থাৎ ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী ও শিবদূতী প্রভৃতির সহিত যুদ্ধে অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন, তখন তিনি ক্রোধ করিয়া দেবীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, "তুমি এই সকল দেবীদিগের অর্থাৎ মাতৃকাগণের সহায়তা অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতেছ, আমার সহিত যুদ্ধ করিবার তোমার নিজের ক্ষমতা কি?" তখন দেবী কহিলেন

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা,
পশ্যৈতা দুষ্টময্যেব বিশন্তি মদ্বিভূতয়ঃ।

এই জগতীতলে আমি একাকিনী, আমি ভিন্ন এখানে আর কে আছে? রে দুষ্ট দেখ, ইহারা সকলে আমার বিভূতি, আমাতেই প্রবেশ করিতেছে।" বলিতে বলিতে মাতৃকাগণ দেবীর দেহে লীন হইলেন। দেবী একাকিনী যুদ্ধ-

স্থলে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অতএব মহিষমর্দ্দিনীর প্রতিমাতে যত দেব দেবী দেখা যায়, সকলই দেবীর বিভূতি,—দেবীর রূপান্তর মাত্র। যে সকল বিভূতির মূর্ত্তি গঠিত আছে, তাঁহাদিগের পূজা সেই মূর্ত্তিতেই হয় এবং অপর বিভূতিনিচয়ের পূজা ঘটে ও মণ্ডলে হয়। অন্য পর্ব্বে, অন্য পূজায় দেবীর বিভূতিবিশেষের পূজা হয়, দুর্গোৎসবে জগদীশ্বরীর যাবতীয় বিভূতির পূজা হয়, এই জগৎ শুদ্ধ তাঁহার সর্ব্বাবয়বের পূজা হয়, দুর্গোৎসব জগদম্বার সর্ব্বাঙ্গীন পূজা। এই জন্য এই পূজার এত মাহাত্ম্য, ইহা এত মহৎ স্বস্ত্যয়ন বলিয়া পরিগণিত হয়, এই জন্যই ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষা করিয়াও এ পূজার অনুষ্ঠান করেন।

এত বাহুল্য ও আড়ম্বরের পূজা বিধিপূর্ব্বক করিতে কৃতী অশক্ত হন, এইজন্য পবিত্র ও জ্ঞানাপন্ন পুরোহিতকে আপন প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়া তাঁহার উপর যথাবিধি পূজা করিবার ভারার্পণ করেন। পুরোহিত যথাবিধি পূজা করিলে পর, কৃতী সপরিবারে পট্ট বা অপর পবিত্রবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সংযত ভাবে পূজামণ্ডপে উপস্থিত হন। অনন্তর উপাসনার ব্যূহ রচনা হয়। কৃতী ও কৃতীপত্নী মধ্যস্থানে ও অপর পরিজনেরা জ্যেষ্ঠানুক্রমে, পুরুষেরা কৃতীর দক্ষিণে অর্থাৎ তাঁহার অনুজ, পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়াদি তাঁহার দক্ষিণদিকে শৃঙ্খলা পূর্ব্বক দণ্ডয়মান হন ও স্ত্রীলোকেরা অর্থাৎ কন্যা, পুত্রবধূ, ভগিনী,

ভাগিনেয়ী, পৌত্রী, দৌহিত্রী, প্রভৃতি গৃহিণীর বামদিকে জ্যেষ্ঠানুক্রমে দণ্ডায়মান হন। পরে পুরোহিত সকলের হস্তে চন্দনাক্ত পুষ্প বিল্বপত্র দিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। সেই মন্ত্র স্ত্রীপুরুষ সকলে উচ্চারণ করিয়া জগদম্বার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রক্ষেপ করেন। বারত্রয় পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হইলে, কৃতাঞ্জলিপুটে সকলে পুরোহিতোক্ত স্তুতি পাঠ করেন; পাঠানন্তর সকলে যুগপৎ দেবীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান করেন। এই নিয়মে তিনদিন কৃতী সপরিবারে দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দান করেন। চতুর্থ দিবসে অর্থাৎ দশমীর দিনে প্রতিমা বিসর্জ্জন হয়, অর্থাৎ গঙ্গার জলে, তদভাবে অন্য কোন নদীর জলে, কিম্বা তদভাবে কোন বৃহৎ জলাশয়ে প্রতিমা নিক্ষেপ করা হয়। এই কার্য্য অপরাহ্নে দিবাবসানে হইয়া থাকে; কিন্তু মান্ত্রিক বা লাক্ষণিক বিসর্জ্জন পূর্ব্বাহ্নেই হইয়া থাকে। দশমীর দিন দেবীর সংক্ষেপে দশোপচারে পূজা হয়; তদন্তর পর্য্যুসিতান্নের ভোগ ও নীরাজনাদি হয়। নীরাজনের পর নীরঞ্জনের অর্থাৎ মান্ত্রিক বা লাক্ষণিক বিসর্জ্জনের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এই অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে কৃতী সপরিবারে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দেন। পুষ্পাঞ্জলি দিবার পর কৃতী এক বৃহৎ আসন বিস্তার করিয়া সপরিবারে ও সবান্ধবে দেবীর সম্মুখে উপবেশন করেন। তখন লাক্ষণিক বিসর্জ্জন আরম্ভ হয়। দেবীর বীজমন্ত্রে দর্পণে লিখিয়া সেই দর্পণ এক বৃহৎপাত্রস্থিত জলে

নিমজ্জন করা হয়, এবং বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজিতে থাকে। এই অনুষ্ঠানের পর প্রতিমার দেবত্ব তিরোহিত হয় এবং শূদ্রাদি সকল অপবিত্র লোক, ইহাঁকে অবাধে স্পর্শ করে। লাক্ষণিক বিসর্জ্জনের পর যে জলে দর্পণ বিসর্জ্জন হয় এবং যে ঘটে দেবীর বিভূতিনিচয়ের পূজা হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সেই ঘটের জল শান্তিকুম্ভের জলের সহিত মিলিত করিয়া পুরোহিত,ঘটের মুখে যে আম্রের পল্লব থাকে, সেইটি উঠাইয়া লইয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পল্লব দ্বারা ঐ তিন মিলিত-জল উপস্থিত সকলের গাত্রে অভ্যুক্ষণ করেন। ইহাকে বলে শান্তির জল দেওয়া অর্থাৎ এই মন্ত্রপূতজল দ্বারা যাহার শরীর স্পৃষ্ট হয়, তাহার শরীরে কোন ব্যাধি থাকে না এবং তাহার আপৎ, দুঃখ, ক্লেশ সমস্তের শান্তি হয়। অনন্তর পুরোহিত যে পুষ্পরাশি দ্বারা কএক দিবস দেবীর পূজা হইয়াছে, সেই নির্ম্মাল্যপুষ্প লইয়া আশীর্ব্বাদের মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক এক একটি পুষ্প কৃতী ও তাঁহার যাবতীয় পরিবার-বর্গকে দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন এবং তাঁহারা আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদককে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া প্রস্থান করেন। পাঠক! এই দৃশ্যগুলি কেমন! এই আবালবৃদ্ধবনিতা সপরিবারে একত্র হইয়া জগদীশ্বরীকে পুষ্পাঞ্জলি দান ও তাঁহার স্তুতিপাঠ ও প্রণাম, এই শান্তির জল গ্রহণ ও পরিশেষে পুরোহিতের ও প্রাচীন ও প্রাচীনা কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের আশীর্ব্বাদ ও যবিষ্টদিগের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম, এইগুলি কি অতি সুন্দর, মনোহর দৃশ্য নহে?

ইহাতে কি ভক্তি প্রেমের উদ্দীপন হয় না? আহা! হিন্দুর কি সুন্দর ব্যবস্থা! কি সুন্দর রীতি!!

অপরাহ্ণে প্রতিমা বিসর্জ্জন করিবার পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগের একটি বরণের বিধি আছে। সেটিও অতি অপূর্ব্ব বিধি! বরণ এক প্রকার পূজা বা আদর করা। স্ত্রীলোকেরা হস্ত ও অঙ্গুলি-চালনা রূপ মুদ্রাবিশেষ দ্বারা নববধূ ও জামাতাকে শঙ্খ ও উলুধ্বনি সহকারে আদর করেন। স্ত্রীলোকদিগের বিশ্বাস, এই শারদীয়া পূজার সময় দেবী কৈলাসে শিবালয় হইতে পিত্রালয়ে আইসেন। যে গৃহস্থের বাটীতে পূজা হয় সেই গৃহদম্পতিকেই দেবীর পিতৃ মাতৃস্থানীয় মনে করেন এবং তাঁহারাও কন্যানির্ব্বিশেষে দেবীর পূজা ও আদর করেন। বিসর্জ্জনকে তাঁহারা দেবীর পিত্রালয় হইতে স্বামীসদনে যাত্রা মনে করেন; কন্যাকে প্রথম শ্বশুরালয় পাঠাইবার সময় যেরূপ বরণ করিবার রীতি আছে, সেইরূপ প্রতিমা বরণ করেন। কন্যা স্বামীসদনে যাইবার সময় পিতা মাতাকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে বলিয়া তাঁহাদিগের জন্য রোদন করেন, প্রতিমার বরণ করিতে করিতে সরলমতিমহিলারা দেবী রোদন করিতেছেন মনে করিয়া, অঞ্চলবস্ত্র দ্বারা দেবীর কল্পিত অশ্রু মোচন করিয়া দেন এবং মধ্যে মধ্যে আপনা-দিগের অশ্রু মোচন করিতে থাকেন। ফলতঃ কন্যা বিদায় করিতেছি বলিয়া জ্ঞান তাঁহাদিগের এতই প্রবল হয়, যে উপস্থিত অনুষ্ঠানের কোন অঙ্গই কাল্পনিক বা কৃত্রিম বলিয়া তাঁহাদিগের বোধ হয় না এবং তাঁহারা সত্য সত্যই কন্যার

জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। তাঁহাদিগের আরক্তিম সজল-নয়ন ও ম্লান মুখমণ্ডল দেখিয়া তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বরণের পর রমণীগণ দেবীর মুখে মিষ্টান্ন ও তাম্বুলাদি দেন, আবার পরক্ষণেই প্রতিমাতে দেববুদ্ধি হইলে,সেই "সুরাসুর-শিরোরত্ননিঘৃষ্টচরণাম্বুজে''র কল্পিত রজঃ অঞ্চলবস্ত্র দ্বারা গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের মস্তকে ও নিজ নিজ সন্তান সন্ততিগণের ও অপর যাহাদিগের কল্যাণ কামনা করেন, তাহাদিগের মস্তকে দেন। কি অগাধ সরল বিশ্বাস! আপনাতে ও দেবতাতে কি অভেদবুদ্ধি! ফলতঃ পর-মাত্মার ও জীবাত্মার যে অতি নিকট ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তাহা এই সরলমতি কুলবালাগণের আচরণে যেমন স্পষ্টীকৃত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। বরণের অনুষ্ঠানটি স্ত্রীলোক দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ও হিন্দুস্ত্রীলোকেরা পুরুষমানুষের গোচরে আসিয়া কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সঙ্কোচ করেন বলিয়া, লেখক কখন বরণস্থলে উপস্থিত হইতেন না। অনন্তর কয়েক বৎসর হইল, এক বার বিজয়াদশমীতে প্রতিমার বরণ দেখিবার জন্য কৌতু-হলাক্রান্ত হইয়া গোপনে বরণ সময়ে পূজামণ্ডপে আসিয়া তাহার এক স্তম্ভের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া, সকৌতুকে বরণানুষ্ঠান দেখিতে লাগিলেন। লেখক বরণ দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না এবং এই অনুষ্ঠান পূজার এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া স্থির করিলেন।

বরণের পর প্রতিমা কতিপয় বাহকের স্কন্ধে উঠাইয়া

গঙ্গা বা নদীকূলে লইয়া যাওয়া হয় এবং কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর প্রতিমা জলমগ্ন করা হয়। প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর কৃতী সবান্ধবে বাটীতে প্রতিগমন করেন। তাঁহার প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে পূজামণ্ডপে পূর্ণকুম্ভ ও প্রজ্জ্বলিত দীপ রাখা হয় এবং এককালে অনেকে উপবেশন করিতে পারেন, এমন বৃহৎ আসন বিস্তৃত করিয়া রাখা হয় এবং দুর্গানাম লিখিবার জন্য তদুপরি কদলীপত্র, মস্যাধার ও লেখনী রাখা হয়। পূজামন্দিরে আসিয়া সকলেই সর্ব্বাগ্রে সেই অন্তর্হিত দেবীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন; পরে দশধা তাঁহার নাম জপ করেন বা লিখেন। পশ্চাৎ বিজয়াকৃত্য আরম্ভ হয় অর্থাৎ জ্যেষ্ঠানুক্রমে, সম্পর্কানুসারে, বর্ণ বা আভিজাত্য বা গুণের বিচার না করিয়া সকলকে আলিঙ্গন ও প্রণাম বা আশীর্ব্বাদ করেন। এই বিজয়াদশমী হিন্দুর বিবাদভঞ্জন ও বৈরীবিমোচনের এক প্রধান ক্ষেত্র। এই দিনে হিন্দু কাহাকেও দুর্ব্বাক্য বলেন না, কাহারও প্রতি কটূক্তি, কাহার সহিত কলহ বিবাদ করেন না। প্রত্যুত দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কাহার সহিত পূর্ব্ব হইতে মনান্তর হইয়া থাকে, তবে এই দিন সর্ব্বপ্রযত্নে সেই মনান্তরের প্রতিবিধান করেন এবং যতক্ষণ পুনর্ম্মিলন না হয়, ততক্ষণ ক্ষান্ত হন না। দুর্গোৎসব সম্মিলন ও পুনর্ম্মিলন, উভয়েরই কাল। এ বিজয়াকৃত্য যে কেবল আপন পরিবারমণ্ডলীর মধ্যে আবদ্ধ তাহা নহে। গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে গিয়া সকলে পরিচিতলোকদিগকে আলি-

ঙ্গন, প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ করিয়া আইসেন। অতি ক্রূর, কুটিল, অসার ও নির্ব্বোধলোক ভিন্ন বিবাদ-ভঞ্জনের এমন সুযোগ কেহ ছাড়ে না। এই দিনে অধিকাংশ দলাদলি, প্রতিদ্বন্দ্বীতা, মামলা মোকদ্দমার নিবৃত্তি হইয়া যায়। যাহাদিগের মনোমালিন্য এই সার্ব্বভৌমিক শান্তিপ্রদ পুনর্ম্মিলনকর বিজয়াকৃত্য প্রভাবে না বিদূরিত হয়, তাহারা অতি অভাগ্য এবং সর্ব্বনাশ না হইলে তাহাদিগের এ মালিন্য ঘুচে না।

দুর্গোৎসবের সবিস্তার বর্ণনাতে আমরা হয় ত পাঠককে শ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছি, অতএব বক্রী পর্ব্বগুলির সংক্ষেপ বর্ণনা করা যাইবে।

কোজাগর লক্ষ্মীপূজা।—লক্ষ্মীপূজা কাম্য পূজা নহে,—ইহা এক প্রকার নিত্য পূজা। ইহা সকল গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য এবং বৎসরের মধ্যে ভাদ্র, কার্ত্তিক, পৌষ ও চৈত্র এই কয় মাস সকল গৃহস্থই লক্ষ্মীপূজা করিয়া থাকে। লক্ষ্মী ধনদাত্রী এবং ধনকামনায় হিন্দু এই দেবীর পূজা করিয়া থাকে। হিন্দুস্থান কৃষীপ্রধান দেশ, এ দেশে ধান্যই ধন এবং ধান্যই সেই জন্য লক্ষ্মীদেবীর লাক্ষণিক মূর্ত্তি বলিয়া স্বীকৃত হয় ও সচরাচর যে লক্ষ্মীপূজা হয়, সে পূজা ধান্যের উপর হইয়া থাকে। কোজাগর লক্ষ্মীপূজাতে দেবীর মূর্ত্তি গঠিত হয় এবং সেই গঠিত মূর্ত্তির উপরে দেবীর পূজা হয়। ধনকামী ব্যক্তিকে কোজাগর লক্ষ্মীপূজা করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, তবে তাঁহার কামনা পূর্ণ হয়। এই জন্য

ইহাকে কোজাগর লক্ষ্মীপূজা কহে। কোজাগর পূর্ণিমাতে দেবীপক্ষের অবসান হয়। ইহার পর যে কৃষ্ণপক্ষ হয়, সেই কৃষ্ণপক্ষের শেষ দিনে অর্থাৎ অমাবস্যাতিথিতে অনেকগুলি অনুষ্ঠান আছে। এই অমাবস্যার নাম দীপান্বিতা অমাবস্যা, কেননা এই দিবস রাত্রিতে প্রতিগৃহে দীপমালা দিবার প্রথা আছে। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে এই প্রথাকে "দেওয়ালি" কহে এবং তথায় এই দীপদানের অতিরিক্ত বাহুল্য ও তদুপলক্ষে অগ্নিক্রীড়া অর্থাৎ বাজি হয়। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের লোকেরা এই পর্ব্বে আলোকবিন্যাস ও অগ্নিক্রীড়াদিতে বিস্তর অর্থ ব্যয় ও উৎসাহ করে। এই অমাবস্যাতে পিতৃলোকের পূজা অর্থাৎ পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিতে হয়। পিতৃলোকেরা মহালয়াতে মর্ত্ত্যলোকে সন্তানসন্ততির পিণ্ড গ্রহণ করিতে আইসেন ও দীপান্বিতা অবধি ইহলোকে থাকিয়া পিতৃলোকে গমন করেন। এই অমাবস্যাতে লক্ষ্মীপূজাও হইয়া থাকে। এ পূজায় প্রতিমা হয় না। দিবসে পিতৃলোকের পূজা অর্থাৎ শ্রাদ্ধ, প্রদোষে লক্ষ্মীপূজা ও দীপান্বিতাকৃত্য; অনন্তর ঐ দিবস মহানিশাতে কালীপূজা হয়। কালী আদ্যাপ্রকৃতি। ভগবতী কৌশিকীর রূপান্তর মাত্র। শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধে রক্তবীজবধের সময় এইরূপের বিকাশ হয়।

"চামুণ্ডাখ্যাং দাধানা মুপশমিত মহারক্তবীজোপসর্গাং"। যখন অম্বিকা ও মাতৃকাগণের শর ও অস্ত্রাঘাতে রক্তবীজের শরীর হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল, যত বিন্দু রক্ত

মহীতলে পড়িতে লাগিল, ততগুলি রক্তবীজের আকারে রক্তবীজের তুল্য বীর্য্য ও পরাক্রমশালী অসুরের উদয় হইতে লাগিল এবং সেই অসুরেরা দেবীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ভগবতী ইহা দেখিয়া চামুণ্ডাকে বলিলেন "তুমি বদন বিস্তার কর এবং রক্তবীজের শরীর হইতে যত রক্ত ক্ষরণ হইবে, তাহার বিন্দুমাত্র পৃথিবীতে না পড়ে; সমস্ত জিহ্বাতে গ্রহণ করিয়া পান করিয়া ফেল।" এইরূপে রক্তবীজ বধ হইল। এই মুর্ত্তির পূজা পৃথিবীতে প্রথমে স্বায়ম্ভুব মনু করেন।

স্বায়ম্ভুবেন মনুনা মর্ত্ত্যেতেন প্রপূজিতা,
মৃণ্ময়ীং প্রতিমাং কৃত্বা কালী বিদ্যা প্রসীদতি।

এই পূজা মহানিশিতে করিয়া রাত্রিতে প্রতিমা বিসর্জ্জন করিতে হয়। এক রাত্রির পূজা, সুতরাং স্বল্পব্যয়সাধ্য বলিয়া প্রায় সকলেই এ পূজা করিয়া থাকে। এই অমাবস্থার অনুষ্ঠেয় কার্য্যগুলি আশ্বিন কি কার্ত্তিকমাসের অনুষ্ঠান, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সৌরচান্দ্রে ও শাবণ মাসের দিন সংখ্যার ন্যূনাধিক্য ও তিথির ক্ষয় বৃদ্ধির নিয়ম বশতঃ এই তিথি কখন আশ্বিন কখন কার্ত্তিক মাসে পড়ে। সুতরাং উপরি উক্ত পর্ব্বগুলি আশ্বিন মাসের কর্ত্তব্য কি কার্ত্তিক মাসের কর্ত্তব্য, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না, আশ্বিন মাসে ঘটিতে পারে কার্ত্তিক মাসেও ঘটিতে পারে। এই পর্ব্বসমূহ তিথির অনুগামী। কালীপূজার পর অর্থাৎ অমাবস্থার পর, শুক্লাদ্বিতীয়াতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বলিয়া আর একটি অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠান আর কিছু

নয়, ভগিনীগণ ভ্রাতাগণকে এই তিথিতে নববস্ত্র পরিধান করাইয়া উপাদেয় দ্রব্যাদি আয়োজন করিয়া উত্তমরূপে আহার করান ও আহারকালে ঘৃতের গণ্ডূষ দেন। এই অনুষ্ঠানে যমের ও তাঁহার ভগিনী যমুনার প্রীতি হয় এবং আনুষঙ্গিক ভগিনীগণের স্নেহাস্পদ অনুজ সকল ও তাহাদিগের ভক্তিভাজন অগ্রজগণ দীর্ঘায়ুঃ হন, ইত্যাকার বিশ্বাস আছে।

কার্ত্তিক মাস।—কার্ত্তিক মাসে কার্ত্তিকেয় পূজা। কার্ত্তিকমাসের শেষ দিবসে অর্থাৎ সংক্রান্তির দিনে এই পূজা হয়; পুত্রকামিগণ এই পূজা করেন। রাত্রিকালে এই পূজা করিতে হয়। প্রহরে প্রহরে কার্ত্তিকেয়দেবের পূজা এবং চারি প্রহর রাত্রিতে তাঁহার চারিবার পূজা হয়। পূজাতে ভগবান কার্ত্তিকেয় প্রসন্ন হইলে যে ব্যক্তি পূজা করে, সে পুত্রবান বা পুত্রবতী হয়। কার্ত্তিক মাসের আর একটি অনুষ্ঠান আছে। এই মাসে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সকল গৃহস্থ আকাশপ্রদীপ দিয়া থাকে। এক অতি দীর্ঘ-কাষ্ঠের দণ্ড (সচরাচর বৃহৎ লম্বা বাঁশই ব্যবহৃত হয়) বাটীর প্রাঙ্গণে প্রোথিত করা হয়, তাহাতে রজ্জুসংযোগে দীপাধার সংলগ্ন থাকে। সায়ংকালে সেই দীপাধার নামাইয়া তাহাতে প্রজ্জ্বলিত দীপ দিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সেই দীপ বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে ঊর্দ্ধে ঐ রজ্জুসহকারে উঠাইয়া দেওয়া হয়। সকল গৃহস্থ এইরূপ করে বলিয়া, কার্ত্তিকমাসে সন্ধ্যার সময় হিন্দুজনপদে একটি শোভা হয়। ঊর্দ্ধে অগ্নি

বা আলোক থাকিলে, সেই অগ্নি বা আলোক নীচের বায়ুকে আকর্ষণ করে। বর্ষাবসানে ভূমি স্থানে স্থানে জলমগ্ন এবং সর্ব্বত্রই রসযুক্ত থাকে। শরতের রবিকিরণে এই জল বা ভূমি উত্তপ্ত হইয়া তাহা হইতে এক বিকৃত বাস্পোদ্গম হয়। এই বিকৃত বাস্প চারিদিকে বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া এক প্রকার পীড়াত্মক দূষিত বায়ুর উদয় হয়। এই বায়ু প্রভাবে কার্ত্তিকমাসে রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। আকাশ প্রদীপ দ্বারা এই বায়ু উর্দ্ধে কিয়ৎ পরিমাণে নীত হইলেও জীবের অনিষ্টের লাঘব হয়। এই জন্য বোধ হয় প্রাচীনেরা কার্ত্তিকমাসে ভগবানের প্রীত্যর্থে শূন্য দীপদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জীবের অনিষ্টের লাঘব হইলে, ভগবানের প্রীতি জন্মে ; ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য, প্রমাণ সাপেক্ষ নহে।

অগ্রহায়ণ মাস।—এই মাসে জগদ্ধাত্রী পূজা হয়। ইহা এক প্রকার সংক্ষেপ দুর্গাপূজা। শুক্লানবমীতে এই পূজার অনুষ্ঠান হয়, দুর্গা বা মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তির ন্যায় এই দেবীর মূর্ত্তি এবং এক দিবসেই অর্থাৎ নবমী তিথিতেই সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ক্রমান্বয়ে তিন তিথির তিন পূজা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রাও এই মাসে হইয়া থাকে। কৃষ্ণাবতারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মাকে পতিরূপে ধ্যান, চিন্তা, উপাসনা ও সেবা করিয়া পতি পত্নীর তীব্র প্রেম তাঁহাতে জন্মাইবার উদ্দেশ্যে, জীবশিক্ষার জন্য বৃন্দাবনধামে গোপাঙ্গনাগণের সহিত যে ক্রীড়া করিয়াছিলেন

ও কৃষ্ণপ্রেমে তাঁহাদিগকে উন্মত্তা করিয়া তুলিয়াছিলেন, রাসযাত্রা সেই ক্রীড়ার অনুকরণ। বৈষ্ণবসম্প্রদায়েরলোকেরা এই উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে আরম্ভ করিয়া দিবসত্রয় এই উৎসব হয়। বৃন্দাবনের ন্যায় গৃহস্থের পূজামণ্ডপ, কৃত্রিমপাদপ, পুষ্প, লতা, গাভি, বৎস, গোপ, গোপী, ময়ূর প্রভৃতি বৃন্দাবনচারী বিহঙ্গ, পশু ও নরনারী দ্বারা সুসজ্জিত হয় এবং সেই ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের ও জীবাত্মার কল্পিত প্রতিরূপ শ্রীমতিরাধিকার বিগ্রহ স্থাপিত হয় এবং দ্বিদল চনক ফলের ন্যায় একমেবাদ্বিতীয়ং পরমাত্মার প্রকৃতিপুরুষাকারে পূজা হয়।

পৌষ মাস।—এই মাসে দেব দেবীর কোন প্রতিমাদির পূজা নাই; কিন্তু ইহা উৎসব বর্জ্জিত নহে। এই মাসে শস্য সুপক্ক হয়, কৃষী শস্যচ্ছেদ করিয়া শস্য গৃহে আনয়ন করে এবং মাসের শেষ দিনে অর্থাৎ সংক্রান্তির দিবসে মহাসমারোহে প্রতি গৃহে লক্ষ্মীদেবীর পূজা হয় এবং আপামর সাধারণ সকল গৃহস্থ নানাবিধ পিষ্টক ও পায়স প্রস্তুত করিয়া আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, কুটুম্ব ও ভরণীয়বর্গ সমবেত হইয়া মহা আনন্দের সহিত আহারাদি করিয়া শস্যরূপী লক্ষ্মীর উৎসব সমাপন করে।

মাঘ মাস।—এই মাসে শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীদেবীর পূজা হয়। দুর্গোৎসব বর্ণনাস্থলে বলা হইয়াছে; এই দেবী আদ্যাপ্রকৃতির মূর্ত্ত্যন্তর মাত্র, ইনি বিদ্যার অধিষ্টাত্রী দেবতা। একদিনের পূজা স্বল্প ব্যয় সাধ্য বলিয়া

অনেকেই এই পূজা করে। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ অবচ্ছেদাবচ্ছেদে সরস্বতীপূজা সকলেই করেন এবং চতুষ্পাঠী ও টোলের ছাত্রগণের এই পূজাতে বিশেষ উৎসাহ ও আমোদ। সরস্বতী পূজা কাম্য পূজা নহে, ইহা নিত্য পূজা ও সকলেরই কর্ত্তব্য। মস্যাধার, লেখনী ও পুস্তকাদি দেবীর লাক্ষণিক মূর্ত্তির উপর আপামরসাধারণ সকলেই সরস্বতী পূজা করে। যাঁহারা সমারোহে পূজা করেন, তাঁহারই প্রতিমা গঠন করিয়া তদুপরি দেবীর অর্চ্চনা করেন। প্রতিমা পূজা করিলেও প্রতিমার নিকট মস্যাধারাদি রাখিতে হয়। এই পর্ব্বে অনধ্যায় হয় অর্থাৎ লিখন ও পঠন নিষেধ।

ফাল্গুন মাস।—এই মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে শিবরাত্রি ব্রতের অনুষ্ঠান হয়। ইহাতে কোন প্রতিমা পূজা নাই। উপবাস করিয়া ভক্ত রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক চারিপ্রহর রাত্রিতে শিবের চারিবার পূজা করেন; অনন্তর প্রাতঃকালে স্নানাহ্নিক করিয়া যে উপলক্ষে এই ব্রতের উদয় হয়, তৎসম্বন্ধে কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া পারণ করেন। এই মাসে শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীকৃষ্ণর দোল যাত্রা হয়। শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ বিষ্ণুর অভিষেক, পূজা ও ব্রাহ্মণভোজন পর্ব্বের প্রধান অঙ্গ এবং আনুষাঙ্গিক অগ্নিক্রীড়া ও পিচকারী দ্বারা ফাগু মিশ্রিত রঞ্জিত জল অলক্ষিত ভাবে বয়স্য গণের গাত্রে সিঞ্চন করা অথবা শুষ্ক ফাগু অতর্কিত ভাবে তাঁহাদিগের চক্ষুতে দিয়া তাঁহাদিগকে অপ্রতিভ করা এই ক্রীড়া কৌতুক ও গান বাদ্য এই পর্ব্বে

বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা এই পর্ব্বকে হোলী বলে এবং তাহারা ফাগু ও পিচকারীর ক্রীড়াতে উম্মত্ত প্রায় হয়; তাহারা লঘুগুরু বিচার করে না এবং ফাগুতে ও পিচকারীর জলে ভদ্র ও ধনবান লোকদিগের অতি মূল্যবান বেশভূষা বিকৃত করিয়া দেয়। শুক্লা একাদশী হইতে পঞ্চমী পর্য্যন্ত এই পর্ব্ব চলিতে থাকে, এই কয়েক দিন ভদ্রলোকের পক্ষে পথে বাহির হওয়া দুষ্কর হয়।

চৈত্রমাস।—এই মাসের সংক্রান্তিতে চড়ক নামক এক পর্ব্ব হয়। এই দিনে পরম শৈব বাণ রাজা মহাদেবের প্রীত্যর্থ বন্ধু বান্ধবের সহিত মিলিত হইয়া শিবভক্তিসূচক সঙ্গীতে প্রমত্ত হইয়া নিজগাত্রের রুধির দান করেন। ইতর-জাতীয় হিন্দুরা এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ পূর্ব্বক কতকগুলি একত্র হইয়া গাজন করে। চৈত্রমাসের আরম্ভ হইতে তাহারা ব্রহ্মচর্য্য করে এবং এক এক সম্প্রদায়, এক একদিকে বাদ্যসহকারে শিবনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বিচরণ করে। এইরূপে একমাস কাল নিয়ত ব্রহ্মচর্য্য ও শিবোপাসনা করিয়া তাহাদিগের উপাস্য দেবতার উপর এত বিশ্বাস ও নির্ভর জন্মে, যে সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন ঝাঁপ-সন্ন্যাস বলিয়া এক অনুষ্ঠান হয়; ইহাতে প্রায় বিংশতি হস্ত পরিমিত উচ্চ মঞ্চের উপর হইতে তাহারা একে একে "নাথ হে—নাথ শিব হে!" বলিয়া ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে কণ্টক বা অস্ত্রের উপর হৃদয় পাতিয়া পতিত হয় এবং

সকলেই অব্যাহত উঠিয়া দেবতাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করে। অনন্তর সংক্রান্তির দিন দেবস্থানে গিয়া এক এক অঙ্গ অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ করিয়া দেবতাকে রুধির দান করে। দেব যে রুধির লোলুপ এবং তিনি পান করিবেন বলিয়া যে তাঁহাকে রুধির দান করা হয়, তাহা নহে। শরীরের রুধিরই শরীরীর জীবন, তাহার প্রাণ। রুধির দান দ্বারা দেবতাকে প্রাণ সমর্পণ করা হইল, এই বুদ্ধিতেই বোধ হয় এই অনুষ্ঠান করা হয়। শিব রক্তপ্রিয় নহেন, তাঁহাকে স্বাত্তিক ও নিরামিষ ভোগ দেওয়া হয়। তিনি পান করিবেন বলিয়া, ভক্ত তাঁহাকে নিজগাত্রের রুধির দেয় না। অনন্তর রুধির দানের পর অস্ত্রদ্বারা অঙ্গের যেখানে ছিদ্র করা হইয়াছে, সেই ছিদ্রমধ্যে লৌহ বা কাষ্ঠশলাকা প্রবিষ্ট করিয়া শলাকা চালনা করিতে করিতে সকলে নৃত্য ও উল্লাস করিতে থাকে। পরিশেষে অপরাহ্নে গাজনের শেষ অনুষ্ঠান হয়। গ্রাম বা নগরের প্রান্তে কোন বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে এক উচ্চতম বৃক্ষের কাণ্ড প্রোথিত করা হয়। তাহার শিখর দেশে চক্রসংলগ্ন বংশগুচ্ছের চারিবাহু চারি- দিকে প্রসারিত থাকে, বাহু চতুষ্ঠয়ে স্থূল রজ্জু সংলগ্ন এবং সেই রজ্জু শূন্যে কিয়দ্দূর অবধি লম্ববান থাকে। চক্রে সংলগ্ন আর এক গাছি স্থূল রজ্জু বৃক্ষের মূল অবধি লম্বমান থাকে। বাহুর রজ্জু আশ্রয় করিয়া চারিজন চারিদিকে ঝুলিতে থাকে, আর বৃক্ষমূলের রজ্জু ধরিয়া একজন লোক ঘূরাইতে থাকে; এই

প্রক্রিয়া দ্বারা যাহারা বাহুর রজ্জু আশ্রয় করিয়া ঝুলে, তাহারা শূন্যমার্গে অতিবেগে ঘুরিতে থাকে। ইহাতে যাহারা ঘুরে ও যাহারা দেখে, উভয়েরই বড় কৌতুকও আনন্দ হয়। ইহাকে বলে চড়কগাছে ঘূরণ বা চরকীর পাক খাওয়া। ঝাঁপসন্ন্যাস, বাণফোঁড়া, চরকীর পাক খাওয়া, এইসমস্ত বীভৎস দর্শন ও ইহাতে প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে বলিয়া রাজাজ্ঞায় এই সমস্ত অনুষ্ঠান ইদানীং রহিত হইয়াছে।

চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে অনেকে দুর্গোৎসব করিয়া থাকে এবং শুক্লাষ্টমীতে অন্নপূর্ণাদেবীর পূজা করে। আশ্বিন-মাসের দুর্গোৎসবকে শারদীয় পূজা বলে ও শ্রীরামচন্দ্র এই পূজার অনুষ্ঠান করেন; কিন্তু সুরথ রাজা এই পূজার প্রথম অনুষ্ঠান করেন। সুরথ রাজা চৈত্রমাসে পূজা করেন; অতএব তাঁহার দুর্গোৎসব বাসন্তীপূজা বলিয়া আখ্যাত হয়।

হিন্দুর বার মাসে তের পার্ব্বণ; এই পরম্পরাগত বাক্য আছে। এতদ্ভিন্ন আবার মধ্যে মধ্যে হিন্দু আগন্তুক পার্ব্বণ উপস্থিত করেন। হিন্দু ধর্ম্মপ্রাণ, ধর্ম্ম তাঁহার জীবনের সহিত ওতপ্রোত ভাবে অনুস্যূত। দশ বার জন বয়স্যের সহিত একত্রে আমোদ করিতে হইবে, ইহাতেও হিন্দুর ধর্ম্মের উপলক্ষ চাই, এইরূপে বারইয়ারি বলিয়া এক পর্ব্বের উদয় হয়। বারইয়ার অর্থাৎ কতকগুলি সমবয়স্ক লোক একত্র হইয়া ভিক্ষা, চাঁদা বা অপর কৌশলে অর্থ সংগ্রহ

করিয়া বাজার বা কোন সাধারণ ভূমিতে কোন দেব দেবীর প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া তাঁহার পূজা করেন ও তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজন, দরিদ্রদিগকে মিষ্টান্ন দান, অধ্যাপক দিগকে অর্থদান ও নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান করিয়া স্বাধীন-ভাবে আনন্দ করেন। ইহার নাম বারইয়ারী।

বারইয়ারী দুই প্রকার আছে। এক প্রকার মহাজনী বারইয়ারী অর্থাৎ মহাজন বাণিজ্যকারীলোকেরা যাহার অনুষ্ঠান করে; আর এক প্রকার সামাজিক বারইয়ারী, যাহার অনুষ্ঠান সমাজের লোকেরা করিয়া থাকে। কোন পণ্যবীথীতে যত পণ্যশালা বা বিপনি থাকে, প্রত্যেক বিপনির স্বামী সম্বৎসর কাল নিরস ক্রয়, বিক্রয়, কার্য্য ও তাহার লাভালাভ গণনা করিয়া হৃদয় শুষ্ক হয় বলিয়া, বৎসরান্তে দুই তিন দিন আমোদ করিয়া হৃদয়ের শান্তি বিধান করিবেন বলিয়া, তাঁহারা দৈনন্দিন আয়ের এক অতি সূক্ষ্মতম ভগ্নাংশ এক পার্শ্বে ফেলিয়া রাখেন। বর্ষশেষে এই ভগ্নাংশগুলির সমষ্টিতে একটি বিলক্ষণ স্থূলধন হয় এবং সকল বিপনির স্বামীর সঞ্চিতধন একত্রিত হইলে যথেষ্ট অর্থ তাঁহাদিগের আয়ত্ত হয় এবং সেই অর্থে মহাসমারোহে তাঁহাদিগের মহাজনী বারইয়ারী পূজা হইয়া থাকে। সামাজিক বারইয়ারীর নিত্য অর্থাগমের একটিমাত্র উপায় আছে। প্রতি গ্রামে যত কন্যার বিবাহ হয়; সেই বিবাহ উপলক্ষে গ্রামস্থ লোকেরা বরপক্ষীয়দিগের নিকট এক প্রকার কর আদায় করেন। বরপক্ষীয়েরা কন্যাদান প্রাপ্ত হন এবং

তাহার সঙ্গে সঙ্গে বহু অর্থ ও দ্রব্যজাত লাভ করেন বলিয়া, তাঁহারা আনন্দের সহিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সমাজের সকল শ্রেণীর লোককে কিছু কিছু দান করেন। ভদ্রলোক-দিগকে দুই প্রকার দান করেন অর্থাৎ "গ্রামভেটী" ও "বারইয়ারী।" গ্রামভেটী বলিয়া যে টাকা দেওয়া হয়, তাহাতে গ্রামের পথঘাটের সংস্কার করা হইয়া থাকে এবং বারইয়ারীর টাকাতে উক্ত সামাজিক বারইয়ারীর অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। বিবাহ লব্ধ অর্থ যদি বারইয়ারী পূজার ব্যয় নির্ব্বাহের উপযোগী না হয়, তাহা হইলে সমাজের লোকেরা ভিক্ষা ও চাঁদার দ্বারা আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ করেন।

আর একপ্রকার আগন্তুক পর্ব্ব আছে, অর্থাৎ রক্ষাকালী ও শীতলা পূজা এবং নগরসংকীর্ত্তন। কখন কোন স্থানে মারীভয় উপস্থিত হইলে তাহার শান্তির জন্য এই সকল পর্ব্বের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবে শীতলাদেবীর পূজা হয় এবং অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে রক্ষাকালী পূজা ও নগর সংকীর্ত্তন হইয়া থাকে।

এই সমস্ত নিত্য ও আগন্তুক পর্ব্ব ও বিবিধ ব্রতানুষ্ঠানাদি ব্যতীত হিন্দু সময়ে সময়ে অনেক কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন যথা,—পুরাণ পাঠ, তুলা পুরুষ দান, অন্নমেরু, শিব প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। দানই হিন্দুর সকল ধর্ম্ম্য অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। অন্নদান, অর্থদান; কিন্তু

গৃহীতাগণ চিরদিন উপকার লাভ করে এমন কোন দানের বিধি নাই। উপরে যে কয়েকটি কাম্য কর্ম্মের উল্লেখ করা হইল, তাহার মধ্যে শেষোক্তটির দ্বারা সাধারণের চিরস্থায়ী উপকার হইয়া থাকে। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে যাহার মধ্য দিয়া লোক সর্ব্বদা যাতায়াত করে, সেই খানে আঢ্য-লোকেরা বড় বড় দীর্ঘিকা খনন করাইয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। অধ্বশ্রান্ত পথিকেরা আতপতাপিত হইয়া এই সমস্ত দীর্ঘিকা বা জলাশয়ে অবগাহন জলপানাদি দ্বারা গতক্লম হয় ও শান্তি লাভ করে। এই উদ্দেশ্যে পুষ্করিণ্যাদি জলাশয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

হিন্দুদিগের বিবিধ উৎসব ও ক্রিয়া কলাপ প্রভাবে হিন্দুজনপদের নিত্য জীবন্তভাব দেখা যায়। এখানে বাদ্যো-দ্দম হইতেছে, ওখানে সঙ্গীতের ধ্বনি উঠিতেছে, স্থানান্তরে ভোজের বা কাঙ্গালীবিদায়ের কোলাহল হইতেছে, এইরূপে সর্ব্বত্রই লোকে একটা না একটা উপলক্ষ লইয়া উৎসাহ পূর্ণ অবস্থায় কাল যাপন করে। আজি অমুকের পুত্রের অন্নপ্রাশন, আজি অমুকের পৌত্রের উপনয়ন, আজি অমুকের কন্যার বিবাহ, আজি দুর্গোৎসব, আজি রথযাত্রা, আজি দোলযাত্রা, আজি নগর সংকীর্ত্তন, আজি বারইয়ারী, আজি রক্ষাকালী পূজা, আজি পুরাণ পাঠ এইরূপে হিন্দুর প্রতিদিনই আনন্দ উৎসাহের উপলক্ষ উদয় হইতেছে ও হিন্দু সেই আনন্দ উৎসাহের সলিলে সুখে সন্তরণ করিতে থাকেন। যদি দুরদৃষ্ট ক্রমে হিন্দুকে কখন বিজাতীয়

সমাজে পতিত হইতে হয়, তিনি মৃতকল্প হইয়া থাকেন, কোন দিকে কোন আনন্দসূচক ব্যাপার দেখিতে পান না; পৃথিবী যেন মরিয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার বোধ হয় এবং তিনি সেই মৃতা পৃথিবীর শব কোলে করিয়া রোদন করিতে থাকেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হিন্দুর আচার অর্থাৎ তাঁহার নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য-ক্রিয়াদি সমস্ত বর্ণিত হইল। আচার বর্ণনে স্থানে স্থানে এমন শব্দ বা শব্দ পরম্পরা প্রয়োগ করা হইয়াছে, যদ্দ্বারা আচারান্তর সূচিত হইয়াছে; কিন্তু সেই আচার পৃথক ও পরিস্ফুটরূপে কুত্রাপি বর্ণিত হয় নাই। এই অধ্যায়ে এই সকল অনুক্ত বা উহ্য আচার সবিস্তার ও পরিষ্কার রূপে বর্ণনা করিয়া বক্ষ্যমান বিষয়ের উপসংহার করা যাইবে।

স্নান সম্বন্ধে আচার বর্ণনাস্থলে বলা হইয়াছে যে "দীর্ঘ-কেশধারী" কেশরাজি বিভাগ করিয়া মজ্জন করিবেন। এই "দীর্ঘকেশধারী" শব্দ পাঠ করিয়া পাঠক মনে করিতে পারেন যে হিন্দুর দীর্ঘকেশধারণের রীতি ছিল। বস্তুতই হিন্দুর দীর্ঘকেশ ধারণ করিবার প্রথা পূর্ব্বে ছিল। চূড়া-করণ সংস্কারে হিন্দুর প্রথম কেশচ্ছেদ হয়, এই কেশচ্ছেদ কালে কাহারও একটি, কাহারও বা দুইটি কেশগুচ্ছ বা শিখা রাখা হয়। ইহার পর বিশেষ উপলক্ষ ভিন্ন আর কেশচ্ছেদের বিধি কোন স্থলে নাই। এই বিশেষ উপলক্ষ পিতৃ মাতৃ বিয়োগ ও প্রয়াগতীর্থে গমন। এই তিন উপ-লক্ষে হিন্দু মস্তক মুণ্ডন করেন। এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রে স্পষ্টা-ক্ষরে নিষেধ আছে "বৃথা বিকচ মা ভবেৎ"। অদ্যাপি অবধূত

ও সন্ন্যাসীগণ দীর্ঘকেশ ধারণ করেন দেখিতে পাওয়া যায়। চূড়াকরণ সংস্কারের সময় যে একটি কি দুইটি শিখা রাখা হয়, পূজা ও ধ্যান কালে সেই শিখা বন্ধন করিতে হয় এবং পূজা বা ধ্যানাবসানে শিখা মুক্ত করিতে হয়।

প্রথম অধ্যায়ের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে মানুষের মস্তিষ্ক একটি প্রবল তড়িদুৎপাদক যন্ত্র। চিত্তবৃত্তির অবিশ্রান্ত ক্রিয়া প্রভাবে এই তড়িৎ উদ্গম হয়। ধ্যান কালে চিত্তবৃত্তির অতি প্রখর ক্রিয়া হয়, সুতরাং তখন তড়িদুদ্গম হয়। তড়িতের ধর্ম্ম এই যে ইহা দেহের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ হইতে বহির্গত হয়। বোধ হয় তড়িৎ উদ্গম ধ্যান ও পূজা অনুষ্ঠানের পক্ষে অনুকূল এবং যাহাতে তড়িৎ নির্গত না হইতে পারে, পূজকের সেইটি আবশ্যক; এই জন্য ধ্যানকালে শিখা বন্ধ করিয়া রাখা হয় এবং ধ্যানাবসানে তাহাকে মুক্ত করা হয়। এই শিখা হিন্দুমাত্রেই ধারণ করেন।

প্রাচীন যিউগণ দীর্ঘকেশ ধারণ করিতেন এবং প্রথম অধ্যায়ের সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদের টীকা পাঠ করিয়া পাঠক দেখিতে পাইবেন, যে চীন ও জাপানীয়েরাও দীর্ঘকেশ ধারণ করে। যীশুখ্রীষ্ট দীর্ঘকেশ ধারণ করিতেন; তাহা তাঁহার যেখানে যত প্রতিমূর্ত্তি আছে, দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যিউদিগের মধ্যে স্যাম্‌সন্‌ নামক এক জন প্রবলপরাক্রান্ত সেনানী ছিলেন। তাঁহার অপরিমিত

শারীরিক বলবীর্য্য ছিল। যিউ ও ফিনিসীয়দিগের মধ্যে যখন যুদ্ধবিগ্রহ হয়, এই স্যাম্‌সনের বিক্রমে ফিনিসীয়েরা সর্ব্বত্রই পরাভূত হইত। স্যাম্‌সন্ অতিশয় ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন। ফিনিসীয়েরা মনে করিত, যে ইহাঁর ঈশ্বর-পরায়ণতা নিবন্ধন কোন দৈবশক্তি জন্মিয়াছে, তাহারই প্রভাবে ইনি সকলকে পরাস্ত করেন। এই বিশ্বাসে স্যাম্‌সনের দৈবশক্তি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে, তাহারা "দালাইলা" নাম্নী এক পুংশ্চলীকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিল, যে "দালাইলা" তাহার হাব ভাব, রূপলাবণ্য স্যাম্‌-সন্‌কে দেখাইয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিবে ও ভগবান হইতে তাঁহার চিত্তকে বিচলিত ও প্রত্যাহৃত করিবে। দালাইলার মোহিনীশক্তি স্যাম্‌সনের দৃঢ়তাকে প্রতিহত করিতে পারিল না। অনন্তর পুংশ্চলী কৌশলক্রমে মহাত্মা স্যাম্‌সনের এক গুচ্ছ কেশ কর্ত্তন করিয়া হরণ করিল এবং তাহা ফিনিসীয়দিগের হস্তে অর্পণ করিল। এই রূপ কথিত আছে, যে স্যাম্‌সনের কেশহরণ কালাবধি তাঁহার বল-বিক্রমের হ্রাস হইতে লাগিল এবং তিনি পরিশেষে ফিনি-সীয়দিগের নিকট সপর্য্যুদস্ত হইলেন। মুসলমানেরা দীর্ঘ শ্মশ্রু ধারণ করেন এবং তাহাকে অতি পবিত্র জ্ঞান করেন ও কেহ তাহা স্পর্শ করিলে তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি অত্যাচার হইল বলিয়া মনে করেন। এই রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, যে প্রাচীন কালে পৃথিবীর অনেক জাতিতেই কেশ শ্মশ্রুকে পবিত্র জ্ঞান করিত। হিন্দু ইদানীং যদিও দীর্ঘকেশ ধারণ

করেন না, কিন্তু সকলেই শিখা ধারণ করেন এবং যে কারণে শিখা ধারণ করেন, তাহার আভাস উপরে দেওয়া হইয়াছে।

শালগ্রাম শিলার সংস্কার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে উক্ত অনুষ্ঠান পঞ্চগব্য দ্বারা করা হয়। গোময়, গোমূত্র, দুগ্ধ, ঘৃত, দধি এই পঞ্চদ্রব্যের নাম পঞ্চগব্য। গোময় হিন্দু-দিগের মধ্যে অতি পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। গোময় যে নিজে কেবল পবিত্র, তাহা নহে; ইহার পবিত্রীকরণো-পযোগী শক্তি আছে এবং অমেধ্য বস্তুস্পর্শে যে স্থান বা বস্তু অপবিত্র হইয়াছে, তাহাতে গোময় লেপন করিলে পবিত্র হয়,—হিন্দুদিগের এইরূপ বিশ্বাস। এমন যে শাল-গ্রামশিলা যাহার পর পবিত্র আর কিছুই নাই এবং যাহা সেই পুণ্যপ্রস্রবণ ভগবান বিষ্ণুর প্রশস্ত আধার বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহার সংস্কার গোময় দ্বারা করিতে হয়। যেখানে উচ্ছিষ্ট পড়ে অথবা বিষ্ঠা মূত্রাদি অমেধ্য বস্তু পড়ে, সে স্থানে গোময় লেপন করিলেই পবিত্র হয়।

গোময়ের এই একটি ধর্ম্ম আছে, যে ইহা সংক্রমণ নিরোধক। অমেধ্য বস্তুর সংস্রবে বা গন্ধে প্রকৃত অবস্থার বিকার অথবা রোগোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা কিন্তু গোময় দ্বারা সেই অমেধ্য বস্তুর সাংক্রামিক ধর্ম্ম নিরোধ করা যায়, এই জন্য অমেধ্য বস্তু অপসারিত করিয়া তথায় গোময় লেপন অথবা জলেতে গোময় মিলিত করিয়া সেই জল অভ্যুক্ষণ করা হয়। এই জন্য গোময় এত পবিত্র বলিয়া

পরিগণিত হয়। গো-মূত্রের সংক্রমণ নিরোধক শক্তি আছে বলিয়া কোথাও উক্ত নাই, কিন্তু ইহার জ্বরঘ্ন একটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে। ফলতঃ যে যে দ্রব্য পবিত্র বা দেবতার প্রীতিকর বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে ,সকলেরই এক একটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে—যদ্দারা মানুষের বিশেষ উপকার হয়। তুলসীপত্র ও বিল্বপত্র যাহা দেবতাদিগের পূজোপচার তাহাদিগের অনেক প্রকার রোগনিবারণের শক্তি আছে। বিল্বপত্র জরঘ্ন, তুলসীপত্রও জরঘ্ন এবং ইহাতে আর আর রোগের প্রতিকার হইয়া থাকে। যেস্থলে অনেক তুলসীবৃক্ষ থাকে, তথা হইতে দূষিত পীড়োৎপাদক বায়ু যাহা সচরাচর "Malaria" বলিয়া অভিহিত হয়, অপসারিত হয়। মনুষ্যের উপকারজনক ধর্ম্ম আছে বলিয়া এই গোময়, তুলসীপত্র, বিল্বপত্র প্রভৃতি পবিত্র ও দেবতার তৃপ্তিকর বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে, যে মানুষ সর্ব্বদা অবাধে এই সকল বস্তু ব্যবহার করিয়া রোগ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবে।

আহারঘটিত আচার বর্ণনা স্থলে বলা হইয়াছে, যে অতিথি,অভ্যাগত এবং দাস, দাসী,অবশ্যভরণীয়বর্গকে আহার না করাইয়া হিন্দু আহার করেন না। "অবশ্যভরণীয়বর্গ" এই শব্দ পরম্পরা সামাজিক বা পারিবারিক আচারের প্রতি কটাক্ষ করিতেছে। সামাজিকতা জীব মাত্রেরই ধর্ম্ম; অর্থাৎ সকল জীবই স্বজাতীয় ও স্বশ্রেণীর জীবের সহিত সংসর্গ ও সহবাস করিতে ভালবাসে। জীব উত্তরোত্তর যত উন্নত হইয়া আইসে, অর্থাৎ সর্ব্বাবয়ব, সর্ব্বেন্দ্রিয়, হৃদয়

বৃত্তি, চিত্তবৃত্তি ও পশুবৃত্তি প্রভৃতি যাবতীয় বৃত্তি ও শক্তি সম্পন্ন হয়, ততই এই সামাজিকতা ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত ও প্রবল হয়। গো মহিষ একজাতীয়, কিন্তু ভিন্নশ্রেণীর জীব। ইহারা একত্র সংসর্গ করিতে ভালবাসে না। গরু, গরুর সহিত, মহিষ, মহিষেরই সহিত সহবাস করিতে ভালবাসে; কিন্তু মানুষ ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সহিত সংসর্গ করিতে সঙ্কোচ করে না। তাহাদিগের পরস্পরের ভাষায় পরস্পরের অধিকার থাকিলে, অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের মনের ভাব অবাধে বিজ্ঞাপন করিতে ও বুঝিতে পারিলে, ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সহিত সুখে সংসর্গ করে। এইরূপে হিন্দু ইংরাজের সহিত, ইংরাজ চীনের সহিত, চীন জুলুর সহিত সংসর্গ করিয়া থাকে।

হিন্দুর সামাজিক ধর্ম্মটি অতিশয় প্রবল। দুইজন ইংরাজ পরস্পর অপরিচিত এক যানে বসিয়া সহস্রাধিক মাইল পর্য্যটন করিবেন, অথচ পরস্পর বাক্যালাপ করিবেন না; কিন্তু দুইজন অপরিচিত হিন্দু এক স্থানে বসিলে মুহূর্ত্তকালও অপরিচিত থাকেন না। তাঁহারা পরস্পরে পরস্পরের নিজের ও পিতৃপিতামহাদির নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া একটা সম্পর্ক গুছাইয়া লন। আধুনিক সভ্যজাতিদিগের বিচারে অপরিচিত ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করা প্রগল্‌ভতা ও নিন্দনীয় ব্যবহার, কিন্তু হিন্দু অপরিচিত ব্যক্তি নিকটস্থ হইলেই সর্ব্বাগ্রে তাহার নিজের ও পিতৃপিতামহাদির নাম ধাম জিজ্ঞাসা করেন; বোধ হয় তাঁহারা

পরস্পর সংসর্গ করিতে পারেন কিনা ও পরস্পরের ভোজ্যান্নতা হইতে পারে কিনা, ইহা জানিবার জন্যই এইরূপ আচারের উদয় হইয়াছে। পূর্ব্বভাষিতা অর্থাৎ উদাসীনব্যক্তিকে প্রথম সম্ভাষণ করা একটি অতি প্রশংসনীয় ধর্ম্ম। দশরথতনয় শ্রীরামচন্দ্রের এই ধর্ম্ম ছিল বলিয়া পুরাণে বর্ণিত আছে। যিনি উদাসীন ব্যক্তিকে প্রথম সম্ভাষণ করিতে সঙ্কোচ করেন, তিনি অভিমানের নিতান্ত দাস, ইহারই পরিচয় পাওয়া যায়। ফলতঃ বিশেষ উদারতা না থাকিলে কেহ পূর্ব্বভাষী হইতে পারে না। হিন্দু যে সে ব্যক্তির সহিত সংসর্গ ও ভোজ্যান্নতা করিতে পারে না, সেই জন্য পূর্ব্বভাষিত তাঁহার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বভাষিত আধুনিক সভ্যতার নিয়ম বিরুদ্ধ বলিয়া আধুনিক যুবকেরা কাহারও পরিচয় গ্রহণ করেন না। হয়ত এক ব্যক্তির সহিত বর্ষাধিক কাল সংসর্গ করিয়াছেন কিন্তু তাহার নিবাস কোথায়, তাহার জাতি কি ও তাহার পিতৃপিতামহাদির নাম কি তাহা জানেন না এবং এই কারণে অনেক সময়ে এমন ঘটনা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি অপাংক্তেয় ও হীনজাতি, তাহার সহিত বসিয়া তাহার স্পৃষ্টান্ন আহার করিয়াছেন।

সামাজিক ধর্ম্মেরই এক উচ্চ অঙ্গ পারিবারিক ধর্ম্ম। মানুষের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, দুহিতা, জ্যেষ্টতাত, খুল্যতাত, পিতৃব্যপত্নী, পিতৃস্বষা, মাতৃস্বষা প্রভৃতি নানা সম্পর্ক আছে। ইতর জন্তুর পরস্পর সম্পর্কের

এত বাহুল্য নাই। ইতর জন্তুদিগের মধ্যে কেবল মাতা ও সন্তান এই দুইটি সম্পর্ক লক্ষিত হয় এবং এই সম্পর্ক ও অচিরস্থায়ী। শাবক নিজের আহার সংগ্রহক্ষম ও আত্মরক্ষাপটু হইলেই এই মাতা ও সন্তানের সম্পর্কও তিরোহিত হইয়া যায়। আরও নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে এ সম্পর্ক দৃষ্ট হয় না। অনেক নিকৃষ্ট জীব সন্তান প্রসব করিয়াই তাহাকে গ্রাস করে। অতএব সম্পর্ক বিস্তার উন্নত জীব মানুষের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আধুনিক জাতিরা যদিও সকল শক্তি ও বৃত্তিসম্পন্ন, তথাপি তাহাদিগের পিতা-মাতা ও সন্তান সম্পর্কটি নিকৃষ্ট জন্তু-দিগের ন্যায় অচিরস্থায়ী। সন্তান আত্মরক্ষণে ও আত্মপোষণে সমর্থ হইলেই এ সম্পর্ক তিরোহিত হয়; অর্থাৎ সন্তান সক্ষম হইলেই পৃথক হইয়া থাকে এবং স্ত্রী ও পুরুষ লইয়া তাহাদিগের একটি পরিবার হয়। হিন্দুর উল্লিখিত সম্পর্ক-গুলি চিরস্থায়ী এবং দিন দিন তাহার শাখা প্রশাখা হইয়া হিন্দুপরিবার বিস্তীর্ণ হইতে থাকে। বংশধর তাঁহা হইতে উৎপন্ন সন্তান সন্ততিগণ ও তাহাদিগের পুত্র কলত্রাদি লইয়া আমরণ একস্থানে বাস করেন ও সকলকে ভরণ পোষণ করেন অর্থাৎ যতদিন তাহাদিগকে স্থান দিয়া ও আহার দিয়া আপনার নিকট রাখিতে পারেন, ততদিন রাখেন। সন্তান সন্ততিগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে ও তাহারা সক্ষম হইলে তাহারা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া পৃথক থাকিবার স্থান ও পৃথক আহারাদির ব্যবস্থা করে,—কিন্তু বংশের

আদিপুরুষ কি কর্ত্তা কখন কাহাকেও নিজালয় হইতে বিদায় করেন না বা তাহাদিগের ভরণ পোষণের ভার বহনে অস্বীকৃত হন না। সকলের একত্র থাকিবার এই প্রণালীতে অনেক অসুবিধা ও অশান্তি উপস্থিত হয় এবং সন্তান সন্ততিগণের স্বাবলমন বৃত্তিটিও স্ফূর্ত্তি হইতে পায় না। কিন্তু অসুবিধা ও অশান্তির প্রতিকারের জন্য আর সন্তান সন্ততির স্বাবলম্বন বৃত্তির স্ফূর্ত্তির জন্য কেবল স্ত্রী পুরুষে এক একটি পরিবার বদ্ধ হইয়া থাকাতে আর একটি অনর্থ উপস্থিত হয। এই আধুনিক প্রণালীতে লোককে নিতান্ত স্বার্থপর করে ও সৌভ্রাত্র্য, অপত্যস্নেহ, পিতৃমাতৃভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম যাহা মানুষকে উন্নত ও শ্রদ্ধাস্পদ করে-তাহার মূলে কুঠারাঘাত করে। হিন্দু শান্তি ও সুবিধার সহিত এই সকল ধর্ম্মের বিনিময় করিতে, অর্থাৎ এই সমস্ত ধর্ম্ম দিয়া শান্তি ও সুবিধা ক্রয় করিতে অশক্ত; হিন্দু যদি কেবল মাত্র স্ত্রী ও পুরুষে একত্র থাকিতেন, তাহা হইলে অনায়াসে বেশ ভূষা করিয়া গাড়ি চড়িয়া অট্টালিকায় বাস করিয়া উপাদেয় ও রাজভোগ্য দ্রব্য নিচয় উপভোগ করিয়া রাজার ন্যায় কালযাপন করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার সে প্রবৃত্তি নাই। তিনি ভগিনী ,ভাগিনেয়, দৌহিত্র, দৌহিত্রী ও তাহাদিগের পতি পত্নীকে আহারাচ্ছাদন দিয়া আপনি সামান্য আহার ও সামান্য বেশভূষা করিয়া সুখী হন। এই ভাগিনী ভাগিনেয় ইহারাই অবশ্য ভরণীয়বর্গ। ইহাদিগকে বস্ত্রালঙ্কার, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার, ও সুখে বাস করিবার

স্থান দেওয়া হিন্দু পরমধর্ম্ম মনে করেন। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে এতৎসম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে বিধান আছে, যে পুরুষ, আপনার কল্যাণ চান তিনি ভগিন্যাদি পোষ্যাবর্গকে সর্ব্বদা বস্ত্রালঙ্কার দিয়া সুখে রাখিবেন, যে সংসারে এই পোষ্যবর্গ কষ্টপায় এবং ক্লিষ্ট হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে, সে সংসার অচিরাৎ উৎসন্ন হয়। যথা মনুঃ—

যাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥

হিন্দু সর্ব্বোতোভাবে পরার্থপর। পরের উপকার করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ও লক্ষ্য। হিন্দুর সাহিত্যে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, যথা—

তে তে সৎপুরুষাঃ পরার্থঘটকাঃ স্বার্থস্য বাধেন যে।
মধ্যস্থাঃ পরকীয় কার্য্যকুশলাঃ স্বার্থাবিরোধেন যে॥
তেঽমি মানুষরাক্ষসাঃ পরহিতং যৈর্হন্যতে স্বার্থতঃ।
যে চ ঘ্নন্তি পরহিতং নিরর্থকং তে কে ন জানি মহে॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বার্থের হানি করিয়া পরার্থ সাধন করে; সেই সাধু সৎপুরুষ, আর যে ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষা করিয়া যতদূর পরার্থ সাধন হয় তাহা করে, সে ব্যক্তি মধ্যম, আব যে ব্যক্তি স্বার্থ সাধনের জন্য পরের অনিষ্ট করে, সে মানুষরূপী রাক্ষস, আর যে ব্যক্তি নিরর্থক পরের ক্ষতি করে অর্থাৎ যে কার্য্যদ্বারা আপনার কোন উপকার নাই অথচ পরের অনিষ্ট হয় এমন কার্য্য করে, সে যে কি তাহা বলিতে পারি না। কবি, তাহাকেই সাধু সৎপুরুষ বলিতেছেন, যিনি স্বার্থের

হানি করিয়া পরার্থ সাধন করেন। এখনকার ইংরাজী-শিক্ষিত যুবকদিগের নিকট কেহ কিছু প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা বলিয়া থাকেন "Charity begins at home" অর্থাৎ দাতৃত্বের আরম্ভ নিজগৃহে, কি না গৃহে সন্তান সন্ততির প্রতি দাতৃত্ব করিয়া পশ্চাৎ বাহিরের লোককে দান করিতে হয়; যে দাতৃত্ব গৃহে আরম্ভ হয়, সে পাশ্চাত্য দাতৃত্ব।

দাতৃত্বের কালাকাল স্থান অস্থান বা পাত্রাপাত্র বিবেচনা নাই। যেখানে জীব কষ্ট পাইতেছে দেখিবে, সেইখানেই দাতৃত্ব হস্ত বিস্তার করিয়া যতক্ষণ কষ্টের মোচন না হয়, মুক্তহস্তে দান করে। "হাতেমতাই" বলিয়া একজন মুসলমান জাতীয় সওদাগর ছিলেন। তিনি অসাধারণ দাতা ছিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে, তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে পর অনেকক্ষণ দুগ্ধপান করেন নাই। সুস্থ সবল শিশু, অপর শিশুর ন্যায় হাত পা নাড়িতেছে, খেলা করিতেছে, ফুট্ ফুট্ করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে, কোন পীড়া কি উপসর্গের লক্ষণ নাই, কিন্তু শিশু দুগ্ধ পান করে না। সওদাগর, সওদাগরশিশু দুগ্ধ পান করে না কেন বলিয়া ব্যাকুল হইলেন এবং অনেক বৈদ্য ও সুচিকিৎসক আনাইয়া শিশুটিকে দেখাইলেন। তাঁহারা শিশু দুগ্ধ পান করে না কেন, তাহার নিদান কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সওদাগর, কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। চিকিৎসকেরা শিশুকে দুগ্ধ খাওয়াইতে না পারিলে, অনেক দৈবজ্ঞ ও জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত আহূত হইল।

জ্যোতির্ব্বিদগণ গণনা করিয়া বলিলেন যে, শিশু, ইহার সমকালীন যাবতীয় শিশু যতক্ষণ দুগ্ধ না পায়, ও খায়, ততক্ষণ দুগ্ধ পান করিবে না। অমনি সওদাগর চারিদিকে চর প্রেরণ করিলেন যে তাহারা হাতেমতাই যে সময়ে ভূমিষ্ঠ হয়, সেই সময়ে তাঁহার দেশের ভিতর আর কোথাও কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছে কি না ও ভূমিষ্ঠ হইয়া দুগ্ধ পান করিতে পাইয়াছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে জ্ঞাপন করে। অনতিবিলম্বে প্রকাশ হইল যে অনেক শিশু ভুমিষ্ঠ হইয়াবধি দুগ্ধ খাইতে পায় নাই। সওদাগর তখনি তাহাদিগের জন্য দুগ্ধ পাঠাইলেন, তাহারা দুগ্ধ পান করিলে পর হাতেমতাই স্বচ্ছন্দে দুগ্ধ পান করিলেন। হাতেমতাইয়ের দাতৃত্ব গৃহে আরম্ভ হয় নাই। হিন্দুর দাতৃত্বও সেইরূপ, ইহা গৃহে আরম্ভ হয় না। ইহার কোন বিচার বা গণনা নাই। জীবের কষ্ট দেখিলে ও নিজের সেই কষ্টের প্রতীকার করিবার তৎকালে উপায় থাকিলে তৎক্ষণাৎ প্রতিকার করিবেন,তাহা করিয়া পরিণাম কি হইবে তাহা গণনা বা বিচার করেন না। হয়ত বিপন্ন ব্যক্তিকে যে উপায় দ্বারা তখন উদ্ধার করিলেন সেই উপায় তাঁহার নিজের বা পুত্র কলত্রাদির রক্ষার নিমিত্ত পরিণামে আবশ্যক হইবে কিন্তু কোন্ কালে তাঁহার নিজের আবশ্যক হইবে বলিয়া যে বস্তুর দ্বারা কোন জীব আপাততঃ রক্ষা হইতে পারে, সে বস্তু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া উপস্থিত বিপন্ন লোক তদভাবে চক্ষুর উপর ধড়্ ফড়্ করিয়া মারা

পড়িতেছে যে দেখিতে পারে, সে দাতৃত্বের কি ধার ধারে? তাহার দাতৃত্ব আকাশকুসুম বা শশবিষাণের ন্যায় অলীক ও অসম্ভব!

হিন্দুর দাতৃত্ব অতি উচ্চ আদর্শের দাতৃত্ব। দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হইবেন এই বার্ত্তা যখন প্রচার হইল, সুর নর সকলেই এই স্ত্রীরত্ন লাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন। নলরাজার রূপলাবণ্য ও গুণগ্রামের কথা শুনিয়া দময়ন্তী তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন, তাহাও সকলে জানিতেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বয়ম্বরস্থলে যাইবার পূর্ব্বে যাহাতে নলরাজা দময়ন্তীর জন্য অর্থী না হইতে পারেন, তাহার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, "নল অতি ধর্ম্মাত্মা এবং অর্থীকে কখন প্রত্যাখ্যান করেন না। আমরা যে দময়ন্তীর জন্য অর্থী, এ কথা যদি আমরা নল দ্বারা দময়ন্তীর গোচর করিবার জন্য নলকে আমাদিগের দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত করি, তাহা হইলে তাঁহার দময়ন্তীর নিকট নিজের জন্য কোন প্রার্থনা করিবার অধিকার থাকিবে না।" এইরূপ মনন করিয়া দেবতারা নলরাজার নিকট গমন করিলেন। রাজভবনে আসিয়া তাঁহারা কি জন্য আসিয়াছেন সে কথা স্পষ্টাক্ষরে না বলিয়া তাঁহারা রাজাকে কেবল মাত্র এই কথা বলিলেন, "আমরা অর্থী।" "আমাদিগের কি প্রার্থনা, তাহা বিশ্রামানন্তর জ্ঞাপন করিতেছি।" নলরাজা দেবতাদিগের এই কথা শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন;—

মীয়তাং কথমভিপ্সীত মেষাং।
দীয়তাং দ্রুতমযাচিত মেব॥
তং ধিগস্তু কলয়ন্নপি বাঞ্ছা।
মর্থিবাগবসরং সহতে যঃ॥

অর্থাৎ ;—ইহাঁদিগের কি প্রার্থনা কেমন করিয়া অনুমান করিব? অথচ অর্থী উপস্থিত হইবা মাত্র তাহাকে দান করা উচিত। যাচ্ঞা করিতে যে লজ্জা, অপমান বুদ্ধি ও যন্ত্রণা হয়, অর্থীকে সে যন্ত্রণা না দিয়া অবিলম্বে দান করা উচিত। অর্থীর কি বাঞ্ছা, তাহা জানিবার জন্য অর্থীর বাক্স্ফূর্ত্তি যতক্ষণে হয়, এই বিলম্ব যে সহ্য করিতে পারে তাহাকে ধিক্। প্রকৃত দাতা অর্থীর "বাগবসর" কাল ও সহ্য করিতে পারেন না; অর্থী উপস্থিত হইবামাত্র দান করেন। কোন হিন্দু কবি লিখিয়াছেন ;—

যাচমান জনমানসবৃত্তিপূরণায় বত জন্ম ন যস্য।
তেন ভূমিরতিভারবতীয়ং নদ্রুমৈ নগিরিভির্ণ সমুদ্রৈ॥

অর্থাৎ যাচকের মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য যাঁহার জন্ম হয় নাই, তাঁহার ভারেই পৃথিবী ভারবতী হন; বৃক্ষ কি পর্ব্বত, কি সমুদ্রাদির ভারে পৃথিবী এত ভারগ্রস্তা হন না।

রাজা মান্ধাতার নাম সকলেই শুনিয়াছেন। তিনি অতি প্রাচীন কালের এক রাজা ছিলেন। প্রাচীন কালের কোন বস্তু বা বিষয়ের উল্লেখ হইলে, লোকে বলিয়া থাকে ইহা মান্ধাতার আমলের কথা। মান্ধাতা অতি প্রবল ও

প্রতাপান্বিত সসাগরা রাজ্যের রাজা ছিলেন। মান্ধাতার যখন চরমকাল উপস্থিত হয় এবং তিনি সুরধনীতীরে আসিয়া মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছেন, সেই সময়ে অনেক লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন,—তন্মধ্যে দেবর্ষি নারদ ছিলেন; দেবর্ষিকে দেখিয়া মুমূর্ষু রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি কি আবার মান্ধাতা হইতে পারিব?" অর্থাৎ "আমি যেরূপ প্রতাপান্বিত সসাগরা পৃথিবীর রাজা ছিলাম, পরজন্মে কি সেইরূপ রাজা হইতে পারিব?" দেবর্ষি উত্তর করিলেন, "যে পুণ্যপ্রভাবে তুমি ইহজন্মে মান্ধাতা হইয়াছিলে, সেইরূপ কোন পুণ্য যদি ইহজন্মে করিয়া থাক, তাহা হইলে আগামী জন্মেও মান্ধাতা হইতে পারিবে,—তাহার অশ্চর্য্য কি?" তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! আমি কি পুণ্যবলে ইহজন্মে মান্ধাতা হইয়াছিলাম, তাহা কৃপা করিয়া বলিলে পরম অনুগৃহীত হই।" দেবর্ষি বলিলেন, "রাজন, তুমি পূর্ব্বজন্মে অতি দরিদ্র ভিক্ষোপজীবী ছিলে। তুমি যে রাজ্যে বাস করিতে, তথায় একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। দুর্ভিক্ষ প্রভাবে অসংখ্য লোক অনাহারে ও অনাহার ও কদাহারজনিত পীড়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। রাজ্যের রাজা দেখি-লেন, তাঁহার সকল প্রজাক্ষয় হইতে লাগিল। প্রজা-ক্ষয় হইলে পর, দেশাধিকার করিয়া তাঁহার কি লাভ? এই জন্য দুর্ভিক্ষের বেগ প্রশমিত করা, প্রজা রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিলেন। শারীর-

স্থানপণ্ডিত ও বহুদর্শী ও বিজ্ঞলোকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া অবধারণ করিলেন, যে জীব উপর্য্যুপরি বিংশতি-দিবস অনাহারে প্রাণ ধারণ করিতে পারে,—বিংশতি দিবসের অধিককাল অনাহারে প্রাণাত্যয় হয়। অনন্তর প্রজা সংখ্যার সমষ্টি করিলেন এবং বিংশতি দ্বারা সেই সংখ্যা বিভাজিত হইলে যে লোক সংখ্যা হয়, বিংশতি দিবস অন্তর ততগুলি লোকের আহার রাজা দিবেন এমন ব্যবস্থা করিলেন ;—অর্থাৎ যদি প্রজাসংখ্যা দশলক্ষ হইত, তাহা হইলে প্রতিদিন পঞ্চাশহাজার লোকের আহারের ব্যবস্থা করিবেন এবং যে পঞ্চাশ হাজার লোক প্রথম দিনে আহার করিবে, তাহারা আবার বিংশতি দিবসের পর রাজার নিকট হইতে আহার পাইবে। এইরূপ নিয়মে প্রজাবর্গকে আহার দিয়া রাজা প্রজা রক্ষা করিবেন স্থির করিয়া পঞ্চাশ হাজার লোক বসিয়া খাইতে পারে, এইরূপ এক বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করিলেন এবং তাহার একটি দ্বার রাখিয়া এই নিয়ম করিয়া দিলেন, যে প্রতিদিন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ বেলা একটার কি দুইটার সময়ে ঘণ্টা বাজাইয়া বা ঘড়িতে আঘাত করিয়া সঙ্কেত করা যাইবে যে আহার প্রস্তুত হইয়াছে। এই সঙ্কেতধ্বনি শুনিয়া আহারার্থীলোকেরা সেই প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিতভূমিতে প্রবেশ করিবে এবং পঞ্চাশহাজার লোক প্রবিষ্ট হইলে দ্বার রুদ্ধ হইবে। তদনন্তর প্রাচীরান্তর্গত সমস্ত লোকগুলিকে আহার দেওয়া

হইবে। প্রতিদিন পঞ্চাশ হাজার লোককে আহার দেওয়া হইবে, কিন্তু আজি যে পঞ্চাশহাজার লোক খাইবে, আবার বিংশতিদিবস অতীত না হইলে তাহারা আর আহার পাইবে না। এইরূপ নিয়মে দুর্ভিক্ষাহত রাজ্যের প্রজা বিংশতিদিবস অন্তর এক এক দিন আহার পাইয়া প্রাণ ধারণ করিয়া রহিল। রাজন! তুমি বিংশতি দিবস অনাহারের পর এক দিন সেই প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছ, অন্ন পরিবেশন হইতে লাগিল, কেহ বা আহার করিতে লাগিল, কেহ আহার করিবার উপক্রম করিতেছে—অর্থাৎ অন্নের গ্রাস মুখে দিতে যায়, এমন সময়ে তুমি প্রাচীরের বর্হির্দেশ হইতে "ওরে! আমার আজ কুড়ি দিন খাওয়া হয় নাই, আজি অন্ন না পাইলে আমার প্রাণ বাহির হইবে!" ইত্যাকার আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলে, তোমার অন্নের গ্রাস আর মুখে উঠিল না; তুমি নিকটস্থ কোন লোককে অনুরোধ করিলে, যে "আমার হাত ধরিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেও আর যে ব্যক্তি এই আর্ত্তনাদ করিতেছে, তাহাকে আমার এই পাতে বসাইয়া দেও।" তাহাই করা হইল। তোমার কুড়ি দিন আহার হয় নাই, অস্থিচর্ম্মাবশেষ হইয়াছে; যেমন তোমাকে হাত ধরিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল, অমনি তোমার প্রাণাত্যয় হইল এবং যাহাকে তোমার অন্ন দেওয়া হইল, সে আহার করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা হইল। রাজন, এই পুণ্যে তুমি ইহজন্মে মান্ধাতা হইয়াছ। এবম্বিধ কোন পুণ্য যদি ইহ-

জন্মে করিয়া থাক, তবে আগামী জন্মে মান্ধাতা হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি ?"

রাজা মান্ধাতা পূর্ব্ব জন্মে উপর্য্যুপরি বিংশতি দিবস অনাহারে থাকিয়া একবিংশতি দিবসে মুখের অন্ন অপর ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির আর্ত্তনাদে ত্যাগ করিয়া তাহাকে দিয়া পরার্থপরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হিন্দুঃ এইরূপ পরার্থপরতা, এইরূপ দাতৃত্ব।

আমরা প্রথমাধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছি, যে হিন্দু দরিদ্র জাতি ; ফলতঃ হিন্দু দরিদ্র নহে। যে দেশের ভূমি এত উর্ব্বরা, যে দেশে দেশ দেশান্তর হইতে বণিক আসিয়া বাণিজ্য করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, সেই দেশের লোকেরা দরিদ্র হইবে ইহা অসম্ভব। হিন্দু সম্পন্ন ও সম্পত্তিশালী,—কিন্তু তাঁহার কোন বাহ্যাড়ম্বর নাই! তিনি দরিদ্র নহেন কিন্তু তাঁহার আড়ম্বর নাই বলিয়া তাঁহাকে দরিদ্রের ন্যায় দেখায়। অনেক হিন্দুর এমন আয় ও সঙ্গতি আছে যে, তাঁহারা চৌমহলায় থাকিতে পারেন ও চৌকুড়ি হাঁকাইতে পারেন ; কিন্তু তাহা করিতে গেলে তাঁহাদিগের পোষ্যবর্গকে বর্জ্জন করিয়া কেবল স্ত্রী পুরুষে সংসার করিতে হয়, ইহা হিন্দুর ধর্ম্ম ও রুচি বিরুদ্ধ। হিন্দু ইহলৌকিক সুখের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। তাঁহার লক্ষ্য নিরন্তর কেবল পরলোকের প্রতি। তাঁহার দেবতা সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্রই জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে ওষধী ও বনস্পতিতে ও যাবতীয় জীবে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাহা তিনি সর্ব্বদা

প্রত্যক্ষ করেন। হিন্দুর একটি আচার আছে, যে তিনি পশুরজ্জুলঙ্ঘন করেন না। পথের ধারে যদি ছাগ কি গবাদি বাঁধা থাকে, আর তাহার বন্ধন রজ্জুর সহিত পথে আসিয়া পড়ে, তবে হিন্দু চলিতে চলিতে সে রজ্জু মাথার উপর দিয়া ফেলিয়া দেন—অথবা সে পথ ছাড়িয়া অপর পথ দিয়া যান; পশুর রজ্জু কোন মতেই লঙ্ঘন করেন না। পশুরজ্জু লঙ্ঘন করিলে যে পরমাত্মা সেই পশুতে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকেই লঙ্ঘন বা অবমাননা করা হয়, এই বুদ্ধিতে হিন্দু পশু রজ্জু লঙ্ঘন করেন না। নিরন্তর পরলোকের প্রতি লক্ষ্য ও নিরন্তর আপনার দেবতার সমক্ষে বিচরণ করিতেছেন, এইরূপ বিশ্বাস বশতঃ হিন্দুকে সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক; উপস্থিত বিষয় হইতে তাহার চিত্ত সর্ব্বদাই প্রত্যাহৃত ও অপসারিত। তিনি যেন ইহলোকে থাকিয়াই লোকান্তর ভোগ করিতেছেন, তাঁহার স্বর্গ যেন পৃথিবীতেই আরম্ভ হইয়াছে; সেই জন্য ইহলৌকিক সুখসমৃদ্ধিতে তাঁহার এতাদৃশ ঔদাস্য এবং আপন দেবতাকে সর্ব্বজীবে বিদ্যমান দেখিয়া তিনি জীবের প্রতি এত দয়াবান ও এত পরার্থপর হন।

আহার ঘটিত আচার বর্ণনস্থলে ইহাও কথিত হইয়াছে, যে নব বিবাহিতা স্ত্রী, পুত্রবধূ, দুহিতা ও গর্ভবতীদিগকে কোন বিচার না করিয়া অতিথির অগ্রে আহার করাইবে। অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে, যে হিন্দু পরিবারের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি কোন আদর ও যত্ন নাই। নব বিবা-

হিতা স্ত্রী প্রভৃতির আহার সম্বন্ধে যে আচারের কথা উল্লিখিত হইল, তদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে এ সংস্কার নিতান্ত ভ্রমাত্মক। কোথায় কে কি করে, তাহা জানা যায় না, হয়ত কোন মহাত্মা স্ত্রীলোকদিগকে কষ্ট দেন; কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে বিধান আছে যে স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বদা সমাদর করিবে। মনু বলিয়াছেন, "যে কুলে নারীগণের সম্যক সমাদর আছে, দেবতারা তথায় প্রসন্ন থাকেন,—আর যে পরিবারে স্ত্রীলোকের পূজা নাই, সেই পরিবারের যাগাদি ক্রিয়া কর্ম্ম সমুদায় বৃথা হইয়া যায়।" অপিচ যে পরিবারের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদাই দুঃখিত থাকে, সেই কুল আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যথায় স্ত্রীলোকের কোন দুঃখ নাই, সেই পরিবারের সর্ব্বদা শ্রীবৃদ্ধি হয়। স্ত্রীলোকগণ অসৎকৃত থাকাতে যে গৃহে অভিসম্পাত করেন, সেই কুল অভিচারাভিহতের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব যাঁহারা শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, বিবিধ সৎকার্য্য কালেই হউক আর উৎসব কালেই হউক, নিত্যই অশন, বসন, ভূষণের দ্বারা স্ত্রীলোকের সমাদর করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। অতএব স্ত্রীলোকদিগকে আদর করা সম্বন্ধে যখন ধর্ম্মশাস্ত্রে স্পষ্ট বিধান আছে, তখন তাহারা যে সর্ব্বত্র অনাদৃত ও অবজ্ঞাত হয়, ইহা কোন মতে সম্ভব নহে। হিন্দু ইংরাজের মত পত্নীর চরণ ধরিয়া অশ্বারোহণ করান না বা অশ্ব হইতে অবরোহণ করাইয়া দেন না। কেননা, হিন্দুমতে পতি স্ত্রীলোকের পরম গুরু; কিন্তু প্রকারান্তরে হিন্দু

পত্নীকে যথেষ্ট পূজা করেন। অনেকে বলিয়া থাকেন, যে হিন্দু স্ত্রীলোকদিগকে সামান্য গৃহকার্য্য যাহা দাস দাসী দিগের দ্বারা নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহাতেই ব্যাপৃত রাখেন; বুদ্ধিবৃত্তির চালনা হয় যদ্বারা এমন কোন উন্নত কার্য্যের ভার স্ত্রীলোককে দেন না। যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহারা বোধহয় রাজকীয় কার্য্যালয়ে গিয়া দুই চারি বা ততোধিক পংক্তি লিখিয়া, বা কোন জটিল আয়-ব্যয়-স্থিতি বিবরণীর ভ্রমসঙ্কুল আবরণ ভেদ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া তাহার সমাধান করিয়া, সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ পূর্ব্বক ব্যবস্থাসংহিতা দেখিয়া ব্যবহারা-জীবীদিগের তর্ক বিতর্ক শুনিয়া কোন ব্যবহার বা মোক-দ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া, মনে করেন, যে তাঁহারা বড় গুরুতর কার্য্য করিতেছেন; কিন্তু স্ত্রীলোকেরা গৃহে বসিয়া কোন প্রকার আড়ম্বর না করিয়া তাঁহাদিগের অপেক্ষা অতিশয় গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সে কার্য্যের গৌরব তাঁহাদিগের কুৎ করিবার অর্থাৎ তাহার গুরুত্বের পরিমাণ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা নাই। শিশুপালন, রোগীর সেবা এবং উপায়ক্ষম পতি পুত্র সমস্ত দিন বিজাতীয় পরিশ্রম ও চিন্তা দ্বারা অবসন্ন হইয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইলে, তাহাদিগকে স্নেহ ও শুশ্রূষাদি দ্বারা সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করা ও আগামী দিবস আবার যাহাতে কার্য্যক্ষম হইতে পারেন, তাহা করা; এই সমস্ত কার্য্য স্ত্রীলোকেরা গৃহে বসিয়া করেন। পুরুষ! তোমার এক একটি কার্য্যের

সহিত এই কার্য্যগুলির তুলনা করিয়া দেখ, কাহার মূল্য অধিক। একটি শিশুকে দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট করিয়া দেওয়া, কি সেবার দ্বারা রোগীর রোগ যন্ত্রণার শান্তি করার মূল্য অধিক, না তোমার বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় দুই এক খানি পত্র লিখন, বা কোন জটিল আয়-ব্যয়-স্থিতি-বিবরণীর সমাধানের মূল্য অধিক ? তোমার আজিকার কার্য্যে ও চিন্তায় মস্তিষ্ক আবিল হইয়া গেলে কালি আবার কি লইয়া কার্য্য করিবে ? তোমার সে সঙ্গতি স্ত্রীলোকেরাই করিয়া দেয়। ফলতঃ বাষ্পীয়শকট যেমন অধিক দূর পর্য্যটন করিলে তাহার চক্রে স্নেহ দ্রব্য দিতে হয়, দিলে পর আবার সে শকট পর্য্যটন করিতে পারে; তেমনি পুরুষ উৎকট শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের পর স্ত্রীর সস্নেহ সম্ভাষণাদি দ্বারা সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইয়া আগামী দিবসে কার্য্যক্ষম হন। অতএব স্ত্রীলোকের কার্য্য সামান্য নহে ও তাহা দাস দাসীর দ্বারা নির্ব্বাহ হইবার নহে। যদি শিশুপালনাদি কার্য্যের কোন গুরুত্ব নাই থাকে; কিন্তু সেগুলি যে নিতান্ত আবশ্যক, সে পক্ষে কোন সংশয় নাই। স্ত্রীলোকেরা যদি সেই কার্য্য না করে ও তোমার মতে যাহা উন্নত কার্য্য অর্থাৎ দুই পংক্তি লিখন অথবা একটা হিসাব সমাধান করণ বা একটা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণ, এই সকল কার্য্য যদি তাহাদিগকে দেওয়া যায় তবে তাহারা আপাতত যে কার্য্য করে, তাহার ভার তুমি কি লইতে পার ? শিশুপালনে ও রোগীর সেবায় নিরতিশয় হৃদয়ের কোমলতা ও অগাধ প্রেম ও সহিষ্ণুতা

আবশ্যক. এই সমস্ত ধর্ম্মে তুমি নিতান্ত দরিদ্র। শিশু বা রোগীর অসঙ্গত প্রার্থনায় তুমি একবারে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে ও তাহাদিগের প্রতি এরূপ তাড়না ও ঝঙ্কার করিবে, যে শিশু ত তোমার নিকট আর কখন আসিবে না আর রোগীর যন্ত্রণার শান্তি না হইয়া তাহা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে। তুমিও "যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্যেরে লাঠি বাঁজে" বলিয়া শিশু ও রোগীর নিকট হইতে প্রস্থান করিবে। তোমাকে ভগবান তাড়না ও শাসনের জন্য আর কোমলাঙ্গী, কোমল-হৃদয়া নারীকে প্রেমের কার্য্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব তাহার বিপর্য্যয় করিবার চেষ্টা করা নিতান্ত বাতুল ও মূঢ়ের কর্ম্ম! গৃহস্থের আপাতত পরিশ্রমের যে বিভাগ আছে, তাহা কাদাচিৎক ও কাকতালীয়বৎ নহে। সৃষ্টি-কর্ত্তার নিয়মানুসারে এইরূপ হইয়াছে—অর্থাৎ শারীরিক পরিশ্রম ও চিন্তাসাধ্য বাহিরের কার্য্য তুমি করিবে এবং প্রেম ও সহিষ্ণুতাদি ধর্ম্ম দ্বারা যে কার্য্য সাধিত হইবে, তাহা স্ত্রীলোকেরা গৃহ মধ্যে থাকিয়া করিবে। হিন্দুরমণী-গণের গৃহকার্য্যের মধ্যে প্রধান কার্য্য রন্ধন। হিন্দুর এই কার্য্য দাস দাসী দ্বারা নির্ব্বাহ হইবার নহে। মুটে, মজুর, ম্লেচ্ছদিগের দ্বারা অন্নপাক হইলে যাহারা সে অন্ন গ্রহণ করিতে পারে, তাহাদিগের রমণীগণ পাককার্য্য না করিতে পারেন কিন্তু হিন্দু তাঁহার রমণীগণকে যদ্যপি পত্র লিখিতে বা হিসাব সমাধান করিতে বা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে শিক্ষা দেন ও সেই সমস্ত কার্য্য তাহাদিগের দ্বারা

করান, তথাপি তাঁহাদিগকে রন্ধন কার্য্য করিতে হইবে, নতুবা তাঁহাকে বাহিরের কার্য্য ত্যাগ করিয়া নিজে পাক-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

নববিবাহিতা স্ত্রী, পুত্রবধূ, দুহিতা ও গর্ভবতী স্ত্রীদিগকে কোন বিচার না করিয়াই অতিথির অগ্রেই আহার করাইবার বিধি ধর্ম্মশাস্ত্রে দিয়াছেন। এখন এই অতিথি কি বস্তু, দেখা যাউক। পঞ্চসূনাবধ জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত পঞ্চমহাযজ্ঞের বিধি হইয়াছে। সেই পঞ্চ মহাযজ্ঞ এই ;—ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থাৎ বেদপাঠ, পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ ও তর্পনাদি, নৃযজ্ঞ অর্থাৎ অতিথি সৎকার, ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ বলি। এই নৃযজ্ঞ অথবা অতিথি সেবা হিন্দুদিগের একটি প্রধান অনুষ্ঠান। অতিথির সেবা না করিয়া হিন্দু নিজে আহার করিতে পারেন না। শালগ্রাম শিলার ভোগ ও বালক, বালিকা, রোগী, কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতি অবশ্য-ভরণীয়বর্গকে আহার করাইয়া গৃহদম্পতি অতিথির জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকেন ; অনন্তর অতিথি সমাগত হইলে, তাঁহার সেবা করিয়া শেষভুক্ গৃহদম্পতি আহার করেন। হিন্দুসমাজে "হোটেল" "রেষ্টরাণ্ট" প্রভৃতি পাকশালা নাই, সুতরাং যাঁহারা কার্য্যানুরোধে মধ্যাহ্নকালে পথে থাকেন, তাঁহাদিগকে আহারের জন্য গৃহস্থের আশ্রয়ে উপস্থিত হইতে হয়। ব্রহ্মচারী, দণ্ডী ও সন্ন্যাসিগণ আতিথ্য স্বীকার ত অবশ্যই করেন, কিন্তু পান্থশালার অভাব প্রযুক্ত প্রত্যহই অতিথি লাভ হয়, হিন্দুর বাটীর মধ্যে এক প্রকোষ্ঠ বা

প্রদেশ অতিথি সেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। মধ্যাহ্ন কালে হিন্দুর বাটীতে গেলে, নিশ্চয়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে একটি না একটি অতিথি সেই প্রকোষ্ঠে পাক করিতেছেন এবং গৃহস্বামী তথায় উপস্থিত থাকিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিতেছেন। অতিথি যদি গৃহস্বামীর স্বগোত্র হন অথবা তাঁহার সহিত গৃহস্বামীর কোন সম্পর্ক থাকে, তাহা হইলে গৃহিণী পাক করিয়া অতিথিকে আহার করান। অতিথিসৎকার হিন্দু অতি প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া গণনা করেন। অনেক আঢ্য-লোকের অতিথিশালা আছে, যেখানে দিন দিন বহুসংখ্যক অতিথি আহার ও আশ্রয় লাভ করেন। অতিথিসেবা হিন্দু এত ভালবাসেন যে, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধকালে যখন পিতৃ-লোকের নিকট প্রার্থনা করেন, সেই প্রার্থনায় অপরাপর প্রার্থনীয় দ্রব্যের মধ্যে "যেন আমার অতিথি লাভ হয়" এই একটি প্রার্থনা থাকে।

"অতিথিংশ্চ লভেমহি"।

অতিথিসৎকার সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক ইতিবৃত্ত বলিয়া আমরা পাঠকদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব।

কোন সময়ে এক দেশে বিজাতীয় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। একটি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ উপর্য্যুপরি নয় দিবস ভিক্ষা করিয়া একটি তণ্ডুল কণাও পান নাই। আপনি, গৃহিণী, পুত্র, পুত্রবধূ চারিজন একাদিক্রমে নয় দিবস উপবাসী আছেন; দশম দিবসে ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থে বাহির হইয়া যথেষ্ট

শক্তু প্রাপ্ত হইলেন। নয় দিবস ভিক্ষা করিয়া রিক্তহস্তে ঘরে ফিরিয়া গিয়া দশম দিবসে আশাতিরিক্ত শক্তুলাভ করিয়া ব্রাহ্মণ পরম আহ্লাদিত হইয়াছেন এবং ভগবানকে তাঁহার দয়ার জন্য বারংবার ধন্যবাদ করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "প্রভু! যেমন আশাতীত আহার দ্রব্য দেওয়াইয়া দিলেন, তেমনি কৃপা করিয়া একটি অতিথিযোজনা করিয়া দিন, যেন গৃহে প্রতিগমন করিয়া দেখিতে পাই, যে একটি অতিথি উপস্থিত হইয়াছেন।" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া মনে মনে শক্তুভাগ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাগ্রে বড় ভাগটি অতিথির, তাহার পর অবশিষ্ট শক্তুর অংশ চতুষ্টয়ের এক অংশ আপনার, এক অংশ সহধর্ম্মিণীর, এক অংশ পুত্রের ও অবশিষ্টাংশ পুত্র-বধূর। এইরূপ ধন্যবাদ প্রার্থনা ও লব্ধ-দ্রব্যের অংশীকরণ করিতে করিতে আপন কুটিরের নিকটস্থ হইলেন। দূর হইতে লক্ষ্য হইল যে, অতি তেজঃপুঞ্জ, ব্রহ্ম-বর্চ্চস সম্পন্ন একটি লোক তাঁহার কুটীরে সমাসীন রহিয়াছেন; দেখিয়াই হৃষ্টচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, "ভগবান এ দীনের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়াছেন।" সেই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ অতি দ্রুতপদসঞ্চরণ দ্বারা গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। গৃহে আসিয়াই দেখিলেন, যে অতিথি সমাগত। অমনি গৃহিনীকে ডাকিয়া অনুযোগ করিতে লাগি-লেন, "অতিথি ঠাকুর বসিয়া আছেন তুমি ইহাঁর সৎকার কর নাই?" "ঠাকুর কি দিয়া সৎকার করিব, তুমি ভিক্ষা করিয়া কিছু আনিলে তবেত সেবা করিব? তোমার অনুপস্থিতিতে

আমি ঠাকুরের চরণ ধৌত করিয়া, আপনার কেশ পাশ দ্বারা জল মোচন করিয়া দিয়াছি, এবং আসন দিয়াছি, এখন সংকারের অন্য অঙ্গগুলি আপনি অনুষ্ঠান করুন।” ব্রাহ্মণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অন্তপুরে গিয়া ভিক্ষা-লব্ধ-শক্তু পাঁচভাগ করিলেন, করিয়া প্রথম বড় ভাগটি আনিয়া অতিথির সমক্ষে রাখিয়া আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। অনুরোধ করিতে না করিতে অতিথি নিমিষের মধ্যে সকল আহার করিয়া ফেলিলেন। যখন ব্রাহ্মণ কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলেন “তৃপ্তি হইল কি ?” অতিথি উত্তর করিলেন “তৃপ্তির কথা কি বলিব, কিছু আহার করিলাম বলিয়াই অনুভুতিই হইল না।” ব্রাহ্মণ ব্যাকুল হইয়া অন্তঃপুরে গিয়া অতি প্রশান্ত হৃদয়ে ও আনন্দচিত্তে আপনার অংশ আনিয়া অতিথি ঠাকুরকে দিলেন, দিতে না দিতেই অতিথি তৎসমুদায় গ্রাস করিয়া ফেলিলেন এবং “তৃপ্তি হইল কি না” এই কথা স্পৃষ্ট হইলে পূর্ব্বের ন্যায় উত্তর দিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ অতিশয় আকুলিত হইয়া ব্রাহ্মণীকে এই কথা বিজ্ঞাপন করিলেন, করিতেই ব্রাহ্মণী বলিলেন “তার চিন্তা কি আমার অংশ লইয়া অতিথি ঠাকুরকে দিন।” ব্রাহ্মণ পত্নীকে বলিলেন, তুমি প্রাচীনা, একাদিক্রমে আজি নবাহ কিছু আহার কর নাই, তোমার অংশ আমি কোন প্রাণে অতিথিকে দিব, তুমি যে এইরূপ আহারের কষ্ট পাও, বোধ হয় তোমার নিজের এমন কোন পাপ নাই যাহাতে এই যন্ত্রণা হয়, আমি অভাগা, আমার সহিত তোমার যোজনা হওয়াতে

তুমি এই কষ্ট পাইতেছ, আমি তোমাকে আর কষ্ট দিতে পারি না।" তখন ব্রাহ্মণী সাশ্রুলোচনে, কৃতাঞ্জলিপুটে পতির নিকট অতি আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "আমার অংশ অতিথি ঠাকুরকে অবশ্যই দিতে হইবে তাহা না হইলে আমার দারুণ কষ্ট হইবে। অনাহারের কষ্ট অপেক্ষা সে কষ্ট অতি দুঃসহ। প্রভু, আমি যে তোমার অর্দ্ধাঙ্গ, তুমি অনাহারে যদি প্রাণধারণ করিতে পার তবে আমাকে ত সেই সঙ্গে বাঁচিতেই হইবে। অতএব আর দ্বিধা করিবেন না, কাল বিলম্ব করিবেন না, এখনি আমার অংশ অতিথিকে খাইতে দিন।" পত্নীর অংশ আহার করিয়া যখন অতিথি তৃপ্ত হন নাই বলিলেন, তখন ব্রাহ্মণ ভীত হইলেন এবং সাশ্রুলোচনে অন্তঃপুরে গিয়া পরিজনদিগের নিকট তাহা বিজ্ঞাপন করিলেন। এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণকুমার উল্লাসে লম্ফ প্রদান করিয়া পিতাকে অনুরোধ করিলেন, "আমার অংশ অতিথি ঠাকুরকে দিন।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "বৎস, তুমি বালক উপর্য্যুপরি নয় দিবস আহার কর নাই, আজ আহার না করিলে প্রাণরক্ষা কিরূপে হইবে, এবং আমিই বা ক্ষুধার্ত্ত সন্তানের মুখের গ্রাস লইয়া অপরকে কিরূপে দিব।" ব্রাহ্মণকুমার পিতার বাক্য শুনিলেন না, এবং তাহার অংশ অতিথি ঠাকুরকে দিবার জন্য বিজাতীয় আগ্রহ করিতে লাগিলেন। অতিথি পুত্রের অংশ খাইয়াও অতৃপ্তি-সূচক ভাব প্রকাশ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণের বালিকা পুত্রবধূ তাহার অংশ অতিথিকে দিবার জন্য নির্ব্বন্ধা-

তিশয় সহকারে শশুর মহাশয়কে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার অংশ অতিথিকে দিতে অস্বীকৃত হওয়াতে পুত্রবধূটি এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, "আমি কি এত অভাগিনী, এতই পাপিয়সী, যে আমার অংশ অতিথি ঠাকুর গ্রহণ করিবেন না?" ব্রাহ্মণ পুত্রবধূর আন্তরিক ক্লেশ হইতেছে বুঝিয়া, তাঁহার অংশ অতিথিকে আনিয়া দিলেন,—অতিথির আহার অবসান হইল। ব্রাহ্মণ অতিথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তৃপ্তি হইল কি?" এই প্রশ্ন ব্রাহ্মণের মুখবিবর হইতে নির্গত হইতে না হইতে ঘর্ঘর-শব্দে ব্রাহ্মণের কুটীর দ্বারে রথ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই রথে অতিথি আরোহণ করিলেন এবং দেখিতে না দেখিতে, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণকুমার ও পুত্রবধূটি সেই অতিথির দেহে লীন হইলেন। এই ইতিবৃত্ত পাঠে,—পাঠক! বুঝিতে পারিবেন যে অতিথি সংকার হিন্দুর পক্ষে কত প্রীতি-কর ও হৃদয়ের তৃপ্তিবিধায়ক কার্য্য। "Charity begins at home" বলিয়া ভিক্ষুকব্রাহ্মণ উদ্বৃত্ত শক্তু অর্থাৎ তাহাদিগের চারি জনের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহা আগামী দিনের জন্য সঞ্চয় করিতে পারিতেন; কিন্তু সঞ্চয় করা দূরে থাকুক, ভিক্ষা করিয়া যাহা লাভ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা অতিথিসংকার করিবার এত আগ্রহ, যে উপর্য্যুপরি নয় দিবস অনাহারে থাকিয়া দশ দিনের দিন যে আহার দ্রব্য ভগবান দেওয়াইলেন, তাহাও অতিথিসেবাতে পর্য্যবসিত করিলেন।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ রাজন্ স্বর্গস্যোপরিবর্ত্ততে।
প্রভুশ্চ ক্ষময়াযুক্ত দরিদ্রশ্চ প্রদানবান॥

অর্থাৎ হে রাজন্, এই দুই পুরুষের স্থান স্বর্গেরও উপরিভাগে। কোন্ পুরুষ। যিনি দণ্ড ও পীড়ন করিবার শক্তি সত্ত্বেও ক্ষমা করেন, এবং যিনি নিজে দরিদ্র হইয়াও অপরকে দান করেন।

ভিক্ষুকব্রাহ্মণের শক্তুদান ঘটিত আর একটি আখ্যায়িকা আছে, সেটিও এ স্থলে বর্ণনা করা আবশ্যক। রাজা যুধিষ্ঠির বহুব্যয় ও যত্ন সহকারে রাজসূয়যজ্ঞ করিলেন। যজ্ঞাবসানে ব্রাহ্মণভোজন হইয়া গেলে পর, রাজা পারিপার্শ্বিক ও অনুচরগণের সহিত যজ্ঞের কথা আলোচনা করিতে করিতে, তাঁহার মনে একটি আনন্দের উদয় হইল। তিনি মহাত্মা ছিলেন, অহঙ্কার স্পর্দ্ধা তাঁহার মনে স্থান পায় না; তবে সুন্দর ক্রিয়াটি করিলাম বলিয়া তাহার মনে একটি চিত্তপ্রসাদ জন্মিল। পাণ্ডবনাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দর্পহারী মধুসূদন দর্পের গন্ধেই যেন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন; অমনি এমন এক ঘটনার যোজনা করিলেন, যাহাতে রাজার চিত্তপ্রসাদজনক বুদ্ধির অন্যথা হইল। সহচর অনুচরগণ সঙ্গে যজ্ঞের কথা লইয়া আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে সকলে দেখিলেন, যেখানে ব্রাহ্মণভোজন হইয়াছে এবং উচ্ছিষ্ট অন্ন ও পত্র পড়িয়া রহিয়াছে, সেই খানে অকস্মাৎ একটি নকুল আসিয়া ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট অন্ন খুঁটিয়া খাইতে লাগিল।

উচ্ছিষ্ট পত্রের উপর অবলুণ্ঠিত হইয়া ও মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের শক্তু-দানে যে পুণ্য হইয়াছিল, এই যজ্ঞানুষ্ঠানে সে পুণ্যের কোটী অংশের একাংশ পুণ্যও হয় নাই।" এই কথা রাজারও অপ্রীতিকর হইতে লাগিল এবং তাঁহার অনুচরেরা ইহা শুনিয়া একেবারে হুতাশনের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং "মার জানোয়ারটাকে, একেবারে মারিয়া ফেল!" বলিয়া সকলে এক বাক্যে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা এত উদ্ধত ও অধীর কেন হইতেছ? একটা বেজী মানুষের ন্যায় কথা বলিতেছে, এই ত এক আশ্চর্য্য! তাহার পর উহা কি বলে, তাহা শ্রবণ কর! ও কেনই বা এরূপ্ বলে? তাহার কারণ জিজ্ঞাসা কর।" ভগবানের এই কথাতে সকলেই নিরস্ত হইলেন এবং নকুলের কথা অবধান পূর্ব্বক শুনিতে লাগিলেন। পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তুমি বলিতেছ যে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের শক্তু দানে যে পুণ্য হইয়াছিল, তাহার কোটী আংশের একাংশও এ যজ্ঞানুষ্ঠানে হয় নাই, ইহাতে বেজী উপরি উল্লিখিত, ভিক্ষুকব্রাহ্মণের শক্তুদানের বৃত্তান্ত অদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিল এবং কহিল, "অতিথি ও আতিথেয়দিগের ব্যাপার দেখিয়া আমার মনে হইল, যে ইনি সহজ অতিথি নহেন এবং ইহাঁর যে সেবা হইল, তাহাও সহজ সেবা নহে। এই মনে করিয়া আমি অতিথির ভোজন পাত্রে যে শক্তুকণা পড়িয়াছিল, তাহা খুঁটিয়া খাইতে লাগিলাম, খাইতে খাইতে

সেই প্রসাদ স্পর্শে আমার মুখের চারিপার্শ্বের লোমগুলি সুবর্ণের বর্ণ ধারণ করিল। শরীরের এই বিকৃত অবস্থায় আমি অনেকদিন বেড়াইতেছিলাম, আজি আহার অন্বেষণে মাঠে বিচরণ করিতে করিতে দেবর্ষি নারদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বেজী, তোমার শরীরের কতকগুলি লোমের সুবর্ণের বর্ণ এবং অধিকাংশের স্বাভাবিক বর্ণ। লোমের এই বিষদৃশবর্ণে তোমাকে বড় ভাল দেখায় না; শরীরের যাবতীয় লোমের যাহাতে সুবর্ণের বর্ণ হয়, তাহা কর।" আমি কহিলাম, প্রভু, তাহা কিরূপে হইতে পারে? দেবর্ষি কহিলেন, "আজি রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ হইয়া গিয়াছে, অনেক পবিত্র ব্রহ্ম-বর্চ্চস সম্পন্ন ব্রাহ্মণ তথায় ভোজন করিয়াছেন; তাঁহাদিগের পাত্রাবশিষ্ট যাহা পাও, তাহা খাও গিয়া। তোমার শরীরের যাবতীয় লোমের এক বর্ণ হইবে, অর্থাৎ সকল লোমেরই সুবর্ণের বর্ণ হইবে।" তাই আমি তাড়াতাড়ি এখানে আসিয়া ব্রাহ্মণগণের প্রসাদ পাইতেছি; প্রসাদ খাওয়া দূরে থাকুক, আমি ভোজন পাত্রে গড়াগড়ি দিতেছি, আমার একগাছিও লোমের বর্ণ ফিরিল না দেখুন।" এই কথা বলিয়া বেজী প্রস্থান করিল। রাজা যুধিষ্ঠির সুন্দর ক্রিয়া করিলেন বলিয়া মনে মনে যে স্পর্দ্ধা করিতেছিলেন, সে স্পর্দ্ধা ঘুচিয়া গেল এবং তাঁহার পারিপার্শ্বিকগণের আস্ফালন নিবৃত্তি হইল। এই আখ্যায়িকাতে ইহা প্রতীয়মান হইতেছে, যে আত্মবঞ্চনা করিয়া অতিথির সেবা করা,

মহাব্যয় পরিশ্রম ও যত্নসাধ্যে যে রাজসূয়যজ্ঞ, তাহা অপেক্ষাও গুরুতর কার্য্য ও গুরুতর ফলপ্রদ,—অন্ততঃ হিন্দুর এই বিশ্বাস।

সম্পূর্ণ।